অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৭০৯/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৩৪০.৫৯
ISBN : 984-06-0061-3
প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯১
তৃতীয় সংস্করণ
মে ২০০৭
বৈশাখ ১৪১৪
রবিউস সানি ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রুফ সংশোধন
মোঃ আজিজুল কাইয়ুম
বর্ণ বিন্যাস ঃ আশরাফিয়া প্রেস

প্রচ্ছদ
শব্দরূপ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ৭৫.০০ টাকা

OPORADH PROTIRODHE ISLAM (Islam in the Resistance of Crime) : Written by Maulana Muhammad Abdur Rahim in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 May 2007

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 75.00 ; US Dollar : 4.00

www.pathagar.com

সূচিপত্র

আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়তের দার্শনিক ভিত্তি	৯
প্রথম ঃ শরীয়তের মৌল নীতি	২০
দ্বিতীয় ঃ ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীলতার মৌলনীতি	২২
তৃতীয় ঃ বস্তুগত স্তম্ভ	২৯
পরিশিষ্ট	৪৩
অপরাধ প্রতিরোধে ঈমানের ভূমিকা	৪৫
সংশয়মুক্ত ঈমান	৪৮
ঈমান ও কুফর	৪৯
ঈমান ও আমল	৫০
ঈমান ও রাষ্ট্র	৫১
ঈমান ও সামাজিক রীতিনীতি	৫৯
ঈমান ও অর্থ ব্যবস্থা	৬১
ঈমান ও পারস্পরিক চুক্তি ও ওয়াদা	৬৯
অপরাধ দমনে ইবাদাতের প্রভাব	৭২
العبادة ইবাদাত-এর অর্থ	৭২
ইসলামে ইবাদাতের তাৎপর্য	৭৫
অপরাধ প্রতিরোধে ব্যাপক তাৎপর্যসম্পন্ন ইবাদাতের প্রভাব	৭৯
মানুষের চরিত্রে ও আচার-আচরণে ইবাদাতের প্রভাব	৮৫
ঈমান ভিত্তিক ইবাদাত	৯৩
অপরাধ দমনে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব	১০৫
অপরাধ দমনে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ-এর অবদান	১১৭
অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামী বিধান	১৩২
শাস্তিই অপরাধ প্রতিরোধের একমাত্র হাতিয়ার নয়	১৩৩
আইন কার্যকরকরণের পদ্ধতি	১৪৩
ইসলামের দণ্ড দর্শন	১৫৪
জীবন ও অধিকার	১৫৫
অধিকারের নিরাপত্তা	১৫৬
সুবিচার ব্যবস্থার ভিত্তি	১৫৭

www.pathagar.com

শিক্ষামূলক শাস্তি	১৫৮
শাস্তির ভয়াবহতা	১৫৯
প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থকরণের দৃষ্টিকোণ	১৫৯
সংশোধনমূলক শাস্তির দৃষ্টিকোণ	১৬০
শিক্ষামূলক শাস্তি	১৬১
জোরপূর্বক অপরাধ পরিহারের শাস্তি	১৬৩
প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থকরণ	১৬৩
সফল ও সার্থক শাস্তি	১৬৩
শাস্তি কিরূপ হওয়া উচিত	১৭০
বড় বড় অপরাধ	১৭১
ইসলামী দৃষ্টিকোণ	১৭২
ইসলামী দণ্ড বিধান	১৭৩
কিসাস	১৭৩
দণ্ড বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ	১৭৩
শরীয়ত আত্মার লালন ও মন-মানসিকতা সুদৃঢ় করে	১৭৪
দণ্ড ইসলামী সমাজ গঠনের একটি উপায়	১৭৪
ইসলামী সমাজ গঠনের ইসলামী প্রক্রিয়া	১৭৫
মুসলিম অপরাধ করে কেন	১৭৭
শরীয়ত অবিভাজ্য	১৭৮
শরীয়ত মহান	১৭৯
তওবার দরজা সদা উন্মুক্ত	১৮০
হত্যার অপরাধ	১৮০
এই অপরাধের কারণ ও মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ	১৮২
এই পর্যায়ে আমাদের অভিমত	১৮৬
প্রথমোক্ত মতের প্রমাণাদির পর্যালোচনা	১৮৯
কুরআনে কিসাস শব্দের প্রয়োগ	১৯০
কিসাসে নিহিত জীবন-এর তাৎপর্য	১৯১
হত্যা অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার জরুরী দিক	১৯৩
ইচ্ছামূলক হত্যা-অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলী	১৯৩
ভুলবশত অথবা প্রায়-ইচ্ছামূলক হত্যার অপরাধ	১৯৪
এই কথার দলীল	১৯৪
বালক ও পাগলের হত্যাকাণ্ড	১৯৫
কিসাস লওয়ার হাতিয়ার	১৯৫

www.pathagar.com

কিসাস সম্পূর্ণ করার শর্ত	১৯৬
কিসাস কার্যকর করবে কে ?	১৯৭
হত্যাকাণ্ডের কম মানের অপরাধে কিসাস	১৯৮
ইসলামী শরীয়তে 'দীয়াত' ব্যবস্থা	১৯৮
কিসাসের বদলে দীয়াত গ্রহণের বৈধতার দলীল	১৯৯
নিহতের অভিভাবকদের নিকট সুপারিশ	২০০
দীয়াত এর পরিমান	২০০
কাফ্ফারা	২০০
হত্যার ক্ষেত্রে কাফ্ফারা	২০১
হত্যার কাফ্ফারা	২০১
ইসলামী দণ্ড বিধানের বিস্তারিত রূপ	২০৩
'হুজ্জ' ও তা'যীরের মধ্যে পার্থক্য	২০৫
শাস্তিদানের চূড়ান্ত লক্ষ্য	২০৭
ইমাম গাযালীর ভাষ্য	২০৭
ইসলামের দণ্ড বিধান রহমত বিশেষ	২০৮
শাস্তি যার হয়, তার জন্য তা কাফ্ফারা	২১০
'হদ্দ' কার্যকর হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য	২১২
'হদ্দ' কার্যকর করার জন্য দায়িত্বশীল কে ?	২১৫
'হদ্দ' হওয়ার অপরাধ ও তার শাস্তি	২১৭
যিনায় ইসলামী শাস্তি অভিনব নয়	২১৮
যিনার শাস্তির বিবর্তন	২২০
অবিবাহিতের যিনার শাস্তি	২২২
যিনার অপরাধ প্রমাণের পদ্ধতি	২২৫
বিবাহিতের যিনার শাস্তি	২২৭
রজম দণ্ড কার্যকর করার প্রক্রিয়া	২৩১
রজম-এর পরবর্তী কার্যক্রম	২৩২
যিনার মিথ্যা দোষারোপের অপরাধ	২৩৪
যিনার মিথ্যা দোষারোপের শাস্তি	২৩৫
মদ্যপানের অপরাধ	২৩৬
মদের ব্যবসায়	২৩৯
মদ্য নিষেধে ক্রমিক পদ্ধতি অবলম্বন	২৪০
মদ্যপায়ীর শাস্তি	২৪৩
চুরির অপরাধ	২৪৪

www.pathagar.com

চুরির সংজ্ঞা	২৪৫
চুরির শাস্তি	২৪৬
সমস্যার সমাধান	২৪৭
ইসলাম পূর্ব সমাজে হাত কাটার দণ্ড	২৪৮
হাত কাটার নিয়ম	২৪৮
সশস্ত্র ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীর শাস্তি	২৫০
মুহারিবের শাস্তি	২৫১
তওবা করলে কি শাস্তি রহিত হবে	২৫৩
তা'যীর পর্যায়ের অপরাধ	২৫৬
তা'যীর কয়েক প্রকারের	২৫৬
তা'যীরের মৃত্যুদণ্ড	২৫৭
তা'যীর হিসাবে আর্থিক দণ্ড	২৬০
অপরাধ দমনে শরীয়তসম্মত শাস্তি প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া	২৬২

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলাম আল্লাহ তা'আলা মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে কল্যাণময় করার সকল ব্যবস্থা ইসলামী জীবনবিধানে রয়েছে। মানুষ তা অনুসরণ না করে নিজেরাই নিজেদেরকে অশান্তি ও অকল্যাণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ইনসাফপূর্ণ ও কল্যাণকর জীবনবিধানের পরিপন্থী ক্রিয়া-কর্মের নামই অপরাধ। অপরাধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্টকারী। মানুষের জীবনে অশান্তি ও অকল্যাণ আপতিত হয় অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে। অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতা থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মহান ধর্ম ইসলামে রয়েছে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা। এর মধ্যে রয়েছে ঃ

১. ভাল কাজের উত্তম প্রতিদান ও মন্দ কাজের শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা এবং ভাল কাজের প্রতি উৎসাহিত করা ও মন্দ কাজের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী হচ্ছে–"হে নবী! লোকদেরকে হিকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আপনার প্রভুর দিকে আহ্বান করুন।" "হে নবী! আপনার নিকটতম সঙ্গীদেরকে মন্দ কাজের আযাবের ভীতি সম্পর্কে সতর্ক করুন।"

২. সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের বাধা দানের মাধ্যমে মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে, "তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল অবশ্যই হতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধকরণের কাজে সর্বদা ব্যাপৃত থাকবে।"

৩. ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তিকে অবদমন করা এবং অপরাধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আত্মাকে কলুষমুক্ত ও পবিত্র রাখা। এ বিষয়ে আল-কুরআনের বাণী–"নিশ্চয়ই নামায সকল অশ্লীলতা ও পাপকার্য থেকে বিরত রাখে।" হাদীস শরীফে রোযাকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ঢালস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শাস্তির বিধান কার্যকর করার দ্বারা মানুষকে অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা। আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা হচ্ছে, "ব্যভিচারিণী এবং ব্যভিচারীর প্রত্যেককে তাদের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ একশত বেত্রাঘাত করুন।"

বস্তুত, ইসলামী জীবনবিধানের মূল উদ্দেশ্য হলো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হতে না দেয়া। অপরাধ সংঘটনের পূর্বেই এর সকল উপায়-উপকরণ ও পন্থা রোধ করে দেয়ার প্রতি ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। যেমন, ব্যভিচারে

www.pathagar.com

উৎসাহ প্রদানকারী নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশালীন পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিকে ইসলাম পরিহার করতে বলেছে। এরূপ প্রতিবন্ধকতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও কেউ অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়লে তখন ইসলাম তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

মানুষের প্রণীত বস্তুবাদী বিধানে কেবল অপরাধ সংঘটনের পর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর ইসলাম অপরাধ সংঘটনের পূর্বে এর উপায়-উপকরণ ও পরিবেশকেই সংহত করে দিয়েছে।

ইসলামী বিধানের উদ্দেশ্য কাউকে শাস্তি দেয়া নয়, বরং অপরাধ সংঘটনের সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করা এবং মানুষকে অকল্যাণ ও অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখা। তাই ইসলাম ব্যতীত অন্য সব বিধি-বিধানকে আল্লাহ তা'আলা 'জাহিলিয়াত' বলে আখ্যায়িত করেছেন—"ওরা কি (ইসলামের পরিবর্তে) জাহিলিয়াতের বিধান ও প্রশাসন চায় ? অথচ দৃঢ় প্রত্যয়শীল লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র চেয়ে উত্তম বিধানদাতা ও প্রশাসক আর কে হতে পারে ?"

এ বিষয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম, লেখক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম রচনা করেন 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম' শীর্ষক এই তত্ত্ব ও তথ্যবহুল মূল্যবান গ্রন্থটি। বইটির গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৯১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রথম প্রকাশ করা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই এর দুটি সংস্করণের সকল কপি নিঃশেষিত হয়ে যায়।

ব্যাপক পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে মূল্যবান এই গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে জানাচ্ছি অশেষ শুকরিয়া।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়তের দার্শনিক ভিত্তি

আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বলোকের স্রষ্টা। এই বিশ্বলোক পরিচালনার জন্য তাঁর যেমন নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে, তেমনি সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি নিরংকুশ সার্বভৌম শক্তিরও অধিকারী।

দুনিয়ার মানুষ মহান আল্লাহ্র এক বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ সৃষ্টি। তিনি চান—দুনিয়ায় মানুষ আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ প্রয়োজনমত পেয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন-যাপন করুক এবং পরকালে অধিকারী হোক আল্লাহ্র নির্ধারিত স্থায়ী ও চিরন্তন কল্যাণের। কিন্তু তা একটি শর্তের উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ্র দেয়া ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সার্বিক সুখ ও শান্তি নির্ভর করে এই দুনিয়ায় আল্লাহ্র অনুগত হয়ে সার্বিক জীবন-যাপনের উপর। আর আল্লাহ্র আনুগত্যভিত্তিক সার্বিক জীবন-যাপনের লক্ষ্যেই তিনি নাযিল করেছেন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের যে অংশ (রাষ্ট্রশক্তির সক্রিয় সহযোগিতায়) আইন হিসাবে কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট, তা-ই হচ্ছে শরীয়ত। এই দুনিয়ার বুকে মানুষের বসতি শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই আল্লাহ্র নিকট থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে, মানুষ সর্বকালেই আল্লাহ্র নিকট থেকে লাভ করেছে জীবন পরিচালন ও সমাজ শাসনের জন্য শরীয়তের ব্যবস্থা। আল্লাহ্র নাযিল করা শরীয়ত অত্যন্ত মহান ও পবিত্র এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক ও কল্যাণকর।

আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ শরীয়তের পরম লক্ষ্য হচ্ছে—মানব সমাজের সংশোধন ও মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন, ব্যক্তি ও সমষ্টিকে কল্যাণ ও পরম সাফল্যের দিকে অগ্রসর করা এবং সর্বপ্রকারের অন্যায়, যুলুম, দুষ্কৃতি ও পাপ কাজ থেকে তাদের মুক্ত ও বিরত রাখা।

বস্তুত ইসলামী শরীয়ত মহান আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ এক তুলনাহীন ব্যবস্থা। এর লক্ষ্য সার্বিকভাবে সমস্ত মানবতার এবং বিশেষভাবে ইসলামে বিশ্বাসী জনগণের সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধন এবং মানবজীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ও অগ্রগতির সহিত পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্য বিধান।

পূর্বের শরীয়তসমূহ বিশেষ সময়ের বিশেষ স্থানের লোকদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। ইসলামের শরীয়ত এই 'বিশেষ'-এর বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তা অবতীর্ণ

www.pathagar.com

হওয়ার সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্তকার দেশ-বংশ-ভাষা-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য। এই শরীয়ত বহনকারী ও প্রচারক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জবানীতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়েছেন ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (الاعراف ١٥٨)

"বল, হে লোক সকল ! আমি তোমাদের সকলেরই প্রতি প্রেরিত—রাসূল।"

এই শরীয়ত পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে চায় এবং সে জন্য উত্তম, বিজ্ঞানসম্মত ও যথার্থ কার্যকর পন্থা গ্রহণ করেছে। শরীয়তের অনুসৃত কর্মপন্থা অনুযায়ী সর্বপ্রথম জনমনে এই জীবন বিধান ও শরীয়তের প্রতি ঈমানের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা সাধন করতে হবে। বস্তুত মানুষ যা কিছু করার জন্য নির্দেশিত, তার যথাযথ কার্যকারিতার জন্য এই ঈমানই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক ভিত্তি। মানুষ সে কাজ কখনই করে না—করতে স্বতঃই উদ্বুদ্ধ হয় না, যার প্রতি তার অন্তরের অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপিত হয়নি, যা না করলে কোন সময় কঠিনভাবে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেনি। ইসলাম মানব মনে সর্বপ্রথম সেই ঈমান প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক। ঈমান হচ্ছে সেই নির্মল জ্যোতি, যা জীবনের পথ উদ্ভাসিত করার জন্য হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয়, হৃদয়কে কল্যাণের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করে গড়ে তোলে।

ঈমান দু' পর্যায়ের। এক পর্যায়ের ঈমান হচ্ছে মানবীয় মর্যাদা ও উত্তম আচার-আচরণ সম্পর্কিত। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ঈমান এক উচ্চতর মহান সত্তার প্রতি, যাঁর নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের উপর ভিত্তি করে আইন কার্যকর হয়। বস্তুত যে লোক আল্লাহ্, পরকাল-হাশর ও হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি প্রকৃতই ও যথার্থভাবেই ঈমান আনবে, তার হৃদয়-মন থেকে সর্বপ্রকারের অন্যায় আসক্তি ও পাপ প্রবণতা নির্মূল হয়ে যাবে, অন্তত দমিত হবে—স্বাভাবিকভাবেই এ আশা করা যায়।

ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহ ইজমালী বা মোটামুটি ধরনের এবং মৌল নীতির পর্যায়ের। তাই গোটা ব্যাপারের ভিত্তি রচনা করে। উপরন্তু ইসলাম যেমন দীন—বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, তেমনি তা রাষ্ট্র-ও। তা ব্যক্তি ও সমষ্টির যাবতীয় কার্যকলাপে পরিব্যাপ্ত, তার বিধানাবলী স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন (Elastic-Flexible) উৎস থেকে নিঃসৃত। সেই সাথে আল্লাহ্ আমাদের দিয়েছেন ইজতিহাদ করার অধিকার—পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নবতর প্রয়োজন পূরণের একটি সার্থক হাতিয়ার হিসাবে। শরীয়তের সাধারণ নিয়ম-নীতির আওতার মধ্যে মত প্রয়োগের অধিকারও স্বীকৃত। সর্বক্ষেত্রে কাঠিন্য ও কঠোরতার (عُسْر) পরিবর্তে সহজতা বিধান (يُسْر) এবং কষ্ট, অসুবিধা ও অচলাবস্থা বিদূরণ এই পর্যায়ের সর্বকালীন নীতি হিসাবে পরিগণিত। এ কথা স্পষ্ট যে, অভিমত বা রায় ব্যক্তির নিকট একটি মহামূল্য আমানত বিশেষ। দৈনন্দিন ব্যাপারাদিতে প্রকট প্রয়োজনকালে তা দূরতম ও পূর্বকল্পনাতীত দ্বারও উন্মুক্ত করে

www.pathagar.com

দেয়। বিশেষ করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রকাশের সহিত সম্পর্কশীল ব্যাপারাদিতে তা একান্তই অপরিহার্য।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন এক নৈতিক সংস্থা বিশেষ। সর্বপ্রকারের কল্যাণময় মূল্যমানের ব্যাপকতা সাধন এবং নীচতা-হীনতা-নিকৃষ্টতা-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা জঘন্যতাকে নির্মূলকরণের উপর তা সংস্থাপিত। মানুষের জীবন একটা রাজনৈতিক সংস্থাও বটে। আর তার ভিত্তি হচ্ছে নিরংকুশ সুবিচার ও ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠা। তা একটি সামাজিক সংস্থাও। নির্মল পরিবার ব্যবস্থা ও পারস্পরিক নিরাপত্তা হচ্ছে তার বীজ— নিম্নতম বা একেবারে প্রাথমিক একক। জীবন একটা অর্থনৈতিক সংস্থাও। উৎপাদন, কর্মতৎপরতা ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন তার মৌল ভাবধারা। মুসলমান যদি বাস্তবিকভাবেই দীনের সহিত সম্পর্কিত ও তার অনুসারী হয়, নিজদিগকে দীনের বিধানাবলীর অধীন ও অনুগত বানাতে সচেষ্ট হয়, তাহলে মানুষের জীবন উক্ত রূপ সর্বদিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। বাস্তবে আল্লাহ্‌র বিধান পালিত হলে কর্মের সহিত আকীদা-বিশ্বাস ও কথার সামঞ্জস্য স্থাপিত হতে পারে, অকাট্য প্রমাণ হতে পারে তার সত্যতার।

অপরাধ প্রতিরোধে আসমানী ধর্মসমূহের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সর্বশেষে সেসব ধর্মের সত্যতা প্রমাণকারী হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে ইসলাম। ইসলামে এই পর্যায়ে যে বিপুল জ্ঞানতত্ত্ব ও আইন সম্পদ রয়েছে, তার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তা সর্বপ্রকারের অপরাধ প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট। তা অপরাধীকে বিরত রাখে অপরাধ করা থেকে। তা অপরাধ প্রবণতা ও অপরাধের পৌনপুনিকতা নির্মূল করতে সর্বতোভাবে সক্ষম। অথচ সেজন্য খুব মারাত্মক ধরনের কোন শাস্তির প্রয়োজন পড়ে না। ইসলামের পেশকৃত এসব উপায় ও পন্থার মধ্যে মানুষের মন ও বিবেককে সুস্থ, কল্যাণময় ও পবিত্র ভাবধারা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা এবং অন্যায় অপরাধ ও পাপ কার্যের প্রতি ব্যক্তির মন-মানসে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করে দেওয়া অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

বস্তুত অপরাধ স্বরূপে একটা প্রাচীনতম ব্যাপার। তা ততই প্রাচীন, যত প্রাচীন পৃথিবীর বুকে মানুষের পদসঞ্চার। যেদিন থেকে মানুষ, সেদিন থেকেই অপরাধের অগ্রযাত্রা।

কুরআন মজীদে হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীর প্রাক-পৃথিবীকালীন জীবনের যে ইতিহাস উল্লিখিত, তার সারকথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌ তাদের বললেন, তোমরা এই গাছটি থেকে ভক্ষণ করবে না। অথচ তাঁরা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এই নির্দেশ অমান্য করলেন।

প্রাচীনকালে অপরাধের শাস্তি বা দণ্ডদানের ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত অধিকারের বিষয়রূপে গণ্য হতো। শাস্তি বা দণ্ডের ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার। কিন্তু ফৌজদারী অপরাধ ব্যক্তিকে অতিক্রম করে গোটা পরিবার ও গোত্রের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে পড়ে, যদি তার দণ্ড কার্যকর করা না হয়। অনেক ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। ফলে প্রতিশোধ গ্রহণের

www.pathagar.com

অধিকার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সন্ধি-সমঝোতা স্থাপন করে বাস্তবায়িত করা হয়। এরূপ অবস্থায় সন্ধির ভিত্তি হতো রক্তমূল্য প্রদান। আরবগণ তারই নাম দিয়েছে দিয়াত।

উত্তরকালে অপরাধ সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনায় বিবর্তন ঘটে। তাতে শাস্তি বা দণ্ডদান রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হয়। এই কারণেই আধুনিককালের আইন-প্রণয়ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, দণ্ড ও শাস্তি সমাজ-সমষ্টির নামেই কার্যকর করা হয় বিচার বিভাগীয় রায়ের ভিত্তিতে। কেননা সমাজ সমষ্টি অর্থাৎ রাষ্ট্রই এই অপরাধের জন্য দায়ী, এজন্য জওয়াবদিহি করতে বাধ্য (Responsible)। তবে এই পর্যায়েও ব্যক্তির অধিকার অবশ্যই সংরক্ষিত হতে হবে। তাতে সব মানুষ সমান গণ্য হবে, বিচারপতি অপরাধ অনুপাতে শাস্তির মান ও পরিমাণ নির্ধারণে সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে এবং কোন দিক দিয়েই তাকে প্রভাবিত করা চলবে না। এভাবে অপরাধ একটা প্রকাশ্য সামষ্টিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সমাজ-সমষ্টি-ই তার প্রতিরোধ ও নির্মূল সাধনের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে দায়িত্বশীল হলো। এভাবে ফৌজদারী অপরাধের ব্যাপারটি বাস্তবিক পক্ষেই একটা সামষ্টিক ব্যাপারে পরিণত হলো। যেসব অপরাধ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা নিরাপত্তা বিঘ্নকারী, সমাজ-সমষ্টিকেই সে সবের মুকাবিলা করতে হবে, যদিও তা সাধারণত সংঘটিত হয় এক ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তির দ্বারা। আর সে সবের মুকাবিলা হতে হবে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে অথবা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তার জন্য নির্দিষ্ট দণ্ড বা শাস্তি অবিলম্বে কার্যকর করে। এভাবেই অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব, সম্ভব তার ধারাবাহিকতা বা পৌনপুনিকতা রুদ্ধ করা।

ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহ মানব জীবনের বিভিন্ন দিকে ও বিভাগে ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে এবং তাতে চরম মাত্রার সূক্ষ্ম বিষয়ের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এভাবেই ইসলামী শরীয়তের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে পাঁচটি মৌল প্রয়োজন পূরণ, সংরক্ষণ ও নিশ্চয়তা বিধান। এই পাঁচটি জিনিস হচ্ছে দীন পালন, জীবন, বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা, বংশ ও ধন-মান রক্ষা। কুরআন ও সুন্নাহ্তে এই কথা-ই বিধৃত। এই পাঁচটি বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অপরাধসমূহ গোটা সমাজ-সংস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। এই কারণে এই পাঁচটি পর্যায়ের অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির কথা স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে। জীবনের ক্ষতি সাধন, হত্যা অথবা অঙ্গহানি ঘটানোর অপরাধের শাস্তি সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ (البقره ١٧٩)

"তোমাদের জন্য 'কিসাস' বা শাস্তি দানে (Punishment) জীবন নিহিত।"

বলা হয়েছে وَ الْجُرُوْحُ قِصَاصٌ 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যখমেরও কিসাস রয়েছে।' ধন-মালের ব্যাপারে কৃত অপরাধ পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (المائده ٣٨)

"পুরুষ চোর বা মেয়ে চোর—উভয়েরই হাত কেটে দাও।"

ব্যক্তির মান-সম্মানের উপর মিথ্যামিথ্যি যৌন কলংকের কালিমা লেপনও অপরাধ। এই পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً (النور ٤)

"আর যেসব লোক নির্দোষ-সুরক্ষিত চরিত্রবান মহিলাদের উপর মিথ্যা ব্যভিচারের দোষারোপ করে, কিন্তু পরে (তা প্রমাণের জন্য) তারা চারজন সাক্ষী উপস্থাপিত করে না, তাদের আশিটি দোর্‌রা মার।"

বংশ নষ্টের অপরাধ—যিনার শাস্তি—ঘোষণা করা হয়েছে এই ভাষায় ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّ لاَ تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللهِ (النور ٢)

ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী—উভয়কে একশ'টি দোর্‌রা মার এবং আল্লাহ্‌র আইন কার্যকর করার ব্যাপারে এই দুইজনের প্রতি কোনরূপ নম্রতা দয়া-অনুকম্পা যেন তোমাদের পেয়ে না বসে (বিভ্রান্ত করতে না পারে)।

এ হচ্ছে অবিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচার অপরাধের শাস্তি। কিন্তু বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারেও কি এই শাস্তিই প্রযোজ্য ? রাসূলে করীম (সা)-এর সুন্নাতে এর স্পষ্ট অকাট্য জওয়াব দেওয়া হয়েছে। তাতে বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচার অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে 'রজম' বা 'প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা'।[১]

বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্নকরণ অপরাধের শাস্তিও রাসূলের সুন্নাহতে নির্ধারিত হয়েছে। পূর্বে মাদকদ্রব্য পান হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। সমাজের সাধারণ শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধের শাস্তি কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে ঃ

اِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَ رَسُوْلَه وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٥ اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ –

(المائده ٣٣ –٣٤)

১. 'রজম' দণ্ডটির উল্লেখ কুরআনের পরিবর্তে 'মুতাওয়াতির' হাদীসে বিধৃত। রাসূলে করীম (সা) ও গোটা মুসলিম উম্মাত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত—ইজমা।

www.pathagar.com

যেসব লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা চালায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে ঃ তাদের হত্যা করা হবে কিংবা শূলিবিদ্ধ করা হবে, অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে, কিংবা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাদের এই দুনিয়ার জীবনেই হবে। আর পরকালে তাদের দেওয়া হবে এর চাইতেও বড় শাস্তি। কিন্তু তাদের গ্রেফতার করার পূর্বেই যারা তওবা করবে, তাদের ব্যাপার ভিন্নতর.....।

শরীয়তের বিধানদাতা এসব অপরাধের শাস্তি সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব এর ব্যতিক্রম বা বিকল্প কিছু গ্রহণ করা যেতে পারে না। যখনই অপরাধ সংঘটিত হবে, প্রমাণিত হবে যাবতীয় শর্তসহ, সে বিষয়ে ইসলাম বিচারককে উপরিউক্ত শাস্তি সমূহের মধ্য থেকে যে কোন একটি গ্রহণ ও প্রয়োগের স্বাধীনতা দিয়েছে। আর এতদ্ব্যতীত এই পর্যায়ের অন্যান্য অপরাধের শাস্তি তা'যীর (تعزير) পর্যায়ে গণ্য এবং তা নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপ্রধানকে।

[আধুনিক দৃষ্টিতে বলা যায়, রাষ্ট্রপ্রধান ইসলামী পার্লামেন্টের পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন।]

ইসলাম যেহেতু উক্ত প্রয়োজনাবলীর উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে, এই কারণে শুধু পরকালীন শাস্তির অপেক্ষায় থাকা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত ছিল না। তাই ইসলাম ইহকালীন ও পরকালীন—উভয় লোকেই যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান করেছে। দুনিয়ার শাস্তি অপরাধ প্রতিরোধ করে, অপরাধ প্রবণতাকে নিবৃত্ত করে, মানুষকে অপরাধ ঘটানো থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। দুনিয়ায় এসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণে অপরাধের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। অপরাধের খারাপ প্রতিক্রিয়া খুব মারাত্মক ধরনের হলে উক্ত পাঁচটি বিষয়ের কোন একটিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা হলে দণ্ড কার্যকরকরণে পীড়ার মাত্রায় পার্থক্য করতে হবে শরীয়তের মূল বিধানের সহিত পূর্ণ মাত্রায় সংগতি রক্ষা করে। উপরিউক্ত মৌল প্রয়োজনসমূহ সংরক্ষণে ইসলাম দুইটি পন্থা অবলম্বন করেছে। প্রথম পন্থা হচ্ছে—মানব মনকে সচেতন করা, হৃদয়-মনে দীনী সংযমের বীজ বপন করা এবং তা ইসলামী নৈতিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও মানস গঠনের মাধ্যমে করা সম্ভব। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—অপরাধের বাস্তব শাস্তি কার্যকর করা। ইসলামের ফৌজদারী আইন এই দর্শনের উপর ভিত্তিশীল। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই ইসলামী শরীয়তে 'হদ্দ' 'কিসাস' ও তা'যীর-এর বিধান করা হয়েছে।

সুনির্দিষ্ট সীমিত সংকীর্ণ বেষ্টনীতে কোন কোন 'হদ্দ' কঠোর ও নির্মম বিবেচিত হলেও সমাজ-সমষ্টির প্রতি ইসলামের যে ব্যাপক দয়া-অনুকম্পা বা দায়-দায়িত্ব রয়েছে, সে কথা কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। কতিপয়ের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণের পরিণামে

www.pathagar.com

সমষ্টির ক্ষতি সাধনে সম্মত হওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এ ক্ষেত্রে সমাজ সমষ্টির ন্যায়সঙ্গত ও স্বভাবসম্মত অধিকার সর্বাধিক গুরুত্ব লাভের দাবি রাখে, কেননা সমাজের ব্যক্তিগণের উপরিউক্ত পাঁচটি ক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ একান্তই মানবিক অধিকার। তাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যেতে পারে না। অপরদিকে এ-ও লক্ষণীয় যে ইসলাম অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রেও কল্পনাতীত কঠোরতার নীতি অবলম্বন করেছে। অপরাধ প্রমাণে সন্দেহের (Doubt) অবকাশকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। অর্থাৎ অপরাধ প্রমাণিত না হলে বা তাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকলে শরীয়তের নির্দিষ্ট 'হদ্দ'-ও কার্যকর হবে না। এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (সা)-এর ঘোষণা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি বলেছেন ঃ

اِدْرَاُوْ الْحُدُوْدَ بِالشُّبْهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ

সন্দেহের ক্ষেত্রে তোমরা যতদূর সম্ভব 'হদ্দ' সমূহকে ঠেকাও (Parry)।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

فَلاَنَ يُخْطِئَ الاِمَامُ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يُخْطِئَ فِى الْعُقُوْبَةِ –

শাস্তি কার্যকরকরণে ভুল করার তুলনায় ক্ষমা করে ভুল করা অনেক বেশি উত্তম।

ইতিহাস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, সামজ যখনই শরীয়তের 'হদ্দ' সমূহ কার্যকর করেছে এবং জনগণ আল্লাহ্‌র আইন মেনে জীবন যাপন করেছে, তখনই মানুষ পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে নিশ্চিন্ত জীবন-যাপনের সুযোগ পেয়েছে। আর শরীয়তের বিধান কার্যকরকরণের প্রতি যখনই উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে, গোটা সমাজকে গ্রাস করেছে ব্যাপক বিপর্যয়, অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা ও চরম দুর্যোগ। অপরাধের বিষধর অজগর তখন ফণা বিস্তার করেছে চতুর্দিকে। পরন্তু দেশীয় আইন (Law of the Land) যখন শরীয়তের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে—অন্য কথায়, শরীয়তই যখন 'দেশের আইন' রূপে স্বীকৃত হয়ে কার্যকর হয়েছে এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি কার্যকর হয়েছে, তখনই গোটা সমাজ সমষ্টি সংরক্ষিত হয়েছে, বেঁচে থেকে মুখ পেয়েছে, সমাজব্যবস্থা ও সমাজ-সংস্থা উভয়ই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, তার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়েছে এবং তার উন্নতি-অগ্রগতিও নির্বিঘ্ন হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নত নৈতিকতাই ইসলামী সমাজের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর। ঈমানদার লোকদের সমাজ তারই উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, এটাই বাঞ্ছনীয় এবং এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানবরচিত আইন দীনের ভিত্তিকে অগ্রাহ্য করে এবং নৈতিকতার গুরুত্ব আদপেই স্বীকার করে না। ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্ব স্বীকার করার সাথে সাথে আইনের কার্যকর শাসনেরও গুরুত্ব সমানভাবে স্বীকৃত। মানবরচিত আইন ও

www.pathagar.com

ইসলামী আইনের মধ্যকার এ পার্থক্যের কারণ, ইসলাম-বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র রচিত বিধান—যিনি সর্বপ্রকারের ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে, তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কিন্তু অধুনা প্রচলিত আইনের রচয়িতা হচ্ছে স্বয়ং মানুষ। আর মানুষ যে ভুলে যায়, ভুল করে, তা তো সর্বজনজ্ঞাত ও সর্বজনস্বীকৃত সত্য।

এই দৃষ্টিতে ইসলামী শরীয়তের 'হদ্দ'সমূহ আধুনিক আইনের দণ্ডবিধানের সহিত তুলনা করে মূল্যায়ন করা হলে দেখা যাবে, প্রচলিত আইনের দর্শনে সাধারণভাবে সমষ্টির স্বার্থ অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। অর্থাৎ অপরাধের শাস্তিদানের লক্ষ্য শুধু সমাজ সমষ্টির কল্যাণ সাধন মাত্র, ব্যক্তি সেখানে উপেক্ষিত।

এখানে চিন্তা-বিবেচনার কতকগুলি আধুনিক দিকও রয়েছে। যেমন শাস্তিদানের অধিকার, নিরংকুশ সুবিচার ও ন্যায়পরতা চিন্তার উপর ভিত্তিশীল। কেননা শাস্তিদানের চূড়ান্ত লক্ষ হচ্ছে সুবিচার চেতনার চরিতার্থতা। এই পর্যায়ে উভয় দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পক্ষেও অভিমত গড়ে উঠেছে। তার ভিত্তি হচ্ছে, শাস্তিদানের অধিকার গড়ে উঠেছে সুবিচার ন্যায়পরতার চিন্তা ও স্বার্থলাভের শুভ ইচ্ছার সমন্বয়ে।

বস্তুত ইসলামে আইন প্রণয়নের গোটা ব্যাপারটিই ইসলামী ভাবধারাসঞ্জাত সুবিচার চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর 'হদ্দ'সমূহ কার্যকর হওয়া তো আল্লাহ্‌র বিশেষ অধিকারের ব্যাপার। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বীকারোক্তি কিংবা অকাট্য প্রমাণের উপরে ভিত্তিশীল যে রায় হবে, তা কোনক্রমেই পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা ক্ষমা প্রদর্শনের কোন অধিকার স্বয়ং বিচারকেরও থাকতে পারে না।

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে শরীয়ত নিষিদ্ধ, ক্ষতিকর কাজ করা এবং শরীয়তে নির্দেশিত কাজ বাস্তবায়িত না করা—এই দু'টিকেই অপরাধ (Crime) বলা হয়েছে, আর সেই অপরাধকে দমন করার লক্ষ্যে প্রথমে সেজন্য 'হদ্দ' বা কিসাস কিংবা তা'যীর রয়েছে বলে ঘোষণা করে সে ব্যাপারে লোকদের ভীত-সন্ত্রস্ত—সতর্ক করার পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণ আইনের সাথে এই সংজ্ঞার কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা তাতেও অপরাধ হচ্ছে সেই কাজ করা, যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যা করতে পূর্বাহ্নে নিষেধ করা হয়নি, তা করা নিশ্চয়ই অপরাধ হতে পারে না। আইন যে কাজ করতে নিষেধ করে না, তা করা থেকে বিরত থাকাটা ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার। সেজন্য জোর করা যায় না। শরীয়ত শাস্তি নির্ধারণ করেছে তার নিষিদ্ধ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখার এবং যে কাজের আদেশ করেছে তা করা থেকে বিরত না থাকার জন্য ব্যক্তিদের প্রস্তুত করার লক্ষ্যে। কাজটি করার পূর্বে এই শাস্তি হচ্ছে সকলের জন্য প্রতিরোধকারী। আর কাজটি করার পরে তা অপরাধকারীর জন্য অপরাধের শাস্তি এবং অন্যান্যদের জন্য প্রতিরোধক সতর্ককারী শাস্তি। স্বতঃই কল্যাণ নয়, বিপর্যয়ও বটে। শরীয়তে তার বিধান করা হয়েছে কেবলমাত্র এই কারণে যে, তা সমষ্টির বিপর্যয় রোধ করে এবং অপরাধকারীর নিজের জন্য কল্যাণ নিয়ে আসে।

www.pathagar.com

ইসলাম কেবলমাত্র ইহকালীন শাস্তিরই ব্যবস্থা করে ক্ষান্ত হয়নি, পরকালীন শাস্তিরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছে। যেসব অপরাধ প্রমাণ করা এ জগতে সম্ভব হয়নি কিংবা কোন না কোন উপায়ে ইহকালীন শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয়েছে, সেসব অপরাধের শাস্তি পরকালে অবধারিত। এই পরকালীন শাস্তির কথা এই দুনিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে এই পর্যায়ে অপরাধ থেকে মানুষকে বিরত রাখার লক্ষ্যে। অন্তরে নিহিত হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নৈতিক অপরাধ এই পর্যায়ে গণ্য। এই অপরাধের জন্য ইহকালীন শাস্তি নির্ধারিত হয়নি। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধ এ দুনিয়ায় প্রমাণ করা সম্ভব বলে মনে করা হয়েছে, সেগুলির জন্য ইহকালীন শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। বিচার বিভাগ সে অপরাধের বিচার করবে এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সে শাস্তি কার্যকর করবে।

ইসলামী আইনে নির্ধারিত বৈষয়িক শাস্তি দুই প্রকারের। একটি হচ্ছে সুনির্দিষ্ট শাস্তি সেই অপরাধের, যার প্রতিক্রিয়া সমাজ-সমষ্টির ক্ষেত্রে কঠিন ও মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যা নির্ধারণ করার দায়িত্ব শরীয়তদাতা-ই অর্পণ করেছে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর, যেন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরিবেশের প্রেক্ষিতে অপরাধের মারাত্মকতার মূল্যায়ন করে নির্ধারণ করা যায়। অপরাধের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীই অধিক ও সাধারণ। কেননা প্রত্যেকটি অপরাধের জন্যই শরীয়ত বৈষয়িক শাস্তি নির্ধারিত হয়নি। শরীয়তের অকাট্য দলীল (نص) দ্বারা প্রমাণিত নয়— এমন বহু অপরাধও এর আওতায় পড়ে। এসব শাস্তির ক্ষেত্রে খুব বেশি শর্ত আরোপ করা হয়নি বলে 'হদ্দ' কার্যকর করার ব্যাপারে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই পর্যায়ের শাস্তিকে তা'যীর নাম দেওয়া হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম তা'যীর'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাষায় ঃ

اَلتَّعْزِيْرُ مَشْرُوْعٌ فِىْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيْهَا حَدٌّ بِحَسْبِ الْجِنَايَةِ فِى الْعِظَمِ وَ الصِّغَرِ وَ حَسْبِ الْجَانِىْ فِى الشَّرِّ وَعَدَمِهِ –

যে অপরাধে বা গুনাহের কাজে অপরাধের বড়ত্ব বা ছোটত্বের অনুপাতে এবং অন্যায়ে ও অ-অন্যায়ে অপরাধীর ভূমিকার দৃষ্টিতে কোন 'হদ্দ' নির্দিষ্ট হয়নি, সেসব ক্ষেত্রেই তা'যীব বিধিবদ্ধ।

তিনি আরও লিখেছেন ঃ

وَ التَّعْزِيْرُ يَتَغَيَّرُ بِحَسْبِ اقْتِضَاءِ الْمُصْلِحَةِ لَه زَمَانًا وَ مَكَانًا وَ حَالاً

স্থান-কাল-অবস্থার দৃষ্টিতে কল্যাণের দাবি অনুপাতে তা'যীর পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

অতএব তাতে অপরাধের বিপদ মাত্রা অনুপাতে শাস্তি নির্ধারিত হবে। আসল অপরাধীর মনে সে অপরাধ প্রবণতার মৌলিকতার প্রতিও লক্ষ্য দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

মালিকী মযহাবের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন ঃ

يَجُوْزُ الزِّيَادَةُ فِى التَّعْزِيْرِ عَنِ الْحَدِّ الْمُقَدَّرِ لِجِنْسِ الْجَرِيْمَةِ –

সমজাতীয় অপরাধে যে 'হদ্দ' নির্দিষ্ট, তা'যীর তার তুলনায়ও অধিক হতে পারে। ইবনে আবিদীন হানাফী মতের বিশেষজ্ঞদের রায় উদ্ধৃত করে লিখেছেন ঃ

اِنَّ مَا لاَ قَتْلَ فِيْهِ عِنْدَ هُمْ اِذَا تَكَرَّرَ فِعْلُهُ لِلاِمَامِ اَنْ يَّقْتُلَ فَاعِلَهُ –

তাদের মতে, যে অপরাধের শাস্তি হত্যা নয়, প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সেই অপরাধের পৌনপুনিকতাকারীকে সেজন্য হত্যার দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে।

অনুরূপভাবে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন ও কল্যাণ মনে করলে নির্দিষ্ট 'হদ্দ'-এর অধিক শাস্তি নির্ধারণ করতে পারে এই পর্যায়ের অপরাধে।

এই মতের দলীল হিসাবে উল্লেখ করা যায় হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের এই উক্তি ঃ

تُحْدَثُ لِلنَّاسِ اَقْضِيَةٌ بِقَدْرُ مَا يُحْدِثُوْنَ مِنْ فُجُوْرِ –

লোকেরা যতই অপরাধের বিভিন্ন ধরন ও রূপ উদ্ভাবন করবে, সেই অনুপাতে লোকদের বিচার ব্যবস্থাও উদ্ভাবিত হবে।

বস্তুত তা'যীর বিশেষ কোন কাজ বা বিশেষ কোন কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নবী করীম (সা) স্থানীয়ভাবে সামাজিক বয়কট বা সম্পর্ক ছিন্ন করা দ্বারাও তা'যীর করেছেন। সূরা তওবায় যুদ্ধে না—অংশগ্রহণকারী তিনজন সাহাবীর প্রতি এই শাস্তিই প্রয়োগ করার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ

وَ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ط حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْا اَنْ لاَّ مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلاَّ اِلَيْهِ – (التوبه – ١١٨)

যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত থাকা সেই তিনজনের উপর 'বয়কট' শাস্তি আরোপিত হয়েছিল। এমনকি (অবস্থা এতখানি সঙ্গীন হয়ে পড়েছিল যে) শেষ পর্যন্ত তাদের উপর এই বিশাল পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর সংকীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং স্পষ্ট মনে করে নিয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই।

নির্বাসন এবং কয়েদ—উভয় দণ্ডও তা'যীর হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। আর সাহাবীগণ আগুনে জ্বালানো ও বিপর্যয় সৃষ্টির সরঞ্জামাদি বিনষ্ট করার শাস্তিও দিয়েছেন এই তা'যীর হিসাবেই এবং হযরত উমর (রা) তা'যীর হিসাবেই জরিমানা বাবদ মাল গ্রহণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

অতএব দেখা যাচ্ছে, তা'যীরী শাস্তি হিসাবে ওয়াজ-উপদেশ (To exhort, warning) তীব্র কঠোর সরকারী ভৎসনা (Reprimand) এবং কারারুদ্ধকরণ, প্রয়োগ ও কার্যকর করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) একটা অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছিলেন। ঋণ ফেরত দেয়নি এমন ঋণী ব্যক্তিকে আটক করা জায়েয বলে সব ফিকহ্‌বিদই ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে 'লিয়ান' করেছে অথবা নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে, তাকে 'হদ্দ' করা হয়েছে। হানাফী মতে এই 'হদ্দ' হচ্ছে কয়েদ সহকারে নির্বাসন। দোর্‌রা মারাও হত্যা ও তা'যীরী শাস্তি হতে পারে, যেমন পূর্বে বলেছি। একই ব্যক্তির পৌনপুনিক অপরাধের দরুন তা'যীর হিসাবে তাকে হত্যা করাও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের জন্য জায়েয। অবশ্য সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ার দরুন অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ শাস্তিও রহিত হয়ে গেছে। বিচারক জরিমানাও ধার্য করতে পারেন। হানাফী মতের ইমাম আবূ ইউসুফ ও মালিকী মতের ফিকহ্‌বিদগণ এই মতই দিয়েছেন। যার উপর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তার অথবা তার অভিভাবকের জন্য তা'যীরী হুকুম নিষেধ বা অকার্যকর করার কোন অধিকার থাকতে পারে না। কেননা এই শাস্তিদানটা একমাত্র তারই অধিকারের ব্যাপার নয়। তাতে সমাজ-সমষ্টির অধিকারও নিহিত রয়েছে। বিচারক তার তা'যীর কার্যকর করেন সমাজ সমষ্টির প্রতিনিধি হিসাবে।

এ থেকে এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামী শরীয়ত অপরাধ সংক্রান্ত সাধারণ দলীল বর্তমান থাকার শর্ত করেনি, যা থেকে অপরাধ ও তার শাস্তি প্রমাণিত হতে পারে। অপরাধ বিচিত্র ধরনের এবং তার শাস্তিও শাশ্বত। তাই সর্বপ্রকারের অপরাধে 'হদ্দ' নির্ধারণ ও তার শাস্তি পরিমিতকরণ কোন বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ হতে পারে না। শরীয়তে কেবল বিশেষ বিশেষ অপরাধের শাস্তি সুনির্ধারিত করা হয়েছে। সেগুলি ছাড়া অন্যান্য সব অপরাধে উপযুক্ত শাস্তি নির্ধারণের দায়িত্ব প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করা হয়েছে এবং তা সবই তা'যীরী অপরাধের মধ্যে গণ্য। আর তা'যীরী শাস্তিসমূহ নির্ধারণ করা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাভুক্ত। তা সামান্য মাত্রায়ও নির্ধারিত হতে পারে, হতে পারে উচ্চতর মাত্রায়ও। বিচারক রায় দেওয়ার সময় এই নির্ধারণের আওতার মধ্যে অপরাধের মাত্রার সহিত সামঞ্জস্যশীল শাস্তি নির্ধারণ করবে—এটা তার কর্তব্য।

সাধারণভাবে অপরাধের তিনটি দিক থাকে ঃ

১. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীয়তের বিধান থাকবে শরীয়তের মৌল নীতি (Principle)।

২. অপরাধী পূর্ণবয়স্ক সুস্থ বিবেক সম্পন্ন হবে। তা হচ্ছে দায়িত্বশীলতার মৌল নীতি।

৩. অপরাধী এমন একটা কাজ করবে, যা সাধারণত অপরাধরূপে গণ্য।

এ কয়টি হচ্ছে শাস্তির বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তি।

www.pathagar.com

প্রথম ঃ শরীয়তের মৌল নীতি

এই মৌল নীতির তাৎপর্য হচ্ছে মানুষ যে কাজ-ই করবে, অপরাধ আইনের চোখে তা মুবাহ্ (দোষমুক্ত কাজ) তবে যে কাজটিকে নিষিদ্ধ করে আইনে কোন ধারা উদ্ধৃত হয়েছে, কেবল মাত্র সেই কাজটি করাই অপরাধ গণ্য হবে। সেই অপরাধের একটা শাস্তিও সুনির্দিষ্ট হতে হবে, যা সে অপরাধকারীর উপর ধার্য করা হবে। যে স্থানে এবং যে সময়ে সে কাজটি করা হবে, সেখানে এবং সেই সময়ে সেই কাজটির নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও সর্বজনবিদিত হতে হবে।

এই মৌল নীতির সারকথা হচ্ছে ঃ

১. অপরাধ সাব্যস্তকারী আইনটি সুস্পষ্ট হতে হবে এবং সে আইন জারির পূর্বে কৃত অপরাধের উপর তা প্রযোজ্য (Retrsopective affect) হবে না।

২. ফৌজদারী অপরাধের বিচারক কিয়াস (Analogy) ও সংকীর্ণ ব্যাখ্যার নিয়মের আশ্রয় নেবেন না। যদিও ফৌজদারী আইন উদ্ঘাটনকারী ব্যাখার মত ও খুটিনাটি কিয়াসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

বস্তুত এই মৌল নীতির অবতারণায় ইসলামী শরীয়ত মানবরচিত সমস্ত আইনকে ছাড়িয়ে গেছে। কুরআনের একটি অকাট্য সুস্পষ্ট ঘোষণা এই পর্যায়ের মৌল নীতি উপস্থাপিত করেছে। ঘোষণাটি হচ্ছে ঃ

وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً – (الاسرا – ١٥)

রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমরা কাউকে আযাব দেই না।

অর্থাৎ আযাব দেওয়ার পূর্বে রাসূল পাঠিয়ে আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার ব্যবস্থা করি যে, কোন্ কোন্ কাজ নিষিদ্ধ এবং তাতে কি কি আযাব হতে পারে।

প্রশাসনিক আইনের ক্ষেত্রেও এই মৌল নীতি প্রযোজ্য অর্থাৎ ইসলামের কোন আইনেরই Retrsopective affect হয় না।

ইসলামী ফিকহ্র দার্শনিকগণ এই ঘোষণার ভিত্তিতেই এই মৌল নীতির উদ্ভাবন করেছেন ঃ

لاَ حُكْمَ لاَفْعَالِ الْعُقَلاَءِ قَبْلَ وُرُوْدِ النَّص –

অকাট্য দলীল জারি হওয়ার পূর্বে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের কোন কাজের ব্যাপারেই কোন শাস্তির হুকুম কার্যকর হতে পারে না।

আর এরই আলোকে এই মৌল নীতিও গঠিত হয়েছে ঃ

اَنَّ الاَصْلَ فِى الاَشْيَاءِ وَ الاَفْعَالِ الاِبَاحَةُ –

সব জিনিস ও সব কাজেরই মূলকথা হচ্ছে, তা মুবাহ—'হারাম নয়।

www.pathagar.com

কেননা শরীয়তে হারাম করার কাজটি দু'প্রকারের ঃ

১. সেসব অপরাধ, যার জন্য 'হদ্দ' ঘোষিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে বড় বড় অপরাধ, যে সম্পর্কে অকাট্য দলীল আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এ বলে যে, তা করা হলে তাকে সেই শাস্তি দেওয়া হবে। তা নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হবে। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তাতে কোন সমঝোতা বা ক্ষমার একবিন্দু অবকাশ থাকে না। এই কারণেই রাসূলে করীম (সা) বলেছিলেন ঃ

لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا –

মুহাম্মদ তনয়া ফাতিমাও যদি চুরি করে—চুরি করা প্রমাণিত হয়—তাহলে স্বয়ং মুহাম্মদ-ই তার হাত কেটে দেবে।

'অপরাধের অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারটি ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এজন্যই সূক্ষ্ম সতর্কতার কারণে প্রমাণের ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হলে 'হদ্দ'ও অকার্যকর থাকবে—এই নীতি রচিত হয়েছে।

২. দ্বিতীয় তা'য়ীরী পর্যায়ের অপরাধ। আর এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড় বিভাগ। খুব বেশি সাধারণ এবং ইসলামী আইনের বিবর্তনের এটাই চাবিকাঠি। অপরাধ দমন এবং সেজন্য শাস্তি প্রদানে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে—যদি সে অপরাধ 'হদ্দ' জারি হওয়ার আওতা-বহির্ভূত হয় এবং তা কার্যকর হবে ইসলামের নিরংকুশ সুবিচারের তাৎপর্য সহকারে। তা'যীরী অপরাধসমূহ সাধারণত ও বেশির ভাগ সূচিত হয় প্রচলিত নিয়মে। পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা'যীরী পর্যায়ের অপরাধে বিনিময় এবং ক্ষমাদান ও গ্রহণের অবকাশ থাকে।

তবে মনে রাখতে হবে,ইসলামী শরীয়তে অপরাধ সংক্রান্ত আইন ঘোষণার কোন ভূতাপেক্ষা কার্যকরতা (Retrospective affect) কার্যকরতা নেই। এটাই হচ্ছে মৌল নিয়ম। তবে দু'টি কারণ এই কার্যকরতা না থাকা থেকে ব্যতিক্রম (Exception) ঘটায় ঃ

একটি হচ্ছে, মারাত্মক ধরনের অপরাধ, যা সাধারণ জনশৃঙ্খলা ও শান্তি নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। যেমন কঠিন ব্যাপক মারামারি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হওয়া এবং দাম্পত্য ক্ষেত্রে 'জিহার' ও ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ফৌজদারী অপরাধের আইন অপরাধীর কল্যাণে প্রয়োগ করা।

শরীয়তের মৌল নীতির দাবি হচ্ছে ফৌজদারী আইন সমস্ত প্রকারের অপরাধেই—যা ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে করা হবে—করবে কোন মুসলমান বা যিম্মী–অবশ্যই প্রযোজ্য হতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক অনৈসলামী রাষ্ট্রে গিয়ে যেসব অপরাধ করবে, তার উপরও তা অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। অবশ্য 'ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিপরীত মত দিয়েছেন। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ, আবূ ইউসুফ প্রমুখ ফিকহ্‌বিদ

www.pathagar.com

মত দিয়েছেন যে, কেবলমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের আওতা বা সীমার মধ্যে যে অপরাধ করা হবে এবং তথায় নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় গ্রহণকারী (مستأمن) বিদেশী ব্যক্তিরাও যে অপরাধ করবে সেই সকলেরই উপর এ আইন কার্যকর হবে। কেননা সেসব অপরাধের দরুন ব্যক্তি বা সাধারণ জন-মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন হয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) এই আইনের প্রয়োগ কেবল সেসব অপরাধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান, যা দ্বারা কেবল ব্যক্তিগণের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দ্বিতীয় ঃ ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীলতার মৌল নীতি

এই পর্যায়ে আলোচিতব্য হচ্ছে অপরাধকারীর সহিত অপরাধ কার্যের সম্পর্ক প্রমাণ। অর্থাৎ আইন যে কাজটিকে অপরাধ গণ্য করেছে সেই কাজটি যে করল, তার সহিত সেই কাজটির সম্পর্ক বিবেচনা ও প্রমাণ করা। কেননা এই সম্পর্ক প্রমাণিত হলেই না সে তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি পাওয়ার অধিকারী বা উপযুক্ত হবে। ফৌজদারী অপরাধ কাজের দায়িত্বশীলতা প্রমাণের জন্য জরুরী হচ্ছে, কাজটি ও অপরাধীর মধ্যকার সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ। এই সম্পর্কটি দু'টি দিক দিয়ে বিবেচ্য ঃ

১. বাস্তবতার দৃষ্টিতে অপরাধী ও শাস্তিযোগ্য ঘটনার মধ্যকার বস্তুগত সম্পর্ক। এই সম্পর্কটির নামকরণ হবে বস্তুগত সম্পর্কের দিক দিয়ে।

২. ভাবগত বা তাৎপর্যগত সম্পর্ক। অপরাধীর তাৎপর্যগত তৎপরতা ও মূল ঘটনাটির মধ্যকার সম্পর্ক। তাৎপর্যগত তৎপরতা বলতে বোঝায় অপরাধীর ভুল ও গুনাহ্ (একে 'তাৎপর্যগত সম্পর্ক স্থাপন'ও বলা যেতে পারে)। ইসলামী শরীয়ত এবং প্রধান অপরাধ আইনসমূহ বস্তুগত সম্পর্কের পাশাপাশি তাৎপর্যগত সম্পর্কের ব্যাপারটিও বিবেচনা করা পক্ষপাতী।

ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীলতা পর্যায়ে যে কয়টি মত প্রকাশিত হয়েছে, তন্মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মতসমূহ এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

১. বস্তুগত মত

তাতে দেখা হয় যে, অপরাধকারী অপরাধ করার কারণে অপরাধ ক্রিয়া সঞ্জাত পরিণতি ও যাবতীয় ফলাফলের জন্য দায়ী কিনা।

২. ইচ্ছার স্বাধীনতার মত

অপরাধটি ইচ্ছামূলকভাবে গৃহীত একটি পন্থা, যা গুনাহ্র রূপ পরিগ্রহ করে এবং অপরাধজনিত দায়িত্বশীলতাকে গুরুত্বর করে তোলে। আর এই কারণেই অপরাধজনিত দায়িত্বশীলতা ভিত্তিগতভাবে নৈতিক দায়িত্বশীলতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়—যতক্ষণ পর্যন্ত তা কোন নৈতিক তাৎপর্যের উপর ভিত্তিশীল থাকবে। তা গুনাহ হোক বা ভুল হোক। আর এই মতটি সমসাময়িক বস্তুগত ও বিজ্ঞানসম্মত সংস্কৃতির ছায়াতলে মনের উপর প্রভাবশীল হয়ে থাকবে চিরকাল।

www.pathagar.com

৩. অনিবার্যতার মত

এই মতটি মনে করে যে, যে কাজটি কোন ক্ষতির কারণ হয় এবং কোন বিপদ ঘটায়, সেই কাজটি যে করে, তাকে সমাজ সমষ্টির দিক থেকে প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়ার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।

৪. সমন্বয়মূলক মত

শেষ পর্যন্ত এমন একটা দিকের নির্দেশনা পাওয়া গেল, যা ইচ্ছার স্বাধীনতা ও অনিবার্যতা—এই দুইটি মতকে সমন্বিত করে এবং শাস্তি দানের চিন্তা ও রক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা এবং ইচ্ছা-স্বাধীনতার বাধ্যবাধকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এই মতের লোকেরা বলেছেন ঃ আসল হচ্ছে ইচ্ছার স্বাধীনতা' তবে এই স্বাধীনতা নিরংকুশ নয়, সকলের নিকট সমান মানেরও নয়। তা নিরংকুশ নয় এইজন্য যে, মানুষ ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার উপর বাধা নিষেধ আরোপ করে থাকে। তা উত্তরাধিকারে পরিণত হয় অথবা পরিণত হয় স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা নিহিত পরিবেশে। তা সমান মানের নয় এই কারণে যে, তা ঝোঁকা-প্রবণতার দিক দিয়ে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে পার্থক্য সম্পন্ন হয়ে থাকে ; পার্থক্য সম্পন্ন হয়ে থাকে কাল ও ক্ষেত্রের পার্থক্যের কারণেও। এ জন্য শরীয়তদাতার কর্তব্য হয়ে পড়ে ব্যক্তিগণের অপরাধ থেকে সমাজ-সমষ্টিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা। এসব ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা অনুভূতি না থাকা বা তাদের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যশীল পদক্ষেপসমূহ গ্রহণে অক্ষম হওয়ার দরুন শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

আধুনিক আইনে ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্র হচ্ছে জীবন্ত মানুষ, অন্য কেউ নয়। কেননা রাষ্ট্র তার অধিকার সরাসরি শাস্তিদানে নিহিত বলে মনে করে। এই শাস্তিদানই রাষ্ট্রের প্রকৃতির (Nature) সংরক্ষক, তা শাস্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তাদানকারী। এ কারণে অপরাধের কাজ যে-ই করবে, তারই উপর শাস্তি কার্যকর করতে হবে। এই কারণেই শাস্তিটা ব্যক্তিগত হয়ে গেছে। আর যার বিবেক-বুদ্ধি এখনো পরিপক্ক হয়নি, যার অনুভূতি বিলুপ্ত এবং যার উপর জোর প্রয়োগ হয়েছে, এদের উপর থেকে অপরাধের দায়িত্বশীলতা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন বালক অপরাধী হলে তার জন্য হালকা ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন মৌলিকভাবেই ঘোষিত হয়েছে যে, কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ও শাস্তিদান শরীয়তের অকাট্য দলীল ছাড়া হতে পারে না এবং অপরাধের প্রতিক্রিয়া কি তা বিবেচনা ব্যতীতও হয় না। আর জীবন্ত মানুষ যার ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীল হওয়ার যোগ্যতা পূর্ণমাত্রায় অর্জিত হয়েছে—ফৌজদারী অপরাধের জন্য কেবল মাত্র তাকেই দায়িত্বশীল মনে করা যেতে পারে। এই যোগ্যতা না থাকলে দায়িত্বশীলতা (Responsibility) চাপানো যায় না। যেমন ফৌজদারী কাজের অপরাধী যদি পাগল হয় বা বিবেক-বুদ্ধিতে অসুস্থতা দেখা দিয়েছে—এমন

www.pathagar.com

ব্যক্তি হয় অথবা এমন বালক হয়, যার কাণ্ডজ্ঞান এখনো হয়নি কিংবা যার ইচ্ছা প্রতিভায় কোন ত্রুটি দেখা দিয়েছে যেমন খুব বেশি প্রয়োজনের সময় বা অদৃশ্যভাবে জোর করা হয়েছে এমন সময় অপরাধটা করা হয়েছে, অথবা মাদক দ্রব্য পানের কারণে সেই প্রতিভা বিলুপ্ত থাকা অবস্থায় অপরাধ করা হয়েছে, তাহলে তার উপর শাস্তি প্রযোজ্য হবে না—কার্যকর করা যাবে না।

ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীলতা সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণের সমস্ত নিদর্শন ইসলামী শরীয়তের আওতাধীন। এই দৃষ্টিকোণটি সম্পূর্ণরূপে নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআনের ঘোষণায় ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীলতা ও শাস্তির ব্যাপারে ইচ্ছা-ইখতিয়ার ও গুনাহের মৌল নীতি বিধৃত। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى وَ اَنْ لَّيْسَ الاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى وَ اَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الاَوْفَى (النجم ٣٨ – ٤٠)

কোন বোঝা বহনকারীই অপরাধের বোঝা বহন করবে না এবং মানুষের জন্য শুধু তা-ই যার জন্য সে শ্রম করবে এবং তার শ্রম অবশ্যই দেখা যাবে ও তাঁর পূর্ণমাত্রার প্রতিফল তাকে দেওয়া হবে।

এখানে 'বোঝা' গুনাহের সমার্থক এবং শ্রম বা চেষ্টা ইচ্ছামূলক কাজ বোঝায়। আর প্রতিফল অর্থ অপরাধের শাস্তি।

এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, অপরাধের দায়িত্বশীলতায় নৈতিক ভিত্তির উপর আইন রচনা করার নীতি গ্রহণে মানবরচিত আইনের তুলনায় ইসলামী আইন অগ্রবর্তী রয়েছে। অকাট্য আইন লংঘন করে মানুষ ইচ্ছামূলকভাবে যে সব কার্যকলাপ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার পরিণতি গ্রহণ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক। অতএব আইন লংঘনে শাস্তি দানের ভয় প্রদর্শন 'শরীয়ত পালনে বাধ্য ব্যক্তির' নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল থাকছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব-ইচ্ছায় করা কাজের বিচারের ফল ভোগকারী হবে, একথা অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হচ্ছে। এর পক্ষের সমর্থনে দলীল হিসাবে এই আয়াতটি দ্রষ্টব্য ঃ

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً (الاسرا – ١٥)

যে লোক হিদায়ত অবলম্বন করল, সে হিদায়ত গ্রহণ করে নিজেরই কল্যাণ করল। আর যে লোক গুমরাহী অবলম্বন করল, তার এই গুমরাহীর ফল তাকেই ভোগ করতে হবে এবং কোন বোঝা বহনকারীই অন্য কারোর বোঝা বহন করবে না। চূড়ান্ত কথা, আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকেই আযাব দেই না।

www.pathagar.com

অতএব শরীয়ত যদিও দায়িত্বশীলতার ভিত্তি বানিয়েছে অনুভূতি ও ইচ্ছা এবং যার অনুভূতি ও ইচ্ছা-ক্ষমতা নেই, তারদায়িত্বশীলতাও নেই বলেছে, তা সত্ত্বেও এইবিবেচনায় দায়িত্বহীন ব্যক্তিও যদি কোন অন্যায় করে, তাহলে তার এই দুষ্কৃতির প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে। কেননা সমাজকে রক্ষা করার জন্য শাস্তিদান একটা সামষ্টিক প্রয়োজন।

ইসলামে কাজের দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্র হচ্ছে সেই মানুষ, যার অনুভূতি সুস্থ, যে লোক স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা-ক্ষমতা সম্পন্ন এবং এ কারণে শীরয়ত পালনে বাধ্য। কেননা শরীয়ত পালনের যোগ্যতা আছে, সুস্থ অনুভূতি বহাল এবং ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকারী—কোন ব্যক্তি সম্পর্কে একথা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্ব চাপানো যেতে পারে না। একথা আল্লাহ্‌র নিম্নোদ্ধৃত বাণী থেকেও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ঃ

اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُه مُطْمَئِنٌّ بِالاِيْمَانِ – (النحل – ١٠٦)

তবে যদি কেউ (নিপীড়ন বা হত্যার হুমকিতে) (কুফরি কাজে) বাধ্য হয় কিন্তু তার দিল ঈমানের সহিত দৃঢ়স্থিত, (তাহলে তার এই কুফরি ধর্তব্য হবে না—সে ক্ষমা পেয়ে যাবে)।

এ আয়াতের ভিত্তিতে (اكراه) 'জোর-জবরদস্তি-নিপীড়ন ও হত্যার ভয়' দেখানোর কারণে কেউ কুফরি করলে ইসলামী শরীয়তে তাকে সে জন্য দোষী সাব্যস্ত করা ও পাকড়াও করা হবে না। ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ একে শরীয়তের একটা মৌল নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ জোর-জবরদস্ত বা অত্যাচার-নিপীড়নে পড়ে মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ার কারণে যদি কেউ কোন কুফরি কাজ করে, তাহলে তাকে কাফির গণ্য করা হবে না, এ জন্য তাকে শাস্তিও দেওয়া হবে না, শরীয়তের কোন হুকুম তার উপর কার্যকর হবে না।

(الجامع لا مكام القرآن – ج ١٠ ص ١٨٢) –

আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ (البقره – ١٧٣)

যে লোক কঠিনভাবে বাধ্য হয়ে পড়বে—কিন্তু সে নিজে বিদ্রোহী নয়, সীমা-লংঘনকারীও নয় (এ রূপ অবস্থায় গুনাহ করা হলে) তার উপর কোন গুনাহ্ চাপানো হবে না।

এই প্রেক্ষিতেই নবী করীম (সা)-এর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ –

www.pathagar.com

[illegible]র থেকে ভুল-ভ্রান্তি, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদের জোরপূর্বক [illegible]ব, তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।[১]

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম লিখেছেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছুকে তার সৌন্দর্যের অলংকারস্বরূপ বানিয়েছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে তার বান্দাদের পরীক্ষা করা, তাদের যাচাই-পরখ করা এবং তাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে তা বের করা। তাদের নিজেদের মধ্যেই পরীক্ষার উপায়-উপকরণসমূহ প্রস্তুত ও সজ্জিত করে রেখেছেন। তাদেরকে বিবেক বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি, ইচ্ছা-সংকল্প-কামনা-বাসনা-লালসা ও নৈতিকতার অনুভূতি দান করেছেন। এ নৈতিকতা উপরিউক্ত উপকরণের অনিবার্য দাবি। যেমন তাদের জন্য বাইরের দিক দিয়েও অনেক কারণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বৈষয়িক মুনাফা লাভ ও আন্তরিক সুখানুভূতিও সৃষ্টি করেছেন। এগুলি ব্যক্তিকে আমল বা কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাকে প্রেরণা দেয়। যেমন এমন কিছু ভাবধারা ও কার্যকারণ তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যা তাদের মন ঘৃণা করে এবং তা দূর করার জন্য কাজ করে। মানুষকে তাদের মনে আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে অবাধ করে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। বরং তাদের প্রকৃতিতে ও বিবেক-বুদ্ধিতে ভাল-মন্দ ও সেসবের কারণ-উপকরণ চিনবার যোগ্যতা পুঞ্জীভূত করে রেখেছেন এবং রাসূলের জবানীতে এ বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। ভাল ওয়াদা, মন্দ ওয়াদা, আগ্রহ সৃষ্টির পথ ও পন্থাও তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যে কাজের আদেশ তাদের দেওয়া হয়েছে তা পালন করার এবং যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন করার ক্ষমতাও তাদের দেওয়া হয়েছে। তাদের মেজাজ-প্রকৃতিকে দমন করার ক্ষমতাও তাদের করায়ত্ত রয়েছে। কোন কোন যৌক্তিকতা এই ছিল যে, মানুষের জন্য সেই জিনিস হারাম করা হয়েছে, যা তাদের বিবেক-বুদ্ধি, শরীর-দেহ ও ধন-মালের জন্য ক্ষতিকর, যা তাদের ব্যক্তি, সমষ্টি ও সামষ্টিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক। এসব কাজের দরুন তাদের জন্য শাস্তির বিধান করেছেন। এই শাস্তি তাদের লোভ-লালসার পথ বন্ধ করে এবং তাদের সীমালংঘন প্রতিরুদ্ধ করে।[২]

---

১. ইমাম কুরতুবী লিখেছেন ঃ হাদীসটির সনদ সহীহ না হলেও এর তাৎপর্য ও প্রতিপাদ্য সর্বসম্মতভাবে সহীহ্। কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবীও এই কথাই বলেছেন। তবে আবূ মুহাম্মদ আবদুল হক লিখেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ্। আবূ বকর আল-উমাইলী ও ইবনুল মুনযিরও তাই উদ্ধৃত করেছেন।

(الجامع لا حكام القران ١٨٢ – ج ١٠)

২. اعلام الموقعين ج – ٢ ص ٢١٤ – ٢١٦

www.pathagar.com

এ কথা স্পষ্ট যে, অপরাধীকে পূর্ণবয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিমান হতে হবে। কেননা সুস্থ-বিবেক-বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সুস্থ অনুভূতি সম্পন্ন নয়। তার ইচ্ছা-ক্ষমতা আছে বলেও মনে করা যায় না। নাবালেগ ব্যক্তিও তারই মত। কেননা পূর্ণবয়স্কতা সেই বিবেক-বুদ্ধির ধারক, যা শরীয়ত পালনে বাধ্য হওয়ার জন্য জরুরী। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

وَ اِذَا بَلَغَ الاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور – ٥٩)

তোমাদের বালকগণ যখন পূর্ণবয়স্কতায় উপনীত হবে, তখন যেন তারা অনুমতি চায় যেমন অনুমতি চেয়েছে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা।

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ – الصَّبِىُّ حَتّى يَحْتَلِمَ وَ النَّائِمُ حَتّى يَصْحُوْا وَ الْمَجْنُوْنُ حَتّى يَفِيْقَ

তিনজনের অপরাধ ধরা হয় না ঃ বালক—যতক্ষণ না পূর্ণবয়স্ক হয়, নিদ্রিত ব্যক্তি—যতক্ষণ না নিদ্রামুক্ত হয় এবং পাগল—যতক্ষণ না সম্পূর্ণ সুস্থ হয়।

আল্লামা আ-মদী লিখেছেন ঃ

বিবেকবান লোকেরা সম্পূর্ণ একমত যে, শরীয়ত পালনে বাধ্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে—তাকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে, শরীয়ত পালনের দায়িত্ব অনুভবকারী হতে হবে। সচেতন বালক হয়ত তা বুঝে যা বুঝে অ-সচেতন বালক কিন্তু তার বোধশক্তি সংকীর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ। শরীয়তদাতা পূর্ণবয়স্কতাকে তার বুঝ-সমঝে পূর্ণত্বের মানদণ্ড বানিয়েছেন।

আল্লামা আ-মদী উপরক্ত মৌল নীতির ভিত্তিতে বলেছেন ঃ অ-বুদ্ধিমান ও মাতাল সচেতন বালকের অপেক্ষা-ও খুব বেশি খারাপ অবস্থায় অবস্থিত শরীয়তদাতার আদেশ-নিষেধ বোঝার দিক দিয়ে এবং কোন কাজের দরুন যেসব দায়-দায়িত্ব গ্রহণ কর্তব্য হয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে। যেমন জোর-জবরদস্তি করার দরুন একটি লোক চূড়ান্তভাবে ঠেকায় পড়ে বাধ্য হয়ে যায় কোন নিষিদ্ধ কাজ করতে, যার ফলে তার দায়িত্বশীলতা বিলুপ্ত হয় কিন্তু তার চাইতে কম মাত্রার বাধ্যবাধকতায় ব্যক্তি ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকারী থাকে....

(الاحكام فى اصول الاحكام ج اضر – ٢١٥)

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামী শরীয়তে অপরাধের দায়িত্বশীলতা দু'টি ভিত্তির উপর স্থাপিত ঃ

প্রথম, অপরাধের শাস্তি একটা সামষ্টিক প্রয়োজন, সমাজ সংরক্ষণের লক্ষ্যেই তা ফরয করা হয়েছে। আর প্রয়োজনের মূল্যায়ন হবে তার মূল্যে ও পরিমাণে।

এবং দ্বিতীয়, বস্তুগত শাস্তি গ্রহণের উপযুক্ত বিবেচিত হবে কেবল সেই ব্যক্তি, যার অনুভূতি আছে, যে ইচ্ছা প্রয়োগে সক্ষম।

www.pathagar.com

এর দরুন সমাজের সংরক্ষণার্থে কোন কোন তিরস্কারমূলক প
পথ বন্ধ হয়ে যায় না কিন্তু দায়িত্বশীল নয়—এমন ব্যক্তিদের কৃত দুষ্
প্রযোজ্য। তা প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

এই কারণেই ইসলামের প্রথম দিন থেকেই শরীয়তে অপরাধের দায়িত্ব চাপানোর ক্ষেত্র হচ্ছে সেই সুস্থ মানুষ, যার অনুভূতি ও ইচ্ছা-ক্ষমতা রয়েছে। কেননা 'শক্তি প্রয়োগে বাধ্য' (Forced) ব্যক্তি অপরাধের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা সম্পন্ন হয় না। কাজেই গণনার যোগ্য ব্যক্তিত্বের কল্যাণের জন্য দায়ী ব্যক্তির দ্বারা যদি নিষিদ্ধ কার্য সম্পাদিত হয়, তাহলে তার উপর অপরাধের দায়িত্বশীলতাও অর্পিত হবে সমষ্টির সংরক্ষণের স্বার্থে।

ইসলামী শরীয়তের মৌল নীতি হচ্ছে, কোন লোকই অন্য ব্যক্তির অপরাধের জন্য দায়ী হবে না। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার ব্যাপার এবং পূর্ণ মাত্রার ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকা অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজ করলে তবেই তার দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ اسَاءَ فَعَلَيْهَا (حم السجده – ٤٦)

যে লোক ভালো কাজ করবে, তা তার নিজের কল্যাণে আসবে। আর যে লোক খারাপ কাজ করবে, তার কুফল তাকেই ভোগ করতে হবে।

وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى (فاطر – ١٨)

কোন বোঝা বহনকারীই অন্যের বোঝা বহন করবে না।

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

لاَ يُؤَاخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْمَةِ اَبِيْهِ وَ لاَ بِجَرِمَةِ اَخِيْهِ –

কোন ব্যক্তিই তার পিতার বা তার ভাইয়ের অপরাধের জন্য দায়ী ও পাকড়াও হবে না।

কেউ যদি ভুল করে কোন অপরাধ করে কিংবা করে প্রায়—ইচ্ছার ভিত্তিতে তখন অপরাধী দিয়াত দিতে বাধ্য হয়। আর ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার মৌল নীতি ভিত্তিক সুবিচারের দাবি হচ্ছে, এই 'দিয়াত' সে একাকীই দেবে না, তাতে তার পৈতৃক দিক দিয়ে নিকটাত্মীয়রা অবশ্যই শরীক হবে। কেননা একাকী অপরাধীকেই তা দিতে হলে তা হবে একটি বড় যুলুম। আর ব্যক্তি ইচ্ছা করে অপরাধ করেনি বলে দিয়াত প্রদানের বোঝা বহনে তার শরীক হওয়ার দরুন তার বোঝা যেমন হালকা করা হয়, তেমনি যার উপর অপরাধ হয়েছে তার প্রাপ্যটা পাওয়ারও নিশ্চয়তা হয়।

আধুনিক কালের আইনসমূহ যদিও অপরাধের ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার মৌল নীতি গ্রহণ করেছে ; কিন্তু প্রায় বহুতর অবস্থায়ই ব্যক্তি অন্যের কাজের জন্য দায়ী

www.pathagar.com

সাব্যস্ত হয়ে থাকে। যেমন পত্রিকায় বা কিছু লেখা হবে—সে যে-ই লিখুক না কেন, তার জন্য সম্পাদক ও মুদ্রাকর-প্রকাশকই দায়ী হবে, সে অকুস্থলে অনুপস্থিত থাকলেও এবং তার অজ্ঞাতসারে ছাপা হয়ে থাকলেও।

তৃতীয় ঃ বস্তুগত স্তম্ভ

মানুষ কার্যত অপরাধ করলেই তা গণ্য হবে। মনের চিন্তা বা কল্পনা গণনার যোগ্য নয়। ইসলামী আইনের মূল কথা, মানুষের মনে যা কিছুই উদয় হয়, সেজন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না। খোদ রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لاُمَّتِىْ عَمَّا وَسْوَسَتْ اَوْ حَدَّثَتْ بِه نَفْسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ اَوْ تَتَكَلَّمْ

আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতের জন্য তাদের মনে যে ওয়াসওয়াসা জাগে বা মনে কোন কথার উদ্রেক হয়, তা ক্ষমা করে দিয়েছেন—যতক্ষণ পর্যন্ত তা কার্যত করা বা বলা না হয়।

ইমাম কুরতুবী রাসূলের উক্ত হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لاُمَّتِىْ عَمَّا حَدَّثَتْ بِه اَنْفُسُهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوْا اَوْ يَعْمَلُوْا بِه –

ইমাম কুরতুবী অতঃপর লিখেছেন ঃ

فَاِنَّا نَقُوْلُ – ذٰلِكَ مَحْمُوْلٌ عَلى اَحْكَامِ الدُّنْيَا مِثْلَ الطَّلاَقِ وَ الْعِتَاقِ وَ الْبَيْعِ الَّتِىْ لاَ يَلْزَمُه حُكْمُهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِه –

আমরা বলব, রাসূলে করীমের এই কথাটি দুনিয়ার প্রশাসনিক আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—তালাক, গোলাম মুক্তকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে যতক্ষণ ব্যক্তি কথা না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে না।

অতএব শুধু চিন্তা বা সংকল্প গ্রহণ করাতেই কেউ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না। অপরাধের কাজ শুরু করার মুহূর্তে (এখনও কাজটা করে বসেনি এরূপ অবস্থায়) ধরা পড়লে হালকা ধরনের শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে। আর কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর (ধরা পড়লে) পূর্ণ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য সাব্যস্ত হবে। নিজের মনে জেগে উঠা প্রতিরোধের দরুন বা মনে ক্রোধের সঞ্চার হওয়ার কারণে অপরাধ ঘটানো থেকে যদি ফিরে যায়, তাহলে তাকে কোন শাস্তি দেওয়া হবে না। কেননা সে তো অপরাধের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা থেকে বিরতই থেকেছে। তবে তওবা ছাড়া অন্য কোন কারণে যদি ফিরে যায়, তাহলে সে জিজ্ঞাসিত হবে। কেননা মূলত কাজটা তো অপরাধের এবং গুনাহ্। যেমন কেউ যদি ঘরের দরজা ভাঙ্গে বা সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকবার পূর্ণ ব্যবস্থা করার পর ঘরের লোকেরা টের পেয়ে যায় অথবা পাহারাদারের

www.pathagar.com

চোখে পড়েছে মনে করে চুরি কর্ম থেকে ফিরে যায় তাহলেও তাই হবে। পক্ষান্তরে চুরির উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ঘরের নিকটে লোকজন দেখতে পেয়ে অথবা পাহারাদারের টের পাওয়ার দরুন চুরি কাজ থেকে ফিরে এলে চুরকে শাস্তি দেওয়া হবে না। কেননা যতটা কাজ সে করেছে সেটা 'গুনাহ' রূপে গণ্য করা হয় না।

অপরাধীর অবস্থা এবং অবস্থা পার্থক্যের কারণে অপরাধী সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারেও ইসলামের অগ্রবর্তী ভূমিকা রয়েছে। শরীয়তদাতা ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণে বিবাহিত ও অবিবাহিতের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং এ দু'জনের অপরাধের শাস্তিও ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করেছেন। বিবাহিতের জন্য সর্বসম্মতভাবে 'রজমে'র ব্যবস্থা এবং অবিবাহিতের জন্য দোর্‌রার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যদিও ইসলামের সূচনাকালে বিবাহিত ও অবিবাহিতের জন্য শুধু 'নির্যাতন'ই শাস্তি ছিল। এই নির্যাতন কার্যকর হতো তীব্র ভর্ৎসনা, তিরস্কার (Scolding), মন্দ বলা ও গালাগালের মাধ্যমে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَ لَّتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً ٥ وَ اللَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا فَاِنْ تَابَا وَ اَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ٥

(النسا – ١٥ – ١٦)

তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারা নির্লজ্জতার (যিনা) কাজ করবে, তোমরা তা প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী যোগাড় কর। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তোমরা তাদের (অপরাধীদের) ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখ যতক্ষণ না মৃত্যু সংঘটিত হয়, অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য কোন পথ করে দেন। যে দু'জন এই কাজ করবে, তাদের নির্যাতন কর। তারা দু'জনই যদি তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে ওদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড়ই তওবা কবুলকারী, অতিশয় দয়াবান।

ইবনে কুদামার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন, আয়াতে 'স্ত্রীলোক' বলতে বিয়ে করা স্ত্রীলোক বুঝিয়েছে কেননা আল্লাহ্ তা'আলা দু'ধরনের শাস্তির উল্লেখ করেছেন—তার একটি অপরটির তুলনায় অত্যন্ত কঠোর। কঠোর শাস্তিটি বিবাহিতের জন্য, আর অন্যটি কুমারীদের জন্য। পরে এই শাস্তি মন্‌সুখ হয়ে যায়। হযরত উবাদাতা ইবনুস সামিত (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ وَ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جِلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ –

www.pathagar.com

নাও, আমার নিকট থেকে জেনে নাও। আল্লাহ্ তা'আলা ওদের জন্য পথ বের করে দিয়েছেন। কুমার-কুমারীর সহিত ব্যভিচার করলে তার শাস্তি হবে একশত দোর্‌রা এবং বছরের জন্য নির্বাসন আর বিবাহিত-বিবাহিতার সহিত ব্যভিচার করলে একশত দোর্‌রা ও 'সঙ্গেসার'।

বিবাহিত পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক যিনা করলে তাকে 'সঙ্গেসার' করা ইসলামের অকাট্য বিধান। সমস্ত সাহাবী ও তাবিঈন, আলিম এবং সর্বকালের সকল দেশের ইসলাম বিশারদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। খাওয়ারিজ ছাড়া ইতিহাসে আর কেউ-ই এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেনি। খাওয়ারিজদের মতে বিবাহিত অবিবাহিতের শাস্তি এক ও অভিন্ন এবং তা হচ্ছে একশত দোর্‌রা। কেননা কুরআন মজীদে এই শাস্তিরই উল্লেখ হয়েছে। 'রজম' বা 'সঙ্গেসার' অর্থ ; পাথর নিক্ষেপ করে করে হত্যা করা। রাসূলে করীম (সা) নিজে দু'জন ব্যভিচারকারী ইয়াহুদীকে এই শাস্তিই দিয়েছিলেন। আর মুসলমানদের মধ্যে মায়েজ ও আল-গামেদীয়া—এই দু'জন ব্যভিচারকারীকে এরূপ শাস্তি দেওয়ার ছিল সর্বজনবিদিত।

বিবাহিত ব্যভিচারীকে দোর্‌রা ও 'সঙ্গেসার' এই উভয় দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন হযরত আলী (রা)। হযরত ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কা'ব এবং আবূ যর গিফারী প্রমুখ সাহাবী (রা)-ও এই মত সমর্থন করেছেন। হাসান বসরী, ইসহাক, দায়ূদ ও ইবনুল মুন্‌যিল প্রমুখ তাবেয়ী-আলিমও তাই বলেছেন। এ পর্যায়ে অপর একটি বর্ণনা রয়েছে। তা হচ্ছে বিবাহিত ব্যভিচারীকে শুধু 'রজম'-এর দণ্ড দান, দোর্‌রা নয়। হযরত উমর ও হযরত উসমান (রা) থেকে এই বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। এই দুইজন খলীফায়ে রাশেদ কেবলমাত্র 'রজম'-এর দণ্ড দিয়েছেন, দোর্‌রার দণ্ড নয়। নখ্‌য়ী, যুহ্‌রী, আওযাঈ, ইমাম মালিক, শাফিঈ ও হানাফী ফিকহ্‌বিদগণ এই রায়ই দিয়েছেন। আবূ ইসহাক আল-জুরজানী ও আবূ বকর আল্-আসরাম প্রমুখ ফিকহ্‌বিদ এই মত পছন্দ করেছেন। তাঁদের সকলেরই ভিত্তি হচ্ছে হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস। হাদীসটি হচ্ছে

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجَمَ مَا عِزًا وَّ لَمْ يَجْلِدْهُ وَ رَجَمَ الْغَامِدِيَةَ وَ لَمْ يَجْلِدْهَا

নবী করীম (সা) মায়েযকে 'রজম'-এর দণ্ড দিয়েছেন, দোর্‌রা মারেন নি। গামেদীয়াকে 'রজম' দিয়েছেন, দোর্‌রা মারেননি। অথচ এ দু'জনই ছিল বিবাহিত।

অবশ্য ব্যভিচারী যদি বিবাহিত না হয়, তাহলে তার শাস্তি যে দোর্‌রা, তাতে কারুরই কোন দ্বিমত নেই। কেননা এই পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা স্পষ্ট ও অকাট্য। কুরআনের আয়াত হচ্ছে ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ – (النور – ٢)

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী উভয়কে একশ'টি দোর্‌রা মার।

www.pathagar.com

ইসলামের সব বিশেষজ্ঞই এ বিষয়ে একমত যে, এই দণ্ড কেবলমাত্র অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের জন্য নির্ধারিত। তবে জমহুর আলিমগণ এই দোর্‌রা শাস্তির সাথে সাথে এক বছর কালের নির্বাসনের দণ্ড দেওয়াও অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদিন থেকেও এই মত বর্ণিত। হযরত উবাই, আবুদ্ দারদা, ইবনে মসউদ ও ইবনে উমর প্রমুখ সাহাবী (রা)-ও এই মতের সমর্থক। আতা, তাউস, সওরী ইবনে আবূ লায়লা ও শাফিঈ প্রমুখ ফিকহবিদেরও এই মত। ইমাম মালিক ও আওযাঈর মত হচ্ছে, নির্বাসনের দণ্ড কেবল মাত্র পুরুষ ব্যভিচারীকেই দেওয়া যেতে পারে, স্ত্রীলোককে নয়। কেননা স্ত্রীলোকের জন্য যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অপরিহার্য, নির্বাসনে তা সম্ভব নয়। বিদেশ গমনকালে তার সাথে মুহরিম পুরুষের উপস্থিতি একান্তই জরুরী। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الاخِرِ انْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ اِلاَّ مَعَ ذِىْ رِحْمٍ –

রক্তের আত্মীয় সঙ্গী ছাড়া কোন মেয়েলোকের পক্ষে একদিন একরাত্রির দূরত্বের বিদেশ সফরে যাওয়া হালাল নয়।

এমতাবস্থায় কোন মহিলাকে যদি ব্যভিচারের শাস্তির অংশ হিসাবে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তাহলে এ হাদীস অনুযায়ী তার সাথে এমন এক পুরুষ ব্যক্তিকেও নির্বাসিত করতে হবে, যে ব্যভিচারের অপরাধ করেনি। করেনি নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার মত কোন অপরাধ।

এই কারণেই ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের মত হচ্ছে, নির্বাসনের দণ্ড দেওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ এ দু'জন লোককে অনুরূপ কাজ থেকে বিরত রাখাই যথেষ্ট। হযরত উমর (রা) এক ব্যক্তিকে শাস্তিস্বরূপ খায়বরে নির্বাসিত করেছিলেন। লোকটি তখন হেরাক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে খৃস্টান হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর হযরত উমর (রা) বলছিলেন ঃ

لاَ اُغَرِّبُ مُسْلِمًا بَعْدَ هذَا اَبَدًا –

অতঃপর আমি কোন মুসলমানকে কখনই নির্বাসিত করব না।

এই পর্যায়ে একটি বিষয়ে গভীর ও ব্যাপক ভিত্তিক অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে। শরীয়তদাতা বিবাহিতের যিনার শাস্তি ও অবিবাহিতের যিনার শাস্তির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যদিও উভয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট দণ্ড ঘোষিত হয়েছে। ফিকহ্‌বিদগণ মনে করেন, উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের অবস্থা ও অবস্থানের পার্থক্য, বাহ্যিক পরিবেশ, মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ এবং বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির উপকরণসমূহের দৃষ্টিতেই এই পার্থক্যের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। যে ব্যক্তি এখনও বিয়ে করেনি, তার যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতার শরীয়তসম্মত কোন পন্থা বা ব্যবস্থা তার করায়ত্ত নয়। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে

www.pathagar.com

যৌন অপরাধ করা থেকে আত্মরক্ষা করে দূরে সরে থাকার ব্যাপারে অক্ষমতা ও অসহায়তার শিকার হওয়া এবং সাময়িক কাম-লালসার নিকট পরাজিত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। এই কারণে শরীয়তদাতা উক্ত রূপ ব্যক্তির জন্য তুলনামূলকভাবে হালকা দণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। পক্ষান্তরে বিবাহিত ব্যক্তির অবস্থা যে ভিন্নতর তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সে তো তার যৌন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার হালাল ও শরীয়তসম্মত ব্যবস্থার অধিকারী। আল্লাহ্ তাকে হারাম পথে অগ্রসর হওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকেও মুক্ত রেখেছেন। তার পক্ষে যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া খুবই সাংঘাতিক ঘটনা। তাতে তার প্রকৃতিতেই কঠিন বিকৃতি ও বিপর্যয়ের মারাত্মক অবস্থিতি প্রমাণ করে। অতএব এই ধরনের ব্যক্তি নির্ধারিত দণ্ড ভোগের জন্য অবশ্যই উপযুক্ত। অবশ্য এ পর্যায়ে আমাদের একথাও ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, ইসলামী আইন প্রণয়নে উচ্চমানের দায়, অনুগ্রহ, সহমর্মিতা ও সহৃদয়তার সংযোগ রয়েছে। এই কারণে সামান্য সন্দেহ হলেও নির্দিষ্ট শাস্তি প্রত্যাহার করার স্থায়ী বিধান দেওয়া হয়েছে। অপরাধী কি অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে বা ঘটাতে বাধ্য হয়েছে, দণ্ডের ফয়সালা দানকালে তা অবশ্যই সম্মুখে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, শাফিঈ ও আহমাদ এবং জম্হুর আলিমগণের এই মত বর্ণিত হয়েছে যে, কুমারী মেয়েলোককে অন্তঃসত্তা দেখেই তাকে দণ্ড দেওয়া যাবে না—যতক্ষণ সে ব্যভিচার করার স্বীকারোক্তি না দিচ্ছে। সে অপরিচিতা হোক কি পরিচিতা এবং বলাৎকারের ফলে হয়েছে কিংবা তখন সে নির্বাক ও অ-প্রতিবাদী ছিল, এই প্রশ্নও অবান্তর। অথবা সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণিত হবে। অন্যথায় সন্দেহের সুযোগ তাকে দিতে হবে ও 'হদ্দ' অকার্যকর থাকবে। গামেদীয়ার ঘটনায় অপরাধীর অবস্থানকে সম্মুখে রাখা হয়েছে এবং দয়ার দিকটিও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। সে গর্ভবতী হয়ে এসে যখন ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করল এবং নবী করীম (সা)-এর নিকট তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর করার জন্য প্রার্থনা জানালো—যেন সে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে—তখন নবী করীম (সা) গর্ভস্থ ভ্রূণের সন্তান ও তার জীবন রক্ষার লক্ষ্যে তা করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, সন্তান প্রসবের পর উপস্থিত হবে। সন্তান প্রসবের পর উপস্থিত হলে বললেন, সন্তানকে স্তন দেওয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর যেন সে উপস্থিত হয়। আর তখন উপস্থিত সন্তানটির লালন-পালনের ভার একজন সাহাবীকে দিয়ে তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন।

এই ঘটনা অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে যে, অপরাধীর অবস্থা ও অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে দণ্ড কার্যকরকরণকে বিলম্বিত করার ব্যবস্থাও ইসলামে রয়েছে এবং তা দয়াশীলতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উপর দণ্ড কার্যকর করাকে রোগমুক্তির সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করার ব্যবস্থা এই কারণেই গৃহীত হয়েছে। আহমাদ,

www.pathagar.com

মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীমের ক্রীতদাসী ব্যভিচার করলে তাকে দোর্‌রা মারার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমি তার কাছে গেলে মনে হলো সে সদ্য 'নেফাস' থেকে উঠেছে। আমি মনে করলাম, এ সময় দণ্ড কার্যকর করা হলে হয়ত ওকে হত্যা করা হবে। তাই বিরত থাকলাম। নবী করীম (সা)-কে একথা জানালে তিনি বললেন ঃ

اَحْسَنْتَ اُتْرُكْهَا حَتّٰى تُمَائِلَ اى تَبْرَا –

তুমি ভালই করেছ। ওকে ওর ভালো হওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দাও।

অপরাধীর অবস্থা পর্যবেক্ষণের গুরুত্বের দিক দিয়ে মুক্ত-স্বাধীন ও ক্রীতদাস হওয়ার মধ্যেও পার্থক্য আছে এবং ইসলামে এই পার্থক্যের গুরুত্ব স্বীকৃত। এই কারণে কোন কোন ফিকহ্‌বিদের মত হচ্ছে, ক্রীতদাস ও দাসীর ব্যভিচার অপরাধের দণ্ড কেবলমাত্র দোর্‌রা, অন্য কিছু নয় এবং তা ঘোষিত 'হদ্দ' দণ্ডের অর্ধেক করতে হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ –

(النساء – ٢٥)

যখন ক্রীতদাসী বিবাহিতা হবে, অতঃপর যদি কোন যিনার কাজ করে, তা'হলে তাকে স্বাধীনা বিবাহিতাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক শাস্তি দেওয়া হবে।

তার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। ক্রীতদাসীরা সব সময় খেদমত ও শ্রমের কাজে নিয়োজিত ও ব্যতিব্যস্ত থাকে। আর খেদমত ও শ্রমের কাজে নিয়োজিত লোকদের নৈতিক পবিত্রতার সংরক্ষণ অতটা শক্তিশালী থাকা বা করা সম্ভব হয় না, যা পদস্খলন থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে। এ কারণে এ অপরাধের জন্য ঘোষিত শাস্তির অর্ধেক এদের বেলায় কার্যকর করা ইসলামী শরীয়তের সিদ্ধান্ত।

'কযফ'—যিনার মিথ্যা অভিযোগ এর জন্য নির্দিষ্ট শাস্তিটি পর্যালোচনা করা হলে দু'টি ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একটি ব্যাপারে স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ (Defamation) তোলে যে, সে যিনা করেছে, আর দ্বিতীয় ব্যাপার, স্বামী নয়—অন্য এক ব্যক্তি এইরূপ অভিযোগ তুলেছে। দ্বিতীয়োক্ত ব্যাপারে অ-স্বামীকে আশি দোর্‌রা মারা হবে তার এই মারাত্মক অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় বা সত্য প্রমাণিত না হওয়ার কারণে। আর স্বামীর ক্ষেত্রে একটা বিশেষ মাসআলার অবতারণা করা হয়েছে। তা হচ্ছে اللعان (আল-লি'আন)। কুরআন মজীদে এই কথাই ঘোষিত হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةَ شُهَدَاَ فَاجْلِدُوْ هُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّ لاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً – اَبَدًا وَ اُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ – اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ م بَعْدِ ذلِكَ وَ اَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ – (النور – ٤ – ٥)

যেসব পুরুষ তাদের পবিত্রা স্ত্রীলোকদের উপর যিনার মিথ্যা অভিযোগ তোলে ; কিন্তু তা প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থাপিত করে না, তাদের আশিটি দোররা মার এবং তাদের সাক্ষ্য কখনই গ্রহণ করবে না, ওরা ফাসিক লোক। তবে যারা তওবা করবে ও নিজেদের সংশোধন করে নেবে এই গুনাহ্ করার পর, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

এই বিধান নাযিল হওয়ায় স্বামীগণ খুব কঠোরতা অনুভব করল। হিলাল ইবনে মুনাব্বাহ (রা) তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে রাসূলে করীম (সা)-এর সমীপে যিনার অভিযোগ তুলেছিলেন। নবী করীম (সা) তাকে বললেন ঃ

اَلْبَيِّنَةُ اَوْ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ –

হয় সাক্ষী পেশ করে অভিযোগ প্রমাণ কর, নতুবা তোমার পিঠে 'হদ্দ' কার্যকর করা হবে।

হিলাল বললেন ঃ হে রাসূল ! যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর অন্য এক পুরুষকে সওয়ার দেখতে পেল, সে যাবে প্রমাণ তালাস করতে।' তখনও নবী করীম (সা) উক্ত কথাই বলতে লাগলেন। তখন হিলাল আবার বললেন ঃ যিনি আপনাকে সত্যতা সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, আমি সত্যবাদী। অতএব 'হদ্দ' থেকে আমার পিঠ বাঁচাবার জন্য যেন আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করেন। অতঃপর লি'আনের এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٌ بِاللهِ اِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ –وَ الْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ – وَ يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٌ بِاللهِ اِنَّه لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ – وَ الْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ –

যে সব লোক নিজেদের স্ত্রীদের উপর যিনার অভিযোগ তুলে এবং তাদের নিকট তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী না থাকে, তা'হলে সেই একজনের সাক্ষ্য এই হবে ; সে চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেবে যে, সে তার অভিযোগে সত্যবাদী। আর পঞ্চমবার বলবে, সে তার অভিযোগে মিথ্যাবাদী হলে

www.pathagar.com

তার উপর যেন আল্লাহ্‌র না'নত হয়। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকটি শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে কসম করে সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তির অভিযোগ মিথ্যা এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে ব্যক্তির অভিযোগ সত্য হলে তার উপর যেন আল্লাহ্‌র গজব হয়।

এ আয়াতে শরীয়তদাতা স্বামী ও অন্যদের মধ্যে গুণগতভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। এই পার্থক্য হুকুম বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারেও স্পষ্ট। অ-স্বামীরা অনাত্মীয় ব্যক্তির মিথ্যা অভিযোগকে খুব সাংঘাতিক ও হারাম বলে অভিহিত করেছেন। পক্ষান্তরে স্ত্রীদের বিরুদ্ধে স্বামীদের এইরূপ অভিযোগ তোলাকে ততটা সাংঘাতিক বলা হয়নি। কেননা স্বামীও কখনও কখনও স্ত্রীর অনুরূপ অভিযোগের সম্মুখীন হয়ে থাকে লজ্জা প্রতিরোধের জন্য, স্ত্রীত্বের শয্যাকে নির্মল বানাবার জন্য এবং যে সন্তান সম্পর্কে স্বামী নিঃসন্দেহ, তা তার নয়, তাকে তারই বংশোদ্ভূত প্রমাণ করার জন্য।

সাধারণভাবেই ইসলামে হদ্দের দণ্ড স্থাপিত হয়েছে মানবীয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কীয় জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম প্রকৃতিগত ঝোঁক-প্রবণতার উপর ভিত্তি করে। এই বিধান অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই ও সমাজ সমষ্টির কল্যাণের লক্ষ্যে কার্যকর। বস্তুত যে সব দণ্ড সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তিদের বিপর্যস্ত করে তা এক সাথে ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ বিনষ্ট করে। যে আইন প্রণয়নে এক সাথে সমষ্টির কল্যাণের উপর লক্ষ্য রাখা হয়েছে, অপরাধীর উপর শাস্তি ধার্যকরণকালে অপরাধের পরিবেশ অবস্থা ও অপরাধীর মনস্তত্ত্ব কি ছিল তার উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছে। আল্লামা ইবনুল হাজার আল-হায়সামী তাঁর كتاب الزو اجر عند اقتراف الكبائر গ্রন্থে বিশেষজ্ঞদের এই মত উদ্ধৃত করেছেন ঃ

বহু সংখ্যক অপরাধ ও গুনাহের বিবেচনা গুনাহর অবস্থার বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হতে বাধ্য এই দৃষ্টিতে যে, অপরাধী কি তার অপরাধে পৌনপুনিকতার দোষে দুষ্ট ; কিংবা তা নয়। অথবা তা একটা ভুল মাত্র ও ইচ্ছামূলক, সে বাধ্য হয়েছিল কিংবা বাধ্য ছিল না। সব গুনাহ্‌গারের অবস্থা নিশ্চয়ই অভিন্ন নয়। তা একই মাত্রায়ও হয় না।

নিম্নোদ্ধৃত ঐতিহাসিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তাবলী উক্ত কথার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে ঃ দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) দুর্ভিক্ষকালে চোরের হাত কাটার বিধান মওকুফ করে দিয়েছিলেন। কেননা সাম্প্রতিক পরিস্থিতি চোরকে চুরি কাজে বাধ্য করে থাকতে পারে। এটা অবস্থার বিবেচনা। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির বাহন জন্তুটি চুরি করে ও জবাই করে খেয়ে ফেলেছিল মারাত্মক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ

لَا قِطْعَ فِى الْمَجَاعَةِ –

দুর্ভিক্ষকালে চোরের হাত কাটার বিধান নেই।

www.pathagar.com

অর্থাৎ ক্ষুধায় কাতর ব্যক্তি যদি খাদ্যদ্রব্য চুরি করে, তাহলে তাকে চুরির দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না। কেননা সে চুরির অপরাধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ

لاَ قِطْعَ فِى عَامِ الْمَجَاعَةِ –

দুর্ভিক্ষের বছর হাত কাটার আইন কার্যকর হবে না।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কসম করে বললেন ঃ

لاَ اَقْطَعُهُ اِذَا حَمَلَتِ الْحَاجَةُ النَّاسَ فِىْ شِدَّةٍ وَّ مَجَاعَةٍ –

না, আমি কখনই তার হাত কাটব না। কেননা অভাব-অনটনের তীব্রতা ও দুর্ভিক্ষাবস্থা মানুষকে চুরি করতে বাধ্য করেছে।

হযরত উমর (রা) থেকে আরও বর্ণিত, হাতিব ইবনে আবূ বলতায়া' (র)-এর ক্রীতদাসরা মুজানী বংশের লোকদের একটি উষ্ট্রী চুরি করে জবাই করেছিল। তখন হযরত উমর (রা) তাদের হাত কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরে হযরত হাতিবকে বললেন ঃ মনে হচ্ছে তুমি ওদের 'ভালোবাস'। অতঃপর তার এই ভালবাসার কথা মনে করে তাদের উপর 'হদ্দ' কার্যকর করার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিলেন।[১]

স্বামী যদি স্ত্রীর ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজন পরিমাণ মাল-সামগ্রী বা অর্থ না দেয় এবং এ কারণে স্ত্রী স্বামীর ধন-মাল থেকে গোপনে প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করতে থাকে, তাহলে তার হাত কাটা যাবে না। এর ভিত্তি হচ্ছে হিন্দ সংক্রান্ত হাদীস। সে নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল ঃ 'আমার স্বামী অত্যন্ত লোভী ও কৃপণ মানুষ। সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকা দিচ্ছে না, অথচ তার সব ধন-মাল আমারই হাতের মধ্যে। এখন আমি কি তা থেকে গ্রহণ করতে পারি ? জওয়াবে রাসূলে করীম (সা) বললেন ঃ

خُذِىْ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيْكِ وَ وَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ –

সাধারণ প্রচলিত মান অনুযায়ী যে পরিমাণ জীবিকা তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট, কেবল সেই পরিমাণই তুমি তা থেকে গ্রহণ করতে থাক।

ওয়ালীদ ইবনে উক্‌বা রোম অঞ্চলে প্রেরিত সেনাবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি তখন মদ্যপান করেছিলেন। হযরত হুযায়ফা ইবনুল য়ামান তাকে মদ্যপান অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি না দেওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।

---

১. المغنى – ج ٨ ص ٢٧٨

www.pathagar.com

বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা) তাঁর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের এই নির্দেশ লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, কোন ক্ষুদ্র বাহিনী বা বড় বাহিনীর অধ্যক্ষের উপর মদ্যপানের অপরাধে কোন 'হদ্দ' কার্যকর করবে না। কেননা পথিমধ্যে সে তা টের পেয়ে গেলে ক্রুদ্ধ হয়ে ও শাস্তি এড়ানোর জন্য কাফির সমাজের সাথে মিশে যেতে পারে।

এই ঘটনাবলী স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে কোন অপরাধের শাস্তি বিধানকালে অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে যে, অপরাধী ঠিক কি অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়ে অপরাধটা করেছিল। আর সব অপরাধকে একই মানদণ্ডে ওযন করাও সঠিক নয়। ইসলাম বরং অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই নৈতিক শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার মুকাবিলা করার পক্ষপাতী এবং এজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে আগ্রহী। এই লক্ষ্যেই ইসলাম লোকদের শরীয়ত পালনে অভ্যস্ত করতে ইচ্ছুক সবকিছুর আগে। দুনিয়ার মানব রচিত আইনের বিচারে এ প্রশ্নটি কোন গুরুত্বই পায়নি। অথচ ব্যক্তিগণের নৈতিক চরিত্র উত্তম হলে বা উত্তম বানানো সম্ভবপর হলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অধিকতর অনুকূল পরিবেশ তৈরি হতে পারে। ব্যক্তিগণের অন্তরেই কল্যাণের ভাবধারা দৃঢ়মূল হয়ে বসতে পারে এবং মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বপ্রকারের অন্যায়, পাপ ও অপরাধ থেকে বিরত থাকতে পারে।

উপরন্তু ভ্রান্ত মন-মানসিকতাকে হিদায়ত করার জন্য দয়া ও ক্ষমাশীলতা কত যে গভীর, ব্যাপক ও তীব্র প্রভাব রাখে তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর প্রয়োজন পড়ে না। খোদ নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

إِنَّ الرِّفْقَ مَا كَانَ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ زَانَه وَ لاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ –

এই কারণেই শরীয়তদাতা অপরাধ ও আদর্শ বিচ্যুতির প্রতিরোধ এবং সংশোধন চিকিৎসার পন্থা হিসাবে নম্রতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। যেন অপরাধী অপরাধ সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা পোষণ না করে এবং সেই কারণে অপরাধে নিমজ্জিত থাকাকেই স্থায়ী নীতি হিসাবে গ্রহণ করে না বসে। অপরাধের মধ্যেই যেন তার অগ্রগতি সাধিত হতে না থাকে। স্বয়ং নবী করীম (সা) অপরাধী বা গুনাহগার ব্যক্তিকে তার অপরাধ ও গুনাহের কারণে লাঞ্ছিত ও অপমানিত না করতে উৎসাহিত করেছেন। অন্যথায় তার মন-মানসিকতায় অপরাধ ও পাপের দিকে একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে তা স্থায়ী ও দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারে। সে যদি জানতে পারে যে, লোকেরা তাকে ঘৃণা করে তার অমুক ত্রুটি বা চরিত্রের দরুন, তখন সে লজ্জায় মুখ ঢাকতে ও সমাজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অসামাজিক হয়েও দিনাতিপাত করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। আর যে লোক সমাজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করবে, শয়তান তার সাথে সম্পর্ক দৃঢ়তর করে নেবে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এমন কোন কুলক্ষণা লোকই হতে পারে না যে, তার কাছে কল্যাণের কোন আশাই

www.pathagar.com

করা যায় না। তওবার দ্বার চিরদিনই উন্মুক্ত বলে তাতেও মহান কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইসলাম তিনটি পন্থায় অপরাধীর মনস্তাত্ত্বিক সংশোধন ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের পন্থা গ্রহণ করেছে। পন্থা তিনটি এই ঃ

১. সুপরিসিদ্ধ ও সংস্কৃত জনমত গঠন। এই কারণেই 'আমর বিল্ মারূফ ও নিহী আনিল মুন্কার-এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'ভালো'কে মন্দে'র জন্য দায়ী করা হয়েছে, যদি সে বাঁকা পথের পথিককে উত্তম পন্থায় সোজা ও সরল করতে অসমর্থ থাকে। এভাবে সমাজের ব্যক্তিগণ যদি পারস্পরিক নসীহত, উপদেশ, কল্যাণময় ও পরামর্শের ফলে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠে তাহলে তারা অন্যায় ও দুষ্কৃতি প্রতিরোধে সক্ষম হবে এবং কল্যাণ ও শুভ চরিত্রের প্রতিষ্ঠা কার্যকর হবে।

২. লজ্জাশীলতা গ্রহণের দাওয়াত এবং তাকে মন-মানসিকতায় দৃঢ়স্থিত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কেননা লজ্জা-শরম সর্বতোভাবে কল্যাণের উৎস। অপরাধ প্রবণতার রোগে আক্রান্ত মন-মানসিকতায় লজ্জাশীলতার পুনর্জাগরণ এক সফল চিকিৎসা। কেননা তা অপরাধ করার পথে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অপরাধের লজ্জা থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই মনোবৃত্তি দৃঢ়ভাবে জাগ্রত করে যে, আমি এমন কাজ কখনই করব না, যার দরুন শেষ পর্যন্ত আমাকে জনসমাজে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে। এই জন্যই নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ –

তোমার লজ্জাই যদি না থাকল, তাহলে তুমি যা ইচ্ছা হয় করতে পার।

তার অর্থ লজ্জা না থাকা সমস্ত অন্যায় ও পাপের চাবিকাঠি। যার লজ্জা নেই সে না করতে পারে—এমন কোন পাপের কল্পনাও করা যায় না।

৩. নির্লজ্জতার কার্যাবলীর প্রকাশ ও প্রচার হতে না দেওয়া। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَيُّهَا النَّاسُ مَنِ ارْتَكَبَ شَيْأً مِنْ هٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ وَ اسْتَتَرَفَهُوَ فِىْ سَتْرِ اللهِ وَ مَنْ اِبْدَى لَنَا فَضَحَتَه اَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ –

হে মানুষ ! যে লোক এইসব অন্যায় ও জঘন্যতম কার্যাবলীর কোন একটা করবে ও তা গোপন করে ফেলবে, সে আল্লাহ্র আবরণ লাভ করবে। আর যে লোক তার লজ্জাজনক কাজ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত করবে, আমরা তার উপর সুনির্দিষ্ট 'হদ্দ' অবশ্যই কার্যকর করব।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন ঃ

إِذَا بَلَيْتُمْ فَاسْتَتِرُوْا –

তোমরা যদি কোন দুর্ভাগ্যজনক কাজ করে বস, তাহলে তা গোপন কর।

www.pathagar.com

এই কথাটি সুস্পষ্টভাবে এই তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করে যে, অপরাধ গোপন করা হলে তার গুরুত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তা এড়িয়ে চলতে লোকদের উদ্বুদ্ধ করে। অপরাধ গোপন করার উপর গুরুত্ব এজন্যও দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ প্রচারিত ও প্রকাশিত হওয়ায় একসাথে দু'টি অপরাধ সংঘটিত হয়। একটি হচ্ছে অপরাধ করা ; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রচার করা। রাসূলে করীম (সা) এই পর্যায়ে বলেছেন ঃ

اِذَا خَفَيْتَ الْخَطِيْئَةَ لَمْ تَضُرُّ اِلاَّ صَاحِبَهَا فَاِنْ ظَهَرَتْ اَوْشَكَ اَنْ يُعَمَّ اللهُ الْكُلَّ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ –

তুমি যদি কোন ভুল বা মন্দ কাজ লুকিয়ে ফেল, তখন তা যে করল কেবল তারই ক্ষতি করতে পারে। আর যদি তা প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে খুবই সম্ভব হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ্ তাঁর আযাবে সর্বসাধারণকে পরিবেষ্টিত করে ফেলবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَ الاٰخِرَةِ – (النور – ١٩)

যারা মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতার ব্যাপক প্রচার ও প্রকাশ পছন্দ করে, তাদের জন্য তীব্র পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে দুনিয়া এবং পরকাল—উভয় ক্ষেত্রেই।

অপরাধের প্রচার-প্রকাশ এড়িয়ে গিয়ে অপরাধের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার এক মহান সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবেই এই কথার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে।

এই তিনটি মৌলিক ব্যবস্থা অন্যায় পাপ ও অপরাধের বিরুদ্ধে একটা তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করার ও তার অনুকূলে জনমত গড়ে তোলার সুষ্ঠু ব্যবস্থা। মুসলিম মন-মানসিকতাকে ইসলামী শিক্ষা-প্রশিক্ষণে প্রস্তুত ও উন্নত করে তোলার জন্য তা খুবই কার্যকর। সমাজের ব্যক্তিগণকে এমন এক সুদৃঢ় বন্ধনে বন্দী করার এ এক নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা, যার দ্বারা প্রত্যেকটি মানুষের মন-মানসিকতা থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করা যেতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে পবিত্র চিন্তা ও নির্মল ভাবধারা জাগ্রত করে গোটা সমাজ-সমষ্টিকে এক মহাকল্যাণের দিকে পরিচালিত করা এভাবেই সম্ভব।

ইমাম গাযালী নীতি দার্শনিকদের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে একটা বাস্তব প্রক্রিয়াও রয়েছে, যদ্দারা মন-মানসিকতা থেকে অন্যায় ও দুষ্কৃতির প্রবণতা দূর করা সার্থকভাবেই সম্ভব।

বস্তুত সামষ্টিকতাকে অপরাধের মুকাবিলা করা—অপরাধীর মন-মানসিকতার পরিশুদ্ধি বিধান এবং তা থেকে অপরাধ প্রবণতার মূলোৎপাটন ইসলামী আইন প্রণয়নে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থিত। সংক্ষেপে তা বর্ণনা হলো ঃ

www.pathagar.com

প্রথম ঃ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তার মুকাবিলা—প্রতিরোধ করা। তা নিম্নোক্ত কয়েকটি উপায়ে সম্ভব ঃ

ক. মানুষকে পূর্ণ ঈমান গ্রহণে প্রস্তুত করা। তাহলে তা-ই তাকে বিকৃতি ও আদর্শ-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করবে।

খ. নৈতিক চরিত্রকে দৃঢ় করে তোলা। মন-মানসিকতায় ভালো কাজের প্রবল প্রবণতা ও তার প্রতি ভালোবাসা, তীব্র আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টি করা।

গ. 'আমর বিল্ মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে কার্যকর করা।

ঘ. সামষ্টিকভাবে দীন প্রচারের ব্যবস্থা ও ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

ঙ. পারস্পরিক সহানুভূতি-সহযোগিতা ও কল্যাণ কামনা দ্বারা সুদৃঢ় মানসিক একাত্মতা গড়ে তোলা।

দ্বিতীয় ঃ অপরাধ গোপন—অপ্রকাশিত ও অপ্রচারিত রাখা। অন্যায়, দুষ্কৃতির প্রচার হতে না দেওয়া। তা হলে নির্লজ্জতা ব্যাপক হয়ে উঠতে পারবে না এবং অপরাধী তার অপরাধের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে।

তৃতীয় ঃ শরীয়ত নির্ধারিত 'হদ্দ'সমূহ কার্যকর করা। অবশ্য সন্দেহের সুযোগ অভিযুক্তকে দিতেই হবে। তা'যীরী শাস্তিসমূহও কার্যকর করতে হবে। অবশ্য সেই সাথে অপরাধী কি অবস্থায় পড়ে অপরাধ করতে বাধ্য হয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্তই কর্তব্য।

চতুর্থ ঃ কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই 'তওবার' দ্বার সদা উন্মুক্ত রাখা।

পঞ্চম ঃ অপরাধীকে সামাজিকভাবে বয়কট না করা, তাকে তার অপরাধের জন্য লজ্জিত ও লাঞ্ছিত না করা।

ষষ্ঠ ঃ অপরাধ ক্ষমা করার উৎসাহ দান।

সপ্তম ঃ বিশেষ আইনের সাহায্যে সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করা। তা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যেমন করতে হবে, তেমনি করতে হবে প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতেও। ফলে প্রত্যেকটি ব্যক্তি সমাজে সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করার সুযোগ পাবে।

ইসলামের এত সব প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরও যদি কোন ব্যক্তি অপরাধ করে, তা হলে সে এক বিন্দু দয়া, অনুগ্রহ বা ক্ষমা পাওয়ার অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে। সে তা পাওয়ার সব যোগ্যতাই হারাবে। এমতাবস্থায় তার অপরাধের যথাযথ শাস্তি অবশ্যই কার্যকর হতে হবে।

এই পর্যায়ে শেষ কথা—অপরাধ যদি কারুর স্থায়ী রোগের মত হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে সে সমাজের ভিত্তিমূলে বারবার আঘাত হানতে থাকবে এবং সমাজ এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠবে, তখন ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক সরকারের কর্তব্য হচ্ছে কঠোর হস্তে শাস্তি ও দণ্ড কার্যকর করা।

www.pathagar.com

প্রথম ইসলামী উৎস প্রথম ইসলামী সমাজের পূর্ণাঙ্গ সংশোধনে পূর্ণ মাত্রায় সফলতা পেয়েছে। এই কারণেই সেই সমাজ আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম সমাজ হওয়ার অধিকারী হয়েছিল। এই সমাজকে সম্বোধন করেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْـهَوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَ تُؤْمِنُـوْنَ بِاللهِ – (ال عمران – ١١٠)

তোমরাই উত্তম মানব সমষ্টি। মানুষের কল্যাণে তোমাদের নিয়োজিত করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ কর, মন্দ কাজের নিষেধ কর এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানে সুদৃঢ় থাক।

ইসলামের এই সংশোধনী প্রক্রিয়াই সমাজের শেষ জনসমষ্টিকেও সঠিকরূপে সংশোধন করতে সক্ষম। এজন্য তাকে তার নির্মল প্রকৃতির ও সুপরিশুদ্ধ মনোবৃত্তির দিকে ফিরে আসতে হবে। কুরআন থেকেই আইন গ্রহণ করতে হবে, সে আইনকেই যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে। আল্লাহ্‌র এই কথাটির সত্যতার প্রতি ঈমান আনতে হবে, যা তিনি বলেছিলেন তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللهُ وَ لاَ تَكُـنْ لِّلْخَـائِنِيْنَ خَصِيْمًا – (النساء – ١٠٥)

আমি তোমার প্রতি এই কিতাব সত্যতা সহকারেই নাযিল করেছি, যেন তুমি আল্লাহ্‌র দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে লোকদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করতে পার এবং তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষপাতী হবে না।

আল্লাহ্‌র বিধানকে যারা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে এবং বাতিলের নিকট বাতিল আইনের ভিত্তিতে বিচার-ফয়সালা পেতে আশা করে বা চেষ্টা করে, তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْـدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهِ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰـلاً بَعِيْـدًا – وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللهُ وَ اِلَى الرَّسُـوْلِ رَاَيْـتَ الْمُنٰفِقِيْـنَ يَصُـدُّوْنَ عَنْـكَ صُدُوْدًا – (النساء – ٦٠)

তুমি কি তাদের ব্যাপারটা বিবেচনা করেছ, যারা মনে করে যে, তারা তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে যা কিছু নাযিল হয়েছে, তার প্রতি ঈমান এনেছে, তা সত্ত্বেও তারা তাগূতের নিকট বিচার চাইবার ইচ্ছা করছে। অথচ তাগূতকে অস্বীকার ও

www.pathagar.com

অমান্য করারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাদের। আসলে শয়তান তাদের গুমরাহ করে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এই লোকদের যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা এবং রাসূলের দিকে আস, তখন তুমি মুনাফিকদের দেখবে যে, তারা পাশ কাটিয়ে দূর থেকে চলে যাচ্ছে।

সারকথা দু'টি জিনিসই চাওয়া হচ্ছে ঃ

১. আল্লাহ্ যে বিধান নাযিল করেছেন, তার প্রতি পূর্ণ ও একনিষ্ঠ ঈমান।
২. সেই বিধানসমূহকে ব্যক্তি ও সমষ্টির উপর পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন, কেননা প্রকৃতপক্ষে 'ঈমানে কামিল'—পূর্ণাঙ্গ ঈমান হচ্ছে মনে-হৃদয়ে তাকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বাস্তব কাজ দ্বারা সে ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করে দেওয়া।

এই বিষয় দু'টির প্রতি খুব বেশি গুরুত্ব সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আমাদের সকলেরই একান্ত কর্তব্য।

বস্তুত দুনিয়ার যেখানেই শরীয়তের বিধান পুরোপুরি ও যথাযথভাবে কার্যকর হয়েছে, সেখানেই পূর্ণমাত্রায় শান্তি ও নিরাপত্তা বাস্তাবয়িত হয়েছে, প্রত্যেকটি আগরিকই তথায় নিজের জান-প্রাণ ও ধন-মালের নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং পূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও নিরুদ্বিগ্নতা সহকারেই জীবন যাপন করার নির্ভরযোগ্য সুযোগ পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বর্তমান দুনিয়ার ইসলামী জনসমষ্টি স্বভাবত ইসলামী আইন-বিধানের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য পুরোমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে। আর সত্য কথা, তা যখনই এবং যেখানেই করা হবে, সেখানেই তা হবে মহান আল্লাহ্র প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্যের পবিত্র ভাবধারার সার্থক হওয়ার।

আজ আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর বিধান কুরআনের প্রতি প্রত্যাবর্তনের সময় এসেছে। সর্বশেষে উল্লেখ করছি কুরআনের আয়াত ঃ

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَ لاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَ صّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ – (الانعام – ١٥٣)

এ-ই হচ্ছে আমার অবলম্বিত সঠিক ঋজু সুদৃঢ় পথ। অতএব তোমরা তারই অনুসরণ কর। এ ছাড়া অন্যান্য যেসব পথ রয়েছে, তা অনুসরণ করবে না। করলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে ভিন্নতর পথে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবে। আল্লাহ্ তোমাদের এরই উপদেশ দিয়েছেন। আশা করা যায়, তোমরা বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারবে।

পরিশিষ্ট

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনায় বলা হয়েছে ইসলামী শরীয়তের আইন প্রণয়নকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

১. প্রকৃত অপরাধ, এগুলি বড় বড় অপরাধ

২. তা'যীরী অপরাধ

কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এ পর্যায়ের অপরাধসমূহ বুঝি প্রকৃত অপরাধ নয়। আসলে বক্তব্য হচ্ছে, কতগুলি অপরাধের শাস্তি শরীয়তদাতা আল্লাহ্ নিজেই নির্ধারিত করে দিয়েছেন, অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে তা মওজুদ আছে। আর অনেকগুলি অপরাধেরই শাস্তি শরীয়তদাতা নিজে নির্ধারিত করেন নি এবং তা শরীয়তের অকাট্য দলীল পাওয়াও যায় না। এ পর্যায়ের অপরাধের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট।

এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা দলীল-প্রমাণ সীমিত, আর অপরাধ ও অপরাধ পর্যায়ের ঘটনাবলী তো অশেষ। তা গুণে শেষ করা তো সম্ভব নয়। কেননা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও মন-মানসিকতা যখন বিকৃত ও বিপথগামী হয়ে পড়ে, তখন তা নিত্য নতুন ও রকমারি অপরাধ উদ্ভাবন করে। কোন একটি বিন্দুতে এসে তা শেষ হয় না, থেমেও যায় না। ইসলামী শরীয়ত এ অবস্থার বাস্তবতা ও গুরুত্ব স্বীকার করেছে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া তা'যীরী পর্যায়ের অপরাধের কয়েক শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ঃ যে সমস্ত অপরাধের 'হদ্দ' নেই, সেগুলিরও শাস্তি রয়েছে, তার কোন বিকল্প নেই। আমানতে খিয়ানত, ধোঁকা-প্রতারণা (Cheat-deceive), ওযনে-মাপে কম দেওয়া, ভালো জিনিসের মূল্য নিয়ে মন্দ বা ত্রুটিপূর্ণ জিনিস দেওয়া, ঘুষ-রিশওয়াত ইত্যাদি এই পর্যায়ের অপরাধের মধ্যে গণ্য।

এ পর্যায়ের অপরাধসমূহের শাস্তি আগে থেকেই নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি, যদিও এগুলি বড় বড় তা'যীরী অপরাধ। তার কারণ, সমাজ সমষ্টির কল্যাণের দৃষ্টিতে তাৎক্ষণিক অবস্থা ও পরিবেশে অপরাধসমূহের মাত্রায় যেমন পার্থক্য হতে পারে, তেমনি গুরুত্বেও পার্থক্য হতে পারে। তাই সেসবের প্রতি কড়া দৃষ্টি রেখে তাৎক্ষণিকভাবে এসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের (মজলিস শুরার) উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের যে কোন অপরাধে যে কোন শাস্তি নির্ধারণের অধিকার দেওয়া হয়নি। সে জন্য কতগুলি শক্ত নিয়ম-নীতি ও শর্ত ধার্য করা হয়েছে, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যকার আনুপাতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং শরীয়তের অকাট্য দলীল ও তার সাধারণ মৌল নীতির বিরোধীতা করার কোন অধিকারই কাউকে দেওয়া হয়নি।

তা'যীরী অপরাধসমূহের জন্য এসব শক্ত নিয়ম-কানুনের মধ্য থেকে শাস্তি নির্ধারিত হবে এবং তাতে শরীয়তের অকাট্য দলীলের বিরোধিতা করা হবে না, সমস্ত আইন 'ইসলামী আইন' রূপে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

অপরাধ প্রতিরোধে ঈমানের ভূমিকা

ইসলামে ঈমানের স্থান সর্বপ্রথম। তার পরই ইসলাম। ঈমান বীজ সদৃশ আর ইসলাম হচ্ছে সেই বীজ থেকে অংকুরিত বৃক্ষ। বীজ না হলে যেমন বৃক্ষের অস্তিত্ব অসম্ভব, তেমনি ঈমান ব্যতীত ইসলাম অবাস্তব। ইসলাম একটা দেহ সংস্থা, ঈমান তার মধ্যে অবস্থিত প্রাণ-সদৃশ। প্রাণহীন দেহ মূল্যহীন। তাই দীন ইসলামে ঈমানের গুরুত্ব সর্বাধিক।

ইসলাম মানুষকে সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণেরই আহ্বান জানায়। কেননা ঈমান হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদের ভিত্তি, যেমন বীজ হচ্ছে শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব সমন্বিত বৃক্ষের মূল।

বীজ বপন করা হলেই বৃক্ষের অংকুরোদ্‌গম হওয়ার সম্ভাবনা। বীজ রোপিত না হলে বৃক্ষের অস্তিত্ব আকাশ-কুসুম কল্পনা। ঈমান দানা বেঁধে উঠলে ইসলাম তথা ইসলামী বিধান কার্যত অনুসৃত হবে বলে প্রত্যয় জন্মে। ঈমান হলে ইসলাম পালিত হওয়ার যেমন সম্ভাবনা থাকে, তেমনি ঈমানবিহীন ইসলাম আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ব্যবস্থা হিসাবে তাঁর নিকট গৃহীত হয় না। ঠিক এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে বান্দাদের জন্য যে বাস্তব কর্মের বিধান পেশ করেছেন, তার সবগুলিতেই তিনি সম্বোধন করেছেন ঃ يايها الذين امنوا 'হে ঈমানদার লোকেরা' কিংবা 'হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ' বলে। কেননা আল্লাহ্‌র প্রতি যার ঈমান নেই, সে আল্লাহ্‌র বিধান আদেশ বা নিষেধ পালনে প্রস্তুত হবে কেন ! আল্লাহ্‌র প্রতি যার ঈমান রয়েছে, সেই আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করতে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে প্রস্তুত হতে পারে। আর যার তা নেই সে তা পালন করবে—এমন আশা নিতান্তই অর্থহীন।

মূলত 'ঈমান' শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্য বলে মেনে নেওয়া, সত্য বলে স্বীকার করা। কেউ কোন বিষয়ে কাউকে কোন সংবাদ দিলে সেই সংবাদকে সত্য বলে মেনে নেওয়া বা স্বীকার করাই হচ্ছে ঈমান। সে 'ঈমানে' শুধু মৌখিক স্বীকৃতির কথা নেই, তা মানতে প্রস্তুত হওয়ার কথাটিও শামিল রয়েছে এবং খবরদাতার দেয়া শুধু খবরটুকুকে সত্য বলে মেনে নেওয়াই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়, সেই সাথে খবরদাতাকে সাচ্চা বা সত্যবাদী—সত্য সংবাদদাতা বলে বিশ্বাস করাও তার অন্তর্ভুক্ত। কেননা শুধু খবরটুকুকে সত্য মেনে নিলেও সে খবরটুকুর প্রকৃত সত্য হওয়ার জন্য তা

www.pathagar.com

যথেষ্ট হয় না। সেই সাথে খবরদাতাকে সত্য মানাও একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে সংবাদটুকুকে শুধু মৌখিকভাবে সত্য মেনে নেওয়াই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়, সেই সংবাদের পরিণতি সম্পর্কিত অংশকেও অবশ্যই সত্য বলে মেনে নিতে হয় এবং তা সত্য হলে সেই পরিণতি অনুযায়ী স্বীয় কর্মনীতি নির্ধারণ করাও অনিবার্য হয়ে পড়ে।

তা'হলে কোনো সংবাদকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার তিনটি দিক একই সময় অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান রয়েছে। প্রথম ঃ সংবাদ সত্য ; দ্বিতীয় ঃ সংবাদদাতাও সত্য এবং তৃতীয় ঃ সংবাদে নিহিত পরিণতি সত্য বিধায় তদনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণে রাযি হওয়া।

দুনিয়ায় ঈমানের আহ্বান জানিয়েছেন আল্লাহ্ প্রেরিত নবী-রাসূলগণ। তাঁদের আহ্বান ছিল এক একক ও লা-শরীক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান গ্রহণের। এ আহ্বানের প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবি হচ্ছে আল্লাহ্ আছেন, তিনি এক ও একক, লা-শরীক—এই কথাকে পরম সত্য বলে মেনে নেওয়া। এই কথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হলে এই সংবাদ যাঁরা দিয়েছে এবং এ আহ্বান যাঁরা জানিয়েছেন সেই নবী ও রাসূলগণকেও সত্য বলে মেনে নিতে হয়। এ হচ্ছে ঈমানের প্রথম ও দ্বিতীয় দিক। আর তৃতীয় দিক হচ্ছে, আল্লাহ্ আছেন, তিনি লা-শরীক—এই কথাকে মেনে নিলে তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহকেও সত্য মেনে নিতে হয়, সত্য মেনে নিতে হয় তার পরিণতি অর্থাৎ তা না মানলে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি, ক্রোধ এবং আযাব ভোগ করতে হবে, আর মানলে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে, পরকালে পাওয়া যাবে জান্নাত—একথাটুকু। এভাবে একই ঈমান এর মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, রাসূলের প্রতি ঈমান এবং পরকালের প্রতি ঈমান। ঈমানের ক্ষেত্রে এই বিন্যাস বা পরম্পরা সাধারণভাবেই পরিচিত, কিন্তু ঈমান গ্রহণের প্রয়োজনের দিক দিয়ে প্রথম হচ্ছে রাসূলের প্রতি ঈমান, তারপরে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং তৃতীয় পর্যায়ে পরকালের প্রতি ঈমান।

রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ সর্বপ্রথম প্রয়োজন। কেননা, ঈমানের আহ্বান সর্বপ্রথম তিনিই আমাদের দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরিভাবে এই আহ্বান মানুষের কাছে পৌছান নি। তিনি এই আহ্বান প্রচারের জন্য তাঁর মনোনীত নবীকে প্রথম প্রস্তুত করেছেন। পরে এই নবীর জবানীতে দুনিয়ার মানুষের নিকট সেই আহ্বান পৌছেছে এবং সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে।

কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব হচ্ছে পরকালের প্রতি ঈমানের। কেননা পরকাল-ই যদি সত্য না হলো, তা'হলে আল্লাহ্র প্রতি বা রাসূলের প্রতি ঈমানের কোন তাকীদ অনুভূত হবে না। এ তাকীদ অনুভূত হয় এভাবে যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য না হলে পরকালে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে নিশ্চিতভাবে। এই কারণে পরকালকে শুধু সত্য মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, পরকালের

www.pathagar.com

সত্যতার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় একান্তই অপরিহার্য। এ জন্যেই সূরা আল-বাকারার শুরুতে গায়ব অর্থাৎ আল্লাহ্, ফিরিশতা, ওহী ও রিসালতের প্রতি ঈমান গ্রহণের কথা বলার শেষে বলা হয়েছে ঃ

وَ بِالاخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ – (بقرة – ٤)

এবং পরকালের প্রতি তারা অবিচল ও দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে।

অবশ্য আনুগত্যের দিক দিয়ে বিন্যাস হচ্ছে—প্রথমে আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ্র এবং তারপরে তাঁর রাসূলের। বিধান পালনের দিক দিয়ে প্রথমে পালন করতে হবে আল্লাহ্র কালাম—কুরআন মজীদের বিধান। তারপরে রাসূলের সুন্নতের বিধান। কেননা মানুষের আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ্—সারা জাহানের অনন্য সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী বলে। আর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে কেবলমাত্র তাঁরই নির্দেশে তিনি তাঁর আনুগত্য করতে বলেছেন বলেই। অন্যথায় রাসূলের মানুষের আনুগত্য পাওয়ার কোন যুক্তি নেই।

পূর্বেই বলেছি, ঈমান প্রথমে, তার পরে ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে কার্যাবলীর বাস্তব বিধান যা করতে হবে বা যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কুরআন এই আদেশ ও নিষেধ সমন্বিত যে বিধান উপস্থাপিত করেছে তার বাস্তবতা এই ঈমানের উপরই নির্ভরশীল। প্রথম দিকে যেসব লোক ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করেছিল, কিন্তু ঈমান গ্রহণ করেনি, তাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

قَالَتِ الاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَ اِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه لاَ يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْأً اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

(الحجرات – ١٤)

মরুবাসী আরবরা বলেছে, আমরা ঈমান এনেছি, তুমি ওদের বলো ঃ তোমরা (এখনো) ঈমান আননি, বরং বলো—আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি (অর্থাৎ ইসলামের অধীনতা মেনে নিয়েছি)। তোমাদের দিলে ঈমান এখনো প্রবেশ করেনি। আর তোমরা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করো তা'হলে তিনি তোমাদের কর্মের শুভ ফলে কোন কমতি করবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা ও আনুগত্যকে ওরা ঈমানের সমতুল্য মনে করেছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা খণ্ডন করেছেন। বলে দিয়েছেন, ঈমানের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা যা ইসলামের মৌল ভাবধারা। কিন্তু তার পূর্বে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের প্রয়োজন। এ ঈমান না আনা হলে 'আমরা ঈমান এনেছি' বলার অধিকার হয় না ইসলামের প্রশাসনিক আইন পালন করতে থাকা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও। মোটকথা, রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের দিকটি ইসলাম, ঈমান নয় এবং প্রথমে ঈমান না হলে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য অর্থাৎ ইসলামের কোন মূল্য আল্লাহ্‌র নিকট হবে না।

সংশয়মুক্ত ঈমান :

সংশয়মুক্ত ঈমানই ইসলামে কাম্য ; বরং সত্যি কথা, সংশয়হীন বিশ্বাসই ইসলামে ঈমান নামে পরিচিত ও অভিহিত। যে ঈমান সংশয়মুক্ত নয়, তা মানুষকে প্রকৃত মু'মিন বানায় না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ – اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ – (الحجرات – ١٥)

প্রকৃত মু'মিন তারাই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। অতঃপর কোনরূপ সংশয়াচ্ছন্ন হয়নি এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে তাদের জান-মাল দিয়ে। তারাই সত্যিকার ঈমানদার।

আয়াতের প্রথম অংশ থেকে ঈমানের সংশয়মুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশিত হয়েছে। মাঝখানের অংশে ঈমানের অনিবার্য ফলশ্রুতি আমল বাস্তব কাজের অর্থাৎ দীন কায়েমের জন্য জিহাদ করার উল্লেখ হয়েছে এবং শেষ অংশে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের সাথে বাস্তব কাজের সমন্বয়কে প্রকৃত সত্য ঈমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে ঈমান গ্রহণের বিন্যাস হচ্ছে—প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং তারপর তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। এবং এই ঈমানের সত্যতা প্রমাণকারী হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে নিজেদের জান-মাল বিনিয়োগ সহকারে আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র দীন কায়েমের লক্ষ্যে জিহাদ করাকে। এই ঈমান ও ঈমান অনুযায়ী আমল-এর সমন্বিত রূপকেই সত্য ঈমানের প্রতীক রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ শুধু ঈমান-ই যথেষ্ট নয়, সত্য ঈমান নয়। ঈমান অনুযায়ী কাজ শেষে সে ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত হলেই সে ঈমানকে ঈমান বলে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈমানের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ তদনুযায়ী আমল করার পূর্বে ঈমানের অস্তিত্ব হওয়ার অপরিহার্যতাকেও এখানে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। আর এই কারণেই কুরআনে যেখানেই ঈমানের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই বলা হয়েছে আমলে সালেহ্‌ (عمل صالح) নেক আমলের কথা। এ প্রেক্ষিতে নেক আমল তা-ই যা ঈমানের দাবি অনুযায়ী ঈমানের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে করা হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ –

যারা ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে এবং যারা কুফরী গ্রহণ করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে।

www.pathagar.com

ঈমান ও কুফর

এ আয়াতে 'ঈমান' ও 'কুফর'—এ দুইটির অনিবার্য পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'টিই মূলত মন-মানসিকতার ব্যাপার। এই মন-মানসিকতায় হয় আল্লাহ্‌র রাসূল ও পরকালের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস থাকবে, অথবা থাকবে অবিশ্বাস। বিশ্বাস থাকলে তার অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে সশস্ত্র যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া আল্লাহ্‌র দীনের বিজয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। পক্ষান্তরে সে মন-মানসিকতায় আল্লাহ্‌র রাসূল ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে অনিবার্যভাবে থাকবে অবিশ্বাস। এই অবিশ্বাসই তাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বিরোধী কার্যকলাপে উৎসাহিত করবে, নেমে পড়তে বাধ্য করবে। আর আল্লাহ্‌র আদেশ বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে চূড়ান্ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র দীন নির্মূল করে আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কল্পে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই সশস্ত্র যুদ্ধের (قتال) কথা বলা হয়েছে। আর সশস্ত্র যুদ্ধ হচ্ছে চরম পর্যায়ের আত্মত্যাগ। এই আত্মত্যাগে প্রস্তুত হওয়া নির্ভর করে বিশ্বাসের বলিষ্ঠতার উপর। বিশ্বাসের এই চরম বলিষ্ঠতা না থাকলে কারো পক্ষেই এই চরম মাত্রার আত্মত্যাগে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয় না। আর কি আল্লাহ্‌র পথে, কি তাগূতের পথে—উভয় ক্ষেত্রেরই অনিবার্য দাবি হচ্ছে এই চরম মাত্রার আত্মত্যাগের। এই চরম মাত্রার আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে একটা প্রস্তুতি-পর্যায় অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। কেননা হঠাৎ করে কারো পক্ষেই সচেতনভাবে এই চরম মাত্রার আত্মত্যাগে রাযি হওয়া সম্ভব হয় না। এই প্রস্তুতি-পর্ব হচ্ছে, যে লোক কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে, সে তার মন-মেজাজ ও যাবতীয় তৎপরতা সেই অনুরূপই গড়ে তুলবে। আল্লাহ্‌র ও রাসূলের প্রতি চরম মাত্রার শত্রুতা মনের মধ্যে স্থান দেবে। আল্লাহ্‌র বিধানকে অগ্রাহ্য করবে, তাঁর অস্তিত্বেও বরদাশ্‌ত করতে রাযি হবে না। পক্ষান্তরে যে লোক আল্লাহ্‌র প্রতি, রাসূলের প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনবে সে হবে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের একনিষ্ঠ অনুগত। আল্লাহ্‌র প্রদত্ত ও রাসূলের উপস্থাপিত বিধানকে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকারী হবে সে। সে আল্লাহ্‌র বিধান কোনক্রমেই বিন্দুমাত্রও অগ্রাহ্য করবে না ; কেউ অগ্রাহ্য করুক তাও সে বরদাশ্‌ত করতে রাযি হবে না। সে বিধানে যা হালাল তাকেই সে হালাল মেনে নেবে। কেউ তাকে হারাম বললে তা সে মানতে রাযি হবে না কিছুতেই। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ যা হারাম করেছেন তা সে নিজে তো করবেই না—করতে কোনোক্রমে রাযিও হবে না ; উপরন্তু অপর কেউ সেই হারাম কাজ করুক—তাও সে মুহূর্তের জন্য বরদাশ্‌ত করবে না। এভাবে তার চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌ময় হয়ে গড়ে উঠবে। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র বিধানই বাস্তবায়িত হোক, তার বিপরীত কোন বিধান সমাজে এক বিন্দু স্থান না পাক, আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি বিশ্বাসী ও তার ঐকান্তিক অনুসারীরাই সমাজে নেতৃত্বে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় কর্তৃত্বের আসনে আসীন হোক, রাষ্ট্র ক্ষমতা তাদেরই

www.pathagar.com

করায়ত্ত হোক যেন সর্বত্র আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব পুরাপুরি বাস্তবায়িত হতে পারে—এ-ই হবে তার অন্তরের ঐকান্তিক বাসনা ও কামনা এবং এই তাকীদেই সে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো চরম মাত্রার আত্মত্যাগে সচেতনভাবে রাযি হতে পারে।

ঈমান ও আমল

মোটকথা, ঈমানের পরে পরেই এবং সাথে সাথেই তদনুযায়ী আমল একান্তই জরুরী। অন্যথায় ঈমানের যথার্থতাই অপ্রমাণিত থেকে যায়। আর ঈমান অনুযায়ী আমল হচ্ছে, আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা এবং সেইসব কাজ করা, যা তিনি ফরয বা কর্তব্যরূপে ঘোষণা করেছেন। এই আমল-ই ঈমানদারকে প্রকৃত মু'মিন বানিয়ে দেয়। কুরআন মজীদের বহুসংখ্যক আয়াতেই এই কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে। এখানে এই পর্যায়ের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللهِ وَ رَسُوْلِه وَ اتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْم

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَ لاَ تَجْهَرُوْا لَه بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ - (الحجرات -١ - ٢)

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অগ্রে চলে যেও না। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মু'মিনেরা ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের নিজেদের কণ্ঠস্বর অধিকতর উচ্চ করবে না এবং তোমরা পরস্পর যেভাবে জোরে জোরে কথা বলো, নবীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সেরূপ জোরে বলো না। কেননা তোমাদের অজ্ঞাতসারেই তোমাদের সব নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।

দু'টি আয়াতেই ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। সে কথা হচ্ছে—তিনটি কাজের নিষেধ ও একটি কাজের আদেশ। আল্লাহ্ ও রাসূলের অগ্রে যেতে, রাসূলের কণ্ঠস্বরের তুলনায় স্বীয় কণ্ঠস্বর উচ্চ করতে এবং রাসূলের সাথে জোরে জোরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে[১] এবং আদেশ করা হয়েছে আল্লাহ্‌কে ভয় করতে। এ আদেশ ও নিষেধ কাজ বিশেষ। এ কাজের ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। এ ঈমান যাদের আছে, তাদেরকেই কাজের আদেশ করা হয়েছে এবং কয়েকটি কাজ করতে তাদেরই নিষেধ করা হয়েছে।

১. এই কথাটির অর্থ অনেক ব্যাপক। তন্মধ্যে এগুলো রয়েছে ঃ আল্লাহ্ ও রাসূলকে কোন বিষয়ে প্রস্তাব দিও না—এই কাজ করুন বলে। কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের বলার পূর্বে তোমরা কিছু বলো না। আল্লাহ্ ও রাসূল যা বলেন নি, তোমরা তা বলো না। আল্লাহ্ ও রাসূল যে কথা যতটুকু বলেছেন, তোমরা তার উপর বাড়িয়ে কিছু বলো না—এই সব অর্থই হতে পারে। হযরত ইবনে আরকাম বলেছেন ঃ لا تقولوا خلاف الكتاب و السنة "কুরআন ও সুন্নাতের বিরুদ্ধে কিছু বলো না।"

www.pathagar.com

অতএব যাদের ঈমান আছে, তারা অবশ্যই এ আদেশ ও নিষেধ মান্য করবে। আর যাদের ঈমান নেই, তারা এ আদেশ-নিষেধকে গ্রাহ্য মাত্রও করবে না। তা হলে ঈমান-ই আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পালনের মূলে আসল প্রাণশক্তি। ইসলাম মানুষের মধ্যে এই প্রাণশক্তিকেই জাগিয়ে দিতে চায় সর্বপ্রথম। তা'হলেই আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়িত হবে, বাস্তবে অনুসৃত হবে বলে আশা করা যায়।

এই ঈমানের ভিত্তিতেই এসেছে আল্লাহ্‌র যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ। একটি আয়াত ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَّ لاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ – (البقرة – ١٠٨)

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ইসলামে পূর্ণ মাত্রায় প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেননা সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।

দ্বিতীয় আয়াত ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خسِرِيْنَ – (ال عمران – ١٤٩)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যদি কাফির লোকদের আনুগত্য ও অনুসরণ কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের অতীতের (সেই জাহিলিয়াতের) যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর তাহলে তোমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

ঈমান ও রাষ্ট্র

পূর্বোল্লিখিত আয়াতে ঈমানদার লোকদিগকে কাফিরদের অনুসরণ ও আনুগত্য গ্রহণ করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে এবং পুরোপুরিভাবে ইসলামে প্রবেশ করার ও ইসলাম অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের আহ্বান জানানো হয়েছে। বস্তুত যাদের অন্তরে ঈমানের অস্তিত্ব বিদ্যমান, তারা এ নিষেধ অমান্য ও এই আহ্বান অগ্রাহ্য করতে পারে না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ – (الحجرات – ٦)

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমাদের নিকট কোন কাফির ব্যক্তি যদি কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তার সত্যাসত্য যাচাই কর, যেন মূর্খতা বা অজ্ঞতাবশত কোনো জনসমষ্টির উপর বিপদ টেনে না আন। তা'হলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।

www.pathagar.com

আয়াতের সম্বোধন সেসব ঈমানদার লোকদের প্রতি, যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এই নির্দেশ অনুযায়ী তারা সর্বপ্রকারের সংবাদাদির উৎসের যথার্থতা সন্ধান করতে বাধ্য। যে রাষ্ট্র পরিচালকগণ ঈমানদার তারা এই আদেশ পালনে বাধ্য। তাদের ঈমানের তাকীদেই তারা তা করবে। এর বিপরীত কিছু করতে তারা প্রস্তুত হবে না তাদের ঈমানেরই কারণে। অন্যথায় তারা এমন কাজ করে বসতে পারে যার দরুন তারা লজ্জিত বা দুঃখিত হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَ لاَ تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ لاَ تَنَابَزُوْا بِالاَلْقَابِ –

(الحجرات – ١١)

হে ঈমানদারগণ, কোন জনগোষ্ঠী যেন অপর কোন জনগোষ্ঠীকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করে। অসম্ভব নয় যে, তারা তাদের তুলনায় অনেক উত্তম হবে। অনুরূপভাবে কোন মেয়েলোক যেন অপর মেয়েলোকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করে ; অসম্ভব নয় যে, তারা এদের অপেক্ষা অনেক ভালো হবে এবং তোমরা পরস্পরকে নানাবিধ খারাপ উপাধি দিয়ে সম্বোধন করবে না।

সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের দৃষ্টিতে এ আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে যে সব কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা কোন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষেই করা সম্ভব নয়। বস্তুত যার মধ্যে প্রকৃত ঈমান রয়েছে, সে এর কোন একটি কাজও করতে পারে না। ঈমানই তাকে এই নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে বাধা দেবে, এ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, একে এই কারণেই ঈমানের অবদান বলতে হবে। আয়াতের নিষিদ্ধ কাজগুলি সমাজে কত যে অশান্তি এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি করতে পারে, তা সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারেন না। আয়াত অনুযায়ী সেই অশান্তি ও বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার মৌলিক উপায় হচ্ছে সত্যিকারের ঈমান। ঈমান থাকলেই তা থেকে বাঁচা সম্ভব হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لاَ تَجَسَّسُوْا وَ لاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا – اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ –

(الحجرات – ١٢)

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা বহু সংখ্যক খারাপ ধারণা পরিহার করে চলো। কেননা কোনো কোনো ধারণা গুনাহ্। আর তোমরা লোকদের দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না এবং তোমরা পরস্পরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাই'র গোশ্‌ত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে ? অতঃপর তোমরা তা ঘৃণাই করলে !

www.pathagar.com

এ আয়াতে কিছু কিছু অমূলক খারাপ ধারণা পোষণ, পরের দোষ খুঁজে বেড়ানো এবং পরস্পরের গীবত—দোষ গেয়ে বেড়ানো নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এই নিষিদ্ধ ঘোষণা ঈমানদার লোকদের প্রতি। কেননা এই কাজগুলি ঈমানের পরিপন্থী। বস্তুত যার ঈমান আছে, সে কখনই এই নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে পারে না। ঈমানই তাকে এই সব সমাজ-বিরোধী ও সাধারণভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত রাখে। এখানেও ঈমানের ভূমিকাই প্রবল এবং এসব সমাজ-বিধ্বংসী কার্যাবলী থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে ঈমান। ঈমানের তাকীদেই এসব কাজ থেকে মানুষ স্বতঃই বিরত থাকবে।

বস্তুত নবী প্রেরণও হয়েছে লোকদের মধ্যে ঈমান সৃষ্টির লক্ষ্যে। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا لِتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِه وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ أَصِيْلاً - (الفتح - ٨ - ٩)

হে নবী ! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে, যেন তোমরা—হে জনগণ, ঈমান গ্রহণ কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যেন তোমরা তাঁর সাহায্য করো, তাঁকে অন্তর দিয়ে সম্মান করো এবং সকাল ও সন্ধ্যায় যেন তোমরা তাঁর তস্‌বীহ কর।

আয়াতটিতে রাসূল পাঠাবার মূল উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে এবং তা হচ্ছে 'যেন তোমরা ঈমান গ্রহণ কর'। তাই রাসূলের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে ঈমান গ্রহণের জন্য লোকদের দাওয়াত দেওয়া। কেননা রাসূলের রিসালতের দায়িত্ব পালন, আল্লাহ্‌র দীনের বিজয় সাধন, আল্লাহ্‌কে অন্তর দিয়ে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয় করা এবং সকাল-সন্ধ্যা কেবল তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করা—যা মানুষকে সৃষ্টি করার মূল লক্ষ্য, তার বাস্তবায়নে প্রস্তুত করবে, সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এই ঈমান গ্রহণ করার উপর মানুষ ঈমান গ্রহণ করলেই আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় ও সম্ভ্রমবোধ জাগবে, তারই তাকীদে মানুষ আল্লাহ্‌র সেই সব কাজ সম্পাদনে ও আল্লাহ্‌র সাহায্যে সর্বান্তঃকরণে এগিয়ে আসবে, যেসব কাজ আল্লাহ্ নিজে না করে তা করার দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পণ করেছেন, সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা ও ঘোষণা করবে। আর তাতেই রাসূলে করীমের আগমনের সার্থকতা ও সাফল্য নিহিত। এগুলিই হচ্ছে ঈমানের ফলশ্রুতি, যা কেবলমাত্র ঈমানদার লোকদের কাছেই আশা করা যায়। বেঈমান-কাফির লোকেরা তো উক্ত কাজগুলির মধ্যে কোন একটিও করবে না, তাদের প্রতি সেই আশাও পোষণ করা যায় না।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ

- (الصف - ٢ - ٣)

www.pathagar.com

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা মুখে কেন বল তা, যা তোমরা কার্যত কর না ? আল্লাহ্‌র নিকট তা অতি বড় অপরাধ—অসন্তুষ্টির কারণ যে, তোমরা যা কার্যত কর না তাই বলবে।

মুখে একটা বলা, কিন্তু কাজে তা না করা কিংবা তার বিপরীত কাজ করাকে কুরআনী পরিভাষায় নিফাক্ বা মুনাফিকী বলা হয়। এই মুনাফিকী কার্যকলাপেরই প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে উপরোক্ত আয়াতে। এই পর্যায়ে অত্যন্ত তীব্র ও অকাট্য ভাষায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং তা বলা হয়েছে, 'হে ঈমানদার লোকেরা' এই সম্বোধন করে। তার অর্থ, ঈমানদার লোকের কাজ এ নয় যে মুখে বলা এক, কাজ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা স্পষ্টত ঈমানের পরিপন্থী, ঈমানদার লোক কখনো এইরূপ কাজ করতে পারে না। যার প্রকৃত ঈমান রয়েছে তার কাছে এইরূপ আচরণের আশা করা যায় না। যার ঈমান নেই, তার নিকট এই নীতি—মুখে যা বলা কাজে তা না করা, কোনো দোষের ব্যাপার নয়। এতে সে কোনো দোষই মনে করবে না। কিন্তু যার অন্তরে প্রকৃত ঈমান রয়েছে সে তো এই নীতি কখনো অবলম্বন করবে না। শুধু তা-ই নয়, এই নীতি—যেখানেই অবলম্বিত হতে দেখবে সেখানেই সে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে। এটাই স্বাভাবিক। বস্তুত কেবলমাত্র ঈমানই মানুষকে এই দ্বৈত চরিত্র থেকে দূরে রাখতে পারে।

এ ঈমানই হচ্ছে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কার্যকারিতার একমাত্র ভিত্তি। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আনুগত্যই হচ্ছে মূল কথা। আনুগত্য ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্র কোনটিই গড়ে উঠতে বা গড়ে উঠে চলতে পারে না। কিন্তু এই পর্যায়ে মৌলিক প্রশ্ন, মানুষ আনুগত্য করবে কার ? যারই আনুগত্য করতে মানুষকে বলা হবে, সেখানে অনিবার্যভাবে প্রশ্ন উঠবে—মানুষ কেন তার আনুগত্য করবে ? আনুগত্য পাওয়ার তার কি অধিকার আছে ? মানুষ যারই আনুগত্য করবে, তা কি শর্তহীন হবে, না শর্তভিত্তিক ? মানুষের শর্তহীন আনুগত্য পাওয়ার বা তার দাবি করার কোন অধিকার কোন মানুষের থাকতে পারে না। এই শর্তহীন আনুগত্য মানুষ করতে বাধ্য কেবল মাত্র বিশ্বস্রষ্টা ও পরিচালক নিয়ন্ত্রক আল্লাহ্‌র—অন্য কারোরই নয়।

কিন্তু সমাজে সাধারণত লক্ষ্য করা যায় কিছু সংখ্যক লোক মানুষের মধ্য থেকেই বেরিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দখল করে এবং সাধারণ মানুষের নিরংকুশ ও শর্তহীন আনুগত্য লাভ করতে চায়। এ আনুগত্য না পেলে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতে এক বিন্দু কুণ্ঠিত হয় না। ফলে এই অসহায় জনগণ ভয়ে ও আতংকে তাদের নিরংকুশ ও শর্তহীন আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

অথচ প্রকৃত ব্যাপর হচ্ছে, মানুষের আনুগত্য পাওয়ার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার এবং তাঁরই অনুমতি ও আদেশক্রমে আল্লাহ্‌র রাসূলের। রাসূলের অনুপস্থিতি

www.pathagar.com

বা অবর্তমানে এই আনুগত্য পেতে পারেন সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালকরা—এই শর্তের অধীন যে, তাঁরা নিজেরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে চলবেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন নিজেদের ইচ্ছামত আইন রচনা করে নয়, আল্লাহ্ ও রাসূলের দেওয়া আইন ও বিধানের ভিত্তিতে। অন্যথায় এই আনুগত্য পাওয়ার তাদের কোন অধিকার স্বীকৃতব্য নয়। এই কথাই বলা হয়েছে কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُو الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ – فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الاٰخِرِ – ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلاً – (النساء – ٥٩)

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার 'সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন লোকদের'ও। অতঃপর তোমরা যদি পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হও, তাহলে তার চূড়ান্ত মীমাংসার ব্যাপারটি প্রত্যার্পিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট—যদি তোমরা ঈমানদার হও আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি। এই নীতিই সর্বোত্তম এবং পরিণতির দিক দিয়ে সর্বাধিক কল্যাণকর। —সূরা নিসা ঃ ৫৯

এ আয়াতে সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল আনুগত্যের কথা বলার সাথে সাথে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সুবিচার লাভের পন্থাও নির্দেশ করা হয়েছে এবং সেজন্য শর্ত করা হয়েছে ঈমানের—ঈমান আল্লাহ্র প্রতি, ঈমান পরকালের প্রতি। কেননা আল্লাহ্র বিধান কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ্ভিত্তিক সুবিচার পাওয়ার একমাত্র পন্থা হচ্ছে এই ঈমান। এ ঈমানই আল্লাহ্ ও রাসূলকে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও রাসূলের নেতৃত্বভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রকে এবং তাঁর জারি করা আল্লাহ্ ও রাসূলের আইন বিধান মেনে চলতে মানুষকে প্রস্তুত করে। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এই কথাই বলা হয়েছে একটু ভিন্নতর ভঙ্গীতে ঃ

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا – وَ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ – (النور – ٥١)

ঈমানদার লোকদের যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান জানানো হয়, তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে ফয়সালা দানের ও প্রশাসন চালানোর উদ্দেশ্যে, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠে ঃ আমরা শুনলাম ও মানলাম। আর বস্তুত এরাই সফলকাম লোক। ['শুনলাম ও মানলাম' অর্থ আমরা আনুগত্য স্বীকার করলাম এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের যে কোন নির্দেশ মেনে চলতে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলাম।] —সূরা নূর ঃ ৫১

www.pathagar.com

অর্থাৎ ঈমানদার লোকেরা কেবলমাত্র আল্লাহ্ ও রাসূলের দেওয়া আইন বিধানভিত্তিক বিচার-ফয়সালা ও প্রশাসন বিনাশর্তে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানতে রাযি হয়। পক্ষান্তরে যে বিচার-ফয়সালা ও প্রশাসন আল্লাহ্ ও রাসূলের দেওয়া আইন বিধানভিত্তিক নয়, তা তারা মানতে কোনক্রমেই প্রস্তুত হতে পারে না।

ফলত যারা নিজেরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করতে প্রস্তুত নয়, প্রস্তুত নয় আল্লাহ্ ও রাসূলের দেওয়া আইন বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করতে ও প্রশাসন চালাতে, তারা বাস্তবে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিদ্রোহী, কার্যত আল্লাহ্র দীন, কুরআন ও সুন্নাহ্র অপমানকারী। তারা মুখে মুসলিম হওয়ার যত দাবিই করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের ও কাফিরদের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। এই শ্রেণীর লোকদেরকে নেতৃত্ব ও শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেওয়া কোন ঈমানদার লোকেরই কাজ হতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, তাদেরকে সমাজনেতা ও রাষ্ট্রকর্তারূপে মেনে নিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتبِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ – وَ اتَّقُوْا اللهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ – (المائده – ٥٧)

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের মধ্য থেকে যারাই তোমাদের দীনকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের শিকারে ও খেলার বস্তুতে পরিণত করে এবং যারা কাফির তাদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্রনেতা বা বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকরূপে কিছুতেই গ্রহণ করবে না। তোমরা যদি প্রকৃত ঈমানদার হয়ে থাক, তা'হলে আল্লাহ্কে ভয় করেই উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকবে। —সূরা মায়িদা ঃ ৫৭

এই অকাট্য ও সুস্পষ্ট নির্দেশের পর উক্তরূপ লোকদের নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব মেনে নেওয়া কোন ঈমানদার ব্যক্তিরই কাজ হতে পারে না। উক্ত ধরনের লোক যদি ক্ষমতাসীন হয়ে ঈমানদার লোকদের নিকট আনুগত্যের দাবি করে, তাহলে তাদের আনুগত্য করা তো দূরের কথা, তাদের উৎখাত করতে এবং তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমানদার ও অনুগত লোকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো ঈমানদার লোক মাত্রেরই কর্তব্য। কুরআনের পরিভাষায় এই প্রচেষ্টারই নাম হচ্ছে জিহাদ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ – تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ رَسُوْلِه وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ – ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ – (الصف : ١٠ – ١١)

www.pathagar.com

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমাদের কি এমন এক ব্যবসায়ের পথ দেখাব যা তোমাদের পীড়াদায়ক আযাব থেকে মুক্তি দেবে ? তা হচ্ছে তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে তোমাদের জান-মাল সহকারে। —সূরা সাফ্ফ ঃ ১০-১১

পরকালীন আযাব থেকে মুক্তি লাভের জন্য যে পথ এ আয়াতে প্রদর্শিত হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আল্লাহ্র পথে জান-মাল নিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া। এ কথাটি বলা হয়েছে ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে। তার অর্থ, এই কাজটি তারাই করবে—করতে পারবে বলে আশা করা যায়,—যাদের ঈমান আছে। যাদের ঈমান নেই—যারা কাফির তারা নিশ্চয়ই এই কাজটি করবে না। আর যে কাজটির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। তার অর্থ, ঈমানদার লোকেরা যখন নিজেদের জান-মালসহ জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ঠিক সেই সময়—সেই মুহূর্তেও তাদের ঈমানদার থাকতে হবে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি। যদি তা না থাকে, তা'হলে তাদের এই ধন-মাল ও জান-প্রাণের কুরবানী নিরর্থক ও নিষ্ফল হয়ে যাবে। তা আল্লাহ্র নিকট গৃহীতও হবে না, তার সওয়াবও পরকালে কিছুই পাওয়া যাবে না। ঈমান যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। পরে বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللّٰهِ – (الصف – ١٤)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ্র (দীনের) সাহায্যকারী হও।

—সূরা সাফ্ফ ঃ ১৪

আল্লাহ্র দীনের বিজয়ে অংশগ্রহণ যেমন ঈমানের তাকীদে, তেমনি আল্লাহ্র সাহায্যকারী হওয়াও ঈমানেরই তাকীদে সম্ভবপর। ঈমান না থাকলে আল্লাহ্র সাহায্যকারী হওয়ার সুযোগ কেউ পাবে না। অথচ আল্লাহ্র সাহায্যকারী হওয়া মানুষের জন্য খুব বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَ كُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ اِيَّا كُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে এমন বন্ধু (বা পৃষ্ঠপোষক) -রূপে গ্রহণ কর না যে, তাদের প্রতি বন্ধুত্ব পোষণ করে তাদের নিকট গোপন কথা বলে দেবে। অথচ ওরা তোমাদের নিকট আগত মহাসত্যকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করেছে। ওরা রাসূল এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করে শুধু এই অপরাধে যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছ। —সূরা মুমতাহীনা ঃ ১

এ আয়াতে শত্রুদের প্রতি বন্ধুত্ব পোষণ করতে এবং তাদের নিকট গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আর শত্রুদের চিহ্নিত করা হয়েছে

www.pathagar.com

তাদের কার্যাবলীর দৃষ্টিতে। সে কার্যাবলীর মধ্যে প্রথম, তারা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসা সত্য দীনকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করেছে এবং দ্বিতীয়, 'তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছ—শুধু এই অপরাধে তারা রাসূল এবং তোমাদের—ঈমানদার লোকদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে।' যদিও হিজরতের পরে মক্কার লোকদের এই অপরাধের কারণে তাদের আল্লাহ্ ও ঈমানদার লোকদের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করে তাদের নিকট গোপন তথ্য ফাঁস করতে নিষেধ করা হয়েছে ; কিন্তু এ একটি চিরন্তন বিধান। সর্বকালের মু'মিনরাই এ বিধান মেনে চলতে বাধ্য। কেননা এ বিধানের ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ঈমানের কারণেই কাফিররা মু'মিনদের প্রতি শত্রুতা করে চিরকাল। তাই সেই ঈমানের ভিত্তিতেই তাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ না করতে। বস্তুত ওরা যেমন কুফরী অবলম্বনের দরুন ঈমানকে বরদাশ্‌ত করতে রাযি নয়, ঈমানদার লোকদের সাথে চরম শত্রুতা করতে কিছুমাত্র পিছপা নয়, তেমনি ঈমানদার লোকেরা এই ঈমানের কারণেই ওদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না। কেননা ঈমান চিরকালই কুফরীর বিপরীত। ঈমান ও কুফরীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা চিরন্তন। এই দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা অনিবার্য, একান্ত অপরিহার্যও। এই দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা যেদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে, সেদিন ঈমানের নাম চিহ্নও থাকবে না। কিন্তু তা কোনক্রমেই সত্য হতে পারে না। তাই ঈমানকে তার স্বমর্যাদায় চিরকালই ভাস্বর ও সক্রিয় হয়ে থাকতে হবে। আর এই ঈমানের ভাস্বরতা ও সক্রিয়তার ফলেই শত্রুকে চিনতে ও চিহ্নিত করতে বিলম্ব হবে না—কোনরূপ অসুবিধাও হবে না এবং ঈমানদার লোকেরা তাদেরকে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকরূপে কখনই গ্রহণ করবে না, তাদের নিকট নিজেদের গোপন তথ্য ফাঁসও করে দেবে না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ – (النساء – ١٤٤)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফির লোকদিগকে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিও না। —সূরা নিসা ঃ ১৪৪

এ আয়াতে উপরোদ্ধৃত আয়াতের বক্তব্যই ভিন্নভাবে পেশ করা হয়েছে। ঈমানের এই কার্যকারিতা চিরকালই অনস্বীকার্য।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ – اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ – (الممتحنه : ١٠)

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমাদের নিকট যখন হিজরতকারী মু'মিন মহিলারা আসবে, তখন তোমরা তাদের যাচাই কর। আল্লাহ্‌ই তাদের ঈমানের বিষয়ে অধিক অবহিত। —সূরা মুমতাহেনা ঃ ১০

www.pathagar.com

মুসলমানদের মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পর বিপুল সংখ্যক ঈমানদার মহিলাও হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হতে শুরু করেন। এই সুযোগে অ-ঈমানদার তথা কাফির মেয়েলোকেরা যাতে মদীনায় প্রবেশ করতে না পারে, তা সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করা মদীনাবাসীদের জন্য একান্তই জরুরী হয়ে পড়েছিল। তাই এই নির্দেশ। এ নির্দেশেরও ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। কেননা মদীনা ঈমানের ভিত্তিতে গড়া সমাজের অধিবাস। এখানে শত্রুপক্ষের কাফির নারীরা প্রবেশ করে ঈমানদার সমাজের ঈমানী ভিত্তিকে বিনষ্ট করে দেবার ষড়যন্ত্র করতে পারে, তা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এজন্য এই নির্দেশ ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَ تَنَاجَوْ بِالْبرِّ وَ التَّقْوى – وَ اتَّقُوْا اللهَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ – (المجادله : ٩)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন পরস্পর গোপন পরামর্শ করবে, তখন অবশ্যই গুনাহ্, সীমালংঘনমূলক কাজ ও রাসূলের অমান্যতার পরামর্শ করবে না; বরং গোপন পরামর্শ করবে পুণ্যময় ও তাকওয়ামূলক বিষয়ে। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করবে, যাঁর নিকট হাশরের দিনে তোমাদের একত্রিত হতে হবে।

—সূরা মুজাদালা ঃ ৯

এ আয়াতেও সম্বোধন ঈমানদার লোকদের প্রতি এবং তারও ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। এই ঈমানের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের ন্যায় গুনাহ, সীমালংঘনমূলক ও নবীর না-ফরমানীর কার্যাবলী বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করতে নিষেধ করেছেন। ঈমানদার লোকদের বরং তাদের তাকওয়া ও পুণ্যময় কার্যাবলী নিয়ে সলা-পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, প্রথম ধরনের পরামর্শ একটা শয়তানী কাজ। এই কাজ কখনই ঈমানদার লোকদের জন্য শোভনীয় নয়। উপরন্ত এই ধরনের সলা-পরামর্শ ঈমানদার লোকদের সমন্বয়ে ঈমানের ভিত্তিতে গড়া সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাতে সমাজ-সংস্থা দৃঢ় হয় না, বিশ্লিষ্ট হয় ; শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে না, দুর্বল হয়ে থাকে। অথচ ঈমানভিত্তিক সমাজের জন্য সেই অবস্থা কোনক্রমেই কাম্য হতে পারে না।

ঈমান ও সামাজিক রীতিনীতি

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ – وَ اِذَا قِيْلَ نْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ – (المجادله : ١١)

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমাদের যখন বলা হবে যে, মজলিসে একটু খোলামেলাভাবে বস, তখন তোমরা অবশ্যই খোলামেলাভাবে বসবে। তা'হলে আল্লাহ্ও তোমাদের জন্য প্রশস্ততা এনে দেবেন। আর যখন বলা হবে, তোমরা

www.pathagar.com

উঠে দাঁড়াও, তখন অবশ্যই উঠে দাঁড়াবে। তা'হলে তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার, আল্লাহ্ তাদের উচ্চ মর্যাদা দেবেন। —সূরা মুজাদালা ঃ ১১

এ আয়াতে ঈমানদার লোকদের সামাজিক রীতি-নীতি ও বৈঠকী নিয়মাদির কথা বলা হয়েছে। কথার সার হ'ল, ঈমানদার লোকদের সমাজ হবে নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ। এখানে স্বেচ্ছাচারিতা, নিয়ম-বিধির অমান্যতা এবং নেতৃত্বের প্রতি অবজ্ঞা চলতে পারে না। কেননা, তা ঈমানেরই পরিপন্থী। এই সমাজের লোকদের মজলিসে এতটা প্রশস্ততা থাকা আবশ্যক যে, প্রয়োজনে যেন সেখানে বেশি বেশি লোকের সংস্থান করা সম্ভব হয় এবং কোন প্রয়োজনে সকলকে উঠতে বললেও যেন সকলে উঠে দাঁড়ায়। মজলিসে প্রয়োজনাধীনে দেওয়া এ ধরনের আদেশ অমান্য করা হলে সামাজিক শৃঙ্খলাই বিনষ্ট হয়ে যায়। এরূপ নির্দেশ নিশ্চয়ই সমাজ নেতার পক্ষ থেকে আসবে। আর সমাজ-নেতার প্রয়োজনবোধে দেওয়া এসব ছোটো-খাটো ব্যাপার সম্পর্কিত আদেশই যদি অমান্য করা হয়, তা'হলে সুসংবদ্ধ ইসলামী সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। কেননা ইসলামী সমাজ তো ঈমানদার লোকদের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ। সেই সমাজে যদি এতটুকু আদেশেরও মান্যতা না থাকে, তা'হলে সে সমাজের লোকদের ঈমান আছে—তার কোন প্রমাণই পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্র এই নির্দেশ শুধুমাত্র মজলিসী নিয়ম হয়েই থাকবে না, বৃহত্তর সমাজ জীবনেও বাইরে থেকে মুসলমানদের জন্য স্থান বানাবার মত উদারতা ও সেজন্য নিজের ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রশস্ততা সৃষ্টি করতে রাযি থাকা ঈমানদার সমাজের লোকদের কর্তব্য—ঈমানের পরিচায়ক।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِه يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ – مِنْ رَّحْمَتِه وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِه وَ يَغْفِرْ لَكُمْ – وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ – (الحديد ٢٧)

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তাহলে তিনি তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ তোমাদের দেবেন এবং তোমাদের জন্য এমন 'নূর' বানিয়ে দেবেন যার আলোকে তোমরা চলবে এবং তোমাদের মাগ্ফিরাত দান করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান।

—সূরা হাদীদ ঃ ২৮

আল্লাহ্র দ্বিগুণ অংশের রহমত, আল্লাহ্র নিকট থেকে নূর লাভ করা। যার আলোকে নির্বিঘ্নে জীবনের পথ অতিক্রম করা যাবে এবং তাঁর মাগ্ফিরাত লাভ মানুষ মাত্রেরই ইহকালে ও পরকালে পরম কাম্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা লাভ করার জন্য ঈমান প্রথম শর্ত। ঈমান হলেই এইসব পাওয়া সম্ভব। এই ঈমানই মানুষের মনে আল্লাহ্র ভয় জাগ্রত করে, যে ভয় মানুষকে আল্লাহ্র না-ফরমানী থেকে বিরত রাখে এবং তাঁর আদেশাবলী যথাযথ পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

www.pathagar.com

এই ঈমানই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট উচ্চতর মর্যাদা লাভের প্রথম স্তর ও উন্নতির সিঁড়ির প্রথম ধাপ। তাই বলা হয়েছে—

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ اُولٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ – لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ – وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ الحديد : ١٩

আর যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে, তারাই সত্যবাদী সিদ্দীক এবং শহীদরূপে গণ্য তাদের প্রভুর কাছে—পক্ষান্তরে তাদের জন্য শুভ ফলও রয়েছে। আছে তাদের জন্য নূর। যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অসত্য মনে করেছে, তারাই জাহান্নামী। —সূরা হাদীদ ঃ ১৯

আয়াতটিতে ঈমানের শুভ ফল এবং কুফর-এর মর্মান্তিক পরিণতির কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। এখানে ঈমানের আহ্বান অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

ঈমান ও অর্থ ব্যবস্থা

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ – فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ – (الحديد : ٧)

তোমরা ঈমান গ্রহণ কর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ব্যয় কর সেই ধন-মাল থেকে যাতে তিনি তোমাদের খলীফার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যারাই ঈমান আনবে ও অর্থ ব্যয় করবে, তাদের জন্য বিরাট শুভ ফল বর্তমান। —সূরা হাদীদ ঃ ৭

এ আয়াতে ঈমান গ্রহণের দাওয়াত অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেই সাথে ঈমানী অর্থ ব্যবস্থার মৌলতত্ত্বও ব্যক্ত করা হয়েছে। দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ মানুষের—ঈমানদার লোকদের মর্যাদা কি, তাদের কর্তৃত্ব ও অধিকার কতটা এবং তাদের দায়িত্ব কি, তা এ আয়াতে বলা হয়েছে। এ আয়াতের দৃষ্টিতে যাবতীয় ধন-সম্পদে মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা—প্রতিনিধি বা নায়েব। মানুষ তার প্রকৃত মালিক নয়। সবকিছুর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা। তাঁরই খলীফা হিসাবে মানুষ ধন-মাল, আয়-উৎপাদন ও ব্যয়-বণ্টন করবে। আয়, ভোগ বণ্টন ও ব্যয় সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক বিধান দিয়েছেন, সেই বিধানই হবে তাদের অর্থ-বিধান। বস্তুত, ধন-মালকে ব্যক্তির কিংবা রাষ্ট্রের নিরংকুশ মালিকানা মনে করাই যত অনর্থের মূল। ব্যক্তির নিরংকুশ মালিকানা দুনিয়ায় পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরংকুশ মালিকানার ধারণা সৃষ্টি করেছে সমাজবাদের। একদিকে ব্যক্তি পর্যায়ের শোষণ লুণ্ঠন, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বঞ্চনা ও নির্যাতন আজকের বিশ্বব্যাপী উক্ত দু'ধরনের অর্থ ব্যবস্থার ফল। কুরআন যে ঈমানের আহ্বান

www.pathagar.com

নিয়ে এসেছে. তাতে এই উভয় ব্যবস্থাকেই অস্বীকার করা হয়েছে। ঈমানের ঘোষণা হচ্ছে, এই দুনিয়ার কোন কিছুরই মালিক মানুষ নয়, নয় মানব-সৃষ্ট সমাজ বা রাষ্ট্র। সর্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্ই হচ্ছেন সবকিছুর একমাত্র নিরংকুশ মালিক আর সব মানুষ হচ্ছে সেই আল্লাহ্রই সৃষ্ট এবং বান্দা। অতএব সবকিছুই আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী চলবে। তা'হলেই মানুষ দুনিয়ায় বেঁচে সুখ পাবে। ঈমানই মানুষকে যথেচ্ছ ভোগ-বিলাস, অপচয়, লুটপাট, বঞ্চনা-গঞ্জনা থেকে বিরত রাখে। ঈমানই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে অকাতরে অর্থ দান করতে, বঞ্চিতকে তার ন্যায় হিস্সা যথাযথভাবে দিয়ে দিতে, সম্পদ সমান অধিকারের ভিত্তিতে ভাগ করে নিতে ও দিতে।

ঈমানদার ও বেঈমানদের বৈষয়িক জীবন পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত বলে তা কখন এক এক ও অভিন্ন হয় না। পরিণতি সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিকোণও এক হয় না।

اَللّٰهُ الَّذِيْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيْزَانَ وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِهَا – وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ – اَلاَ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ – (الشورى : ١٨ – ١٧)

আল্লাহ্ তিনিই আমাদের পরম সততা সহকারে কিতাব ও সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের মানদণ্ড [শরীয়ত] নাযিল করেছেন। আর কোন্ জিনিস তোমাকে জানিয়ে দেবে, সম্ভবত কিয়ামতের দিনটি নিকটবর্তী। যারা তার প্রতি ঈমানদার নয়, তারা তাকে খুব তাড়াতাড়ি পেতে চায়। আর যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তারা তাদের জন্য ভীত-সন্ত্রস্থ এবং তারা জানে যে, তা নিঃস্বন্দেহে সত্য। জেনে রাখ, কিয়ামতের বিষয়ে যারা সন্দেহের প্রশ্রয় দেয়, তারা অবশ্যই সুস্পষ্ট ও গভীর গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত। —সূরা শূরা ঃ ১৭-১৮

পরকাল একটি বাস্তব সত্য। বর্তমানের এই বস্তু জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। তা'ই হচ্ছে কিয়ামত। তা ঈমানের অন্যতম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। দুনিয়ায় দু'ধরনের লোক রয়েছে। এখানে কিয়ামতের প্রতি যেমন ঈমানদার লোক রয়েছে, তেমনি বহু লোকই তা স্পষ্টভাবে অবিশ্বাস করছে। মনে করছে, মৃত্যুনিদ্রা কোনদিনই ভাঙবে না। এই দুই শ্রেণীর লোকের বৈষয়িক জীবন এই ধারায় প্রবহমান। কারণ, যারা পরকাল অবিশ্বাস করে, তারা তাকে একটা ঠাট্টা ও বিদ্রুপের বিষয় ধরে নিয়েছে এবং বলছে আরে কিয়ামত নাকি হবে ! যদি হয়-ই, তা হলে তা শীগ্গীরই হয়ে যাক। তা হ'তে দেরী হচ্ছে কেন। কিয়ামতকে তারা একটুও ভয় পায় না। আর তা বিচিত্র কিছু নয়। হামাগুড়ি দিয়ে চলা শিশু জ্বলন্ত আগুনের প্রদীপকে রাঙা চক্চকে খেলনা মনে করে তাতে হাত দেয়। কেননা ওরা আগুনের দাহিকা শক্তি সম্পর্কে আদৌ অবহিত নয়। কিন্তু যারা তা জানে, তারা নিশ্চয়ই সুস্থ জ্ঞানে কখনই তাতে হাত দিয়ে ধরতে

www.pathagar.com

যাবে না। কিয়ামতের ব্যাপারটিও ঠিক তাই। কাফির বেঈমানরা তা বিশ্বাস করে না। তার বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর সেই জন্যই ওরা বিদ্রুপচ্ছলে তা তাড়াতাড়ি হোক বলে উক্তি ঝাড়ে। কিন্তু ঈমানদার লোকেরা তার সত্যতা বাস্তবতা সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী। সেই কারণেই তারা তাকে ভয় পায়। কেননা সেদিন তো মানুষের ইহজীবন শেষ হয়ে গিয়ে চূড়ান্ত হিসাব নিকাশের মুর্হুত উপস্থিত হবে। যদি নেক আমলের জোরে উতরে যায়, তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। নতুবা জাহান্নামের দুর্ভাগ্যই হবে ললাট লিখন। তাই তারা এ জীবন এমনভাবে যাপন করতে চেষ্টা করে, যেন পরকালের সেই কঠিন দিনে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

বস্তুত এ ব্যাপারে ঈমানই হচ্ছে আসল চালিকা শক্তি। এই শক্তি যার হৃদয়-মনে জাগরূক, সক্রিয়, সে কখনই আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করতে পারে না, লংঘন করতে পারে না আল্লাহ্‌র নিষেধকে। সে হবে প্রকৃত শরীয়ত অনুসারী ইসলামী সমাজের সৎ নাগরিক। আর এই ঈমানদার লোকেরাই ইহকাল পরকাল, উভয় ক্ষেত্রে, পরম সাফল্যের অধিকারী হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا – يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ – وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا – (الا حذاب : ٧١ ٧٠)

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ঠিক কথা বল। তাহলে আল্লাহ্‌ তোমাদের আমলসমূহকে সংশোধিত করে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহ্‌সমূহ মাফ করে দেবেন। আর যে লোকই আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য করল সে-ই পরম সাফল্য লাভে ধন্য হলো। —সূরা আহ্‌যাব ঃ ৭০-৭১

এই জীবনের যাবতীয় কাজ কর্ম ঠিক ঠিক ভাবে সম্পন্ন হওয়া, গুনাহ্‌র মাগ্‌ফিরাত লাভ এবং এই ঈমান সহকারেই আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা হলেই ইহ ও পরকালে পরম সাফল্য লাভ সম্ভব। তা ছাড়া এর কোনোটিই অর্জিত হতে পারে না। এই ঈমান থাকলেই আল্লাহ্‌র ভয় হৃদয় মনে জেগে উঠবে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে চলা সম্ভব হবে। ঈমান না হলে এই সবকিছুই নিষ্ফল ও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا (الاحذاب : ٥٣)

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা নবীর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করবে না এবং খাওয়ার সময় হলেই সে ঘরে পৌঁছে যেয়ো না। তবে যদি খাবার খাওয়ার জন্য ডাকা হয়, তাহলে প্রবেশ করতে পার। —সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৩

www.pathagar.com

কারুর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা একটি সামাজিক অপরাধ বিশেষ। এতে কোনো ব্যক্তিরই নিজস্ব গোপনীয়তা রক্ষা পেতে পারে না। তাছাড়া এর ফলে নানা প্রকারের নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধ হওয়ারও আশংকা থাকে। এই কারণে প্রথমে নবীর ঘরে এবং পরে সব মুসলিম ব্যক্তির ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই নিষেধেরও ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ঈমানই মানুষকে এই নিষেধ মেনে চলতে প্রস্তুত করে। যার ঈমান নেই, সে এই নিষেধ অমান্য করবে এবং আত্মীয় ও অনাত্মীয় কারুর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে নানাবিধ অপরাধ সৃষ্টির কারণ বা সুযোগ ঘটাবে। কিন্তু ইসলামী সমাজে তা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

বিনা অনুমতিতে কারও ঘরে প্রবেশ করা একটি সাধারণ অপরাধ। এই অপরাধ এড়িয়ে চলার জন্য সাধারণভাবে সব ঈমানদার ব্যক্তির প্রতিই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে একই ঘরের অভ্যন্তরে বসবাসকারী বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য এ ব্যাপারে কিছুটা প্রশস্ততা ও স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। যদিও তার মধ্যেও বিশেষ বিশেষ সময় এমন, যখন এই স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ন বা সংকীর্ণ করে সময় বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাই ঈমানদার লোকদের বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرَّتٍ – مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ حِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ – ثَلٰثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ – (النور : ٥٨)

হে লোকেরা, যারা ঈমান এনেছ ! এ নির্দেশ অবশ্যই পালনীয় যে, তোমাদের মালিকানাধীন (ক্রীতদাস-দাসী) এবং পূর্ণ বয়স্কতা পায়নি তোমাদের এমন বাচ্চারা তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করে ঃ তা হচ্ছে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা পরিধেয় বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার সালাতের পর। কেননা এই তিনটি হচ্ছে তোমাদের জন্য পর্দার সময়। এই সময় ছাড়া অন্যান্য সময় এরা বিনানুমতিতে তোমাদের ঘরে প্রবেশ করলে, না তোমাদের কোন গুনাহ্ হবে, না ওদের। —সূরা নূর ঃ ৫৮

বস্তুত নারী-পুরুষ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই জীবনে কিছুটা নির্দিষ্ট স্থান থাকা আবশ্যক, যেখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পূর্ণ নির্বিঘ্নতায় জীবন কাটাতে পারবে এবং এজন্য এমন একটা নির্দিষ্ট সময় থাকাও একান্তই আবশ্যক, যখন সেখানে অন্য কারুরই ঢুকে পড়ার সুযোগ বা আশংকা থাকবে না। এই নিরাপত্তা প্রয়োজন যেমন ঘরের বাইরের লোকদের থেকে, তেমনি ঘরের লোকদের থেকেও। সাধারণত ঘরে যেসব দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানী থাকে ; কিংবা থাকে পূর্ণবয়স্ক ছেলে-মেয়ে, ভাই-বাপ, এদের থেকেও নির্জনতার নিশ্চয়তা থাকা আবশ্যক—বিশেষ করে মেয়েদের জন্য।

www.pathagar.com

ঘরের দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী—এমনকি পূর্ণবয়স্ক হয়নি এমন বালক-বালিকার জন্য ঘরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তির শয়ন কক্ষে প্রবেশের ব্যাপারে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। অন্যথায় ব্যক্তিরা যেমন বিভিন্ন সময় অপ্রস্তুত বা বিব্রত হয়ে পড়তে পারে, তেমনি আকস্মিকভাবে নানা অদ্রষ্টব্য ব্যাপার দেখতে পেয়ে নৈতিকতার দিক দিয়ে বিপর্যয়ে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু তা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। এই কারণেই এই বিধান পেশ করা হয়েছে। এই বিধানেরও ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ঈমান যে কি কি ভাবে মানুষকে নৈতিক অপরাধ থেকে রক্ষা করে এই বিধান তার একটি প্রকৃষ্ট ও স্পষ্ট নিদর্শন।

ঘরের বালক-বালিকরাই ভবিষ্যৎ বংশধর, ভবিষ্যৎ সমাজের নাগরিক। তাদের আদর্শ চরিত্রের অধিকারী বানিয়ে তোলার ব্যবস্থাও অনুকূল পরিবেশসম্পন্ন ঘরের অভ্যন্তরেই হতে হবে। কেননা এখানেই যদি তারা চরিত্র হারানোর মত অবস্থায় পড়ে যায়, তাহ'লে তারা বড় হয়ে বড় মাত্রার অপরাধী হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর তা হলে অপরাধমুক্ত মানুষ ও সমাজ গড়া কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। অথচ ঈমান অপরাধমুক্ত ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া বলিষ্ঠভাবে কার্যকর করার পক্ষপাতী। তাই ঈমানদার লোকদের প্রতি এই নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষেই একান্ত জরুরী।

এই পর্যায়ে সমস্ত ঈমানদার লোকের জন্য যে সাধারণ বিধান জারি করা হয়েছে তা এই ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا – ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ –

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা ঘরের লোকদের সহিত পরিচিত গড়ে তুলবে ও তাদের প্রতি সালাম করবে। এই নীতি তোমাদের জন্য অতীব উত্তম। আশা করা যায়, তোমরা এই নির্দেশের তাৎপর্য অনুধাবন করবে ও স্মরণে রাখবে।

—সূরা নূর ঃ ২৭

বস্তুত ঘরের লোকদের সাথে পরিচিতি লাভ এবং তাদের সাথে একাত্মতা সৃষ্টি না করে হঠাৎ করে ভিতরে প্রবেশ করা আধুনিক পাশ্চাত্য ধর্মহীন সভ্যতার আওতায় নিষিদ্ধ না হলেও ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়। ইসলামে সামাজিক জীবনে সর্বাধিক গুরুত্ব হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব স্বতন্ত্র নির্জনতার (Privacy) এবং নৈতিক চরিত্রের। এ দু'টি ক্ষুণ্ন হতে পারে যে যে কাজে ও আচরণে ইসলামে তা শুধু অপছন্দ করা হয়েছে তা-ই নয়, শিষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধও হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই নিষেধের ভিত্তি

www.pathagar.com

হচ্ছে ঈমান। ঈমানই মানুষকে লোকদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত নির্জনতা ক্ষুণ্ন করা ও চরিত্র হননের সব কাজ থেকে বিরত রাখে।

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطنِ – وَ مَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّـيْطنِ فَاِنَّـه يَاْمُرُ بالْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ – وَ لَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُه مَازَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَـدٍ اَبَـدًا وَّلٰكِنَّ اللهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ – وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ –

হে সেসব লোক, যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চলো না। কেননা যে লোকই শয়তানের পদাংক অনুসরণের নীতি গ্রহণ করবে, শয়তান তো তাকে নির্লজ্জতা ও পাপ-অপরাধজনক কাজেরই আদেশ করবে। বস্তুত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া-অনুকম্পা যদি তোমাদের প্রতি না থাকতো তা'হলে তোমাদের কোন একজন লোকও কখনো পবিত্র হতে পারতো না। বরং আল্লাহ্‌ই যাকে চান পবিত্র পরিশুদ্ধ করেন। আর আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। —সূরা নূর ঃ ২১

ঈমানের পরিপন্থী যে কুফর, তারই অগ্রনেতা হচ্ছে শয়তান। ঈমান যেমন মানুষকে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের অনুগত বানায়, তেমনি কুফর বানায় শয়তানের অনুসারী। অতএব যারাই নিজেকে শয়তানের অনুসারীতে পরিণত করবে, তারাই শয়তানের নির্দেশ ও কু-পরামর্শ অনুযায়ী সকল প্রকার পাপ, পংকিলতা ও অপরাধজনক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে। এক কথায় বলা যায়, দুনিয়ায় যত পাপ, যুলুম, শোষণ, নির্যাতন, বঞ্চনা ও নৈতিক বিচ্যুতি, পদস্খলনজনিত অপরাধ, তা সবই একমাত্র শয়তানের আনুগত্যের ফলশ্রুতির। একমাত্র ঈমানই মানুষকে এই অবাঞ্ছনীয় পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই ঈমানদার লোকদের প্রতি কুরআনের এই উদাত্ত আহ্বান।

এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারাই ঈমান গ্রহণ করবে, তারা কখনই ব্যভিচারের ন্যায় জঘন্য অপরাধ করতে পারে না। যদি কেউ সে অপরাধ করেই বসে, তা'হলে তার জন্য কুরআন-নির্দিষ্ট শাস্তি অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। এই শাস্তি কার্যকর করা ও তা প্রত্যক্ষ করাও ঈমানদার লোকদেরই দায়িত্ব।

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ وَّ لاَ تَاْخُذْكُمْ بِـهِمَا رَاْفَـةٌ فِـىْ دِيْـنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الاٰخِرِ – وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ –

(অবিবাহিত) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী দু'জনের প্রত্যেককেই একশটি করে দোর্‌রা মার এবং দু'জনের প্রতি মহানুভবতা যেন আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে তোমাদের পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক এবং এই দু'জনকে দেয়া শাস্তি যেন ঈমানদার লোকদেরই কিছুসংখ্যক প্রত্যক্ষ করে। —সূরা নূর ঃ ২

www.pathagar.com

ব্যভিচারীকে শাস্তিদান আল্লাহ্‌র বিধান। এ বিধান বা আইন অবশ্যই কার্যকর হতে হবে। তার কার্যকরতার দু'টি দিক। একটি হলো ঃ অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তার উপর ঘোষিত শাস্তিটা কার্যকর করা। আর দ্বিতীয়টি হলো ঃ শাস্তিদানটা যেহেতু প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হতে হবে, এজন্য তা বহু লোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হওয়া এবং বহু লোকের উপস্থিত হয়ে তা প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু এ দু'টি দিকই নির্ভর করে ঈমানের উপর। এ কারণে আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে শাস্তি কার্যকর করতে এবং তাতে কোনরূপ দয়া-সহানুভূতি যেন তার কার্যকরতার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়, এই কারণে শর্ত দেওয়া হয়েছে এই বলে, যদি তোমরা ঈমানদার হও এবং দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ করবে ঈমানদার লোকেরাই। কেননা এ শাস্তিটা শিক্ষাপ্রদ। কেবলমাত্র ঈমানদার লোকেরাই তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

বস্তুত ঈমানই হচ্ছে সর্বপ্রকার অপরাধ প্রতিরোধক, অপরাধ হলে তার নির্দিষ্ট শাস্তির বিধায়ক। ঈমান না হলে এর কোনটাই বাস্তবায়িত হতে পারে না। আর ঈমান থাকলে প্রথমত অপরাধই হবে না। অপরাধ হলেও তার শাস্তি যথাযথভাবে কার্যকর হবে। ফলে তা প্রত্যক্ষকারী জনতা কখনই অনুরূপ অপরাধ করতে সাহসী হবে না। এরই প্রভাবে গোটা পরিবেশ ব্যভিচার তথা অপরাধ-বিরোধী হয়ে উঠবে। অপরাধ প্রতিরোধে এরূপ কার্যকর শক্তি দ্বিতীয় কিছুই নেই, হতে পারে না।

এই ঈমানের ভিত্তিতেই মদ্যপান, জুয়া খেলা ইত্যাদি অপরাধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ –

হে ঈমানদার লোকেরা, চূড়ান্তভাবে জেনে নেবে, যাবতীয় মাদকদ্রব্য, জুয়া, অ-খোদার উদ্দেশে বলিদানের স্থানসমূহ এবং ভাগ্য জানার পন্থাসমূহ শয়তানী কাজের জঘন্য মলিনতা মাত্র। অতএব তোমরা সকলে তা পরিহার কর। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। এর পেছনে মূল ব্যাপার হ'ল, এই মাদক ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে চায় এবং চায় তোমাদেরকে সালাত ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে বিরত রাখতে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, তোমরা এসব পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে ?

—সূরা মায়িদা ঃ ৯০-৯১

www.pathagar.com

সর্বপ্রকারের মাদক ও জুয়া এবং শিরকের কার্যাবলী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া পর্যায়ে এ আয়াতে চূড়ান্ত কথা ঘোষিত হয়েছে, হয়েছে ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে। তার অর্থ—যার মধ্যে ঈমান রয়েছে, সে কখনই এ সব কাজ এবং এর মধ্যে কোন একটিও করতে পারেন না। ঈমানই মানুষকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখে। আর এ সবকয়টি কাজই যেহেতু যাবতীয় অন্যায়,পাপ ও অপরাধের মৌল উৎস ; তাই যে লোক এ সব কাজ থেকে বিরত থাকবে, খুবই আশা করা যায়, সে অন্যান্য সকল প্রকার অন্যায়, পাপ ও অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। কুরআন ঈমানের হাতিয়ার দিয়ে বাকি পাপ ও অপরাধের প্রতিরোধ করতেও ইচ্ছুক। অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনও এই ঈমানের দ্বারাই সম্ভব। কুরআনের এই ইচ্ছা যে নিঃসন্দেহে যথার্থ ও বাস্তবভিত্তিক, একদিকে তদানীন্তন মদীনার সমাজ ও অন্যদিকে একালের পাশ্চাত্য সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে পারে।

এ ঈমানই মানুষকে সকল প্রকার উত্তম উপাদেয় পবিত্র খাদ্য গ্রহণে এবং মৃত জীব, রক্ত, শূকর এবং আল্লাহ্‌র নামে জবেহ্ করা হয়নি এমন সব জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া বর্জন করে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ এই শেষোক্ত জিনিসগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও হীন চরিত্র সৃষ্টিকারী খাদ্য। খাদ্যবস্তু যে মানুষের চরিত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে—ভাল, উৎকৃষ্ট পবিত্র খাদ্য পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্র সৃষ্টি করে এবং নিকৃষ্ট ও জঘন্য খাদ্য মানুষের চরিত্রকে পংকিল করে দেয়, কুরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেও যথার্থ বলে প্রমাণিত করেছে। অপরাধমুক্ত ব্যক্তি ও সামজ গঠনে নিকৃষ্ট জঘন্য খাদ্য পানীয় থেকে সমাজকে মুক্ত করা এবং ভালো, উপাদেয় ও উত্তম-উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণে মানুষকে আগ্রহী বানানো একান্তই কর্তব্য। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানও এ তত্ত্বকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে। তাই কুরআন মজীদে ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا للّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ –

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ –

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা খাও আমার দেয়া উৎকৃষ্ট-পবিত্র খাদ্যসমূহ এবং তোমরা আল্লাহ্‌র শোকর কর যদি তোমরা কেবল তাঁরই বন্দেগীতে রত হয়েই থাক। তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন শুধুমাত্র মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারুর নামে বলি দেয়া জন্তুর মাংস। —সূরা বাকারা ঃ ১৭২-১৭৩

এ আয়াতে ঈমানদার লোকদের প্রতি একদিকে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর এবং আল্লাহ্‌র নামে নয়—অন্য কারুর নামে বলি দেয়া জন্তুর মাংস খাওয়া হারাম করে দেয়া হয়েছে। অপর দিকে আল্লাহ্‌র দেয়া উৎকৃষ্ট পবিত্র খাদ্যসমূহ খাওয়ার অনুমতি ঘোষিত হয়েছে। এই নিষেধ এবং অনুমতি, অন্য কথায় হালাল ও হারাম নির্ধারণের এই

www.pathagar.com

ঘোষণাটি উপস্থাপিত করা হয়েছে ঈমানের উপর ভিত্তি করে। ফলে যাদের ঈমান আছে, তারা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত খাদ্যসমূহকে হালাল মনে করে নিতে এবং যে সব দ্রব্য খেতে নিষেধ করা হয়েছে তাকে হারাম মেনে নিয়ে সম্পূর্ণ পরিহার করে চলতে একবিন্দু দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করতে পারে না।

সত্যি কথা, ঈমানই মানুষকে সর্বপ্রকারের হারাম খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকতে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রস্তুত করে এবং তার ফলে তারা সকল প্রকার নৈতিক পদস্খলন, চরিত্রহীনতা ও যাবতীয় পাপ কাজ থেকে দূরে সরে থাকতে স্বভাবতই সক্ষম হয়। সেদিকে তাদের কোন স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত প্রবণতা থাকে না।

সূরা আল-মাদিয়া শুরু হয়েছে—'হে সে সব লোক যারা ঈমান এনেছ' বলে এবং তৃতীয় আয়াতে নিষিদ্ধ খাদ্য দ্রব্যের বিস্তারিত উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ – وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالاَزْلاَمِ – ذَالِكُمْ فِسْقٌ –

তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারুর নামে বলি দেয়া জন্তু, গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরা, আঘাত খেয়ে মরা, উপর থেকে পড়ে গিয়ে মরা, সংঘর্ষে এসে মরা জন্তুর গোশ্‌ত অথবা কোন হিংস্র জন্তুর ছিন্নভিন্ন করে খাওয়া জীবের অবশিষ্টাংশ জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর জবেহ্ করা না হলে এবং যা কোন বলিদান ক্ষেত্রে জবেহ করা হয়েছে তা'ও। সে সাথে হারাম করা হয়েছে পাশা দ্বারা ভাগ্য জানতে চেষ্টা করাকে। এই নিষিদ্ধ খাদ্যাদি খাওয়া এবং নিষিদ্ধ কার্যাবলী করা তোমাদের পক্ষে শরীয়তের স্পষ্ট লংঘন মাত্র। —সূরা মায়িদা ঃ ৩

এ আয়াতে যে সব জীবের মাংস খাওয়া ও যে-সব কাজ করা হারাম ঘোষিত হয়েছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে যে, তা সবই মানব চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। অথচ ইসলামের মূল লক্ষ্য হ'ল চরিত্রবান লোক ও সমাজ তৈরি। সে কারণেই এসব জিনিস নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে!

ঈমান ও পারস্পরিক চুক্তি ও ওয়াদা

কুরআন-পরিকল্পিত সমাজে পারস্পরিক চুক্তি ও ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। সমাজে ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যকার সুসম্পর্ক এরই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আর তার মূলে ঈমানের ভূমিকা সদা কার্যকর। তাই বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ –

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা পারস্পরিক ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি পুরাপুরিভাবে পূর্ণ কর, রক্ষা কর। —সূরা মায়িদা ঃ ১

একটি জিনিসকে অপর একটি জিনিসের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বেঁধে দেয়াকেই বলা হয় (عقد) সোজা কথায় বলা হয়া গিরা লাগানো—এখানে তার আরও অর্থ হলো, ইসলামী শরীয়তের সে সব আইন বিধান এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত যা পালন করা বান্দাদের জন্য একান্ত জরুরী ও বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। একজন অপর জনের কাছে যে আমানত রাখে এবং পারস্পরিক কাজ-কর্মে একজন অপরজনের কাছে যে ওয়াদা করে, যা পূরণ করা একান্তই কর্তব্য যা পূরণ না হলে কেউ-ই কারুর উপর বিশ্বাস রাখতে ও সাময়িক ক্ষতি বা বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে না এবং লোকদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা না থাকলে সমাজ-ই গড়ে উঠতে ও রক্ষা পেতে পারে না—সেইসবও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। এতে যেমন আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা প্রতিশ্রুতি—যেমন এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করে চলার ওয়াদা শামিল রয়েছে, তেমনি জনগণের পারস্পরিক ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিও এর অন্তর্ভুক্ত। তা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত কিংবা জাতীয় পর্যায়েই করা হোক না কেন। কাজেই এই উভয় দিকের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হলেই কুরআন-পরিকল্পিত আদর্শ সমাজ গঠিত হতে পারে এবং মানুষও পেতে পারে সত্যিকার শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা।

অপরাধমুক্ত ইসলামী সমাজের ভিত্তি যে ঈমানের উপর রক্ষিত, কুরআনে তার উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। সেই সাথে ঈমানের প্রশস্ত রূপকেও তুলে ধরা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি আয়াতের উল্লেখই যথেষ্ট ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِه وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِه وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِه وَ كُتُبِه و رُسُلِه وَ الْيَوْمِ الاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا

হে সেসব লোকেরা, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা ঈমান গ্রহণ কর আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, সেই কিতাবের প্রতি যা নাযিল করেছেন তাঁর রাসূলের উপর এবং সেই কিতাবের প্রতিও যা এর পূর্বে তিনি নাযিল করেছেন। আর যে লোক আল্লাহ্‌, তাঁর ফেরেশ্‌তা, তাঁর কিতাবসমূহ ও পরকারের প্রতি কুফরী করবে, সে গুমরাহীতে অনেক দূরে চলে যাবে। —সূরা নিসা ঃ ১৩৬

ইসলামে উপস্থাপিত মৌলিক ঈমানসমূহ এ আয়াতে বিধৃত হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ আল্লাহ্‌, ফেরেশ্‌তা, কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব, তাঁর রাসূল—হযরত

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সা) এবং অন্যান্য সব নবী-রাসূল এবং পরকাল—এই কয়টির প্রতি ঈমান গ্রহণ। বিচ্ছিন্নভাবে এর এক-একটির প্রতি ঈমানের সমন্বয়েই গড়ে উঠে পূর্ণাঙ্গ ঈমান। এ ঈমানসমূহ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা ঈমানদার বলে পরিচিত বা তাঁর দাবিদার, তাদেরকেই নতুন করে ঈমান আনতে বলা হয়েছে এ আয়াতে।

তাই একথা বলিষ্ঠভাবে বলা যায় যে, কুরআন মজীদ যে ঈমান গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে, যে ঈমানের দাওয়াত প্রচারের জন্য আল্লাহ্‌র নবী-রাসূলগণ প্রাণপাত জিহাদ করে গেছেন এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যে ঈমানের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ গঠন করেছিলেন, সে ঈমান হচ্ছে অপরাধ পরিপন্থী একটি তুলনাহীন শক্তি। এই শক্তি চির নতুন, শাশ্বত—যে ঈমানের ভিত্তিতে আজও ব্যক্তি ও সমাজ—তথা রাষ্ট্র ও অর্থনীতি—এক কথায় পূর্ণাঙ্গ সমাজ গঠন করা হলো তা-ও একটি আদর্শ সমাজ হবে এবং তাতে অপরাধ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে না গেলেও তার মাত্রা, সংখ্যা ও প্রকোপ অনেক অনেক কম হবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

অপরাধ দমনে ইবাদাতের প্রভাব

অপরাধ দমনে বা প্রতিরোধে ইবাদাতের প্রভাব বুঝবার জন্য শুরুতেই ইবাদাতের অর্থ এবং ইসলামে তার সাধারণ, ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্যের আলোচনা করা আবশ্যক। ব্যক্তির আচার-আচরণে তার কি প্রভাব তাও এভাবেই জানতে পারা যাবে। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষার আলোকে এটাও বিশ্লেষণযোগ্য যে, প্রতিটি ইবাদাত ব্যক্তির বিশেষ চরিত্রে কি ধরনের পরিবর্তন সৃষ্টি করে। অপরাধের প্রতিরোধে ইবাদাতসমূহ কি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তা এই আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তার পরই আমরা দেখব প্রকৃত মহাসত্যের সংরক্ষণ ও সহায়তায় ঈমানের কি প্রভাব থাকতে পারে।

العبادة ইবাদাত এর অর্থ

আরবী অভিধান অনুযায়ী 'ইবাদাত' অর্থ الخضوع—Submission বশ্যতা, আনুগত্য, বিনয় ও বাধ্যতা, وَالتَّذَلُّلُ —অবনত, আত্মসমর্পণ। আরবী ব্যবহার طريق معبد 'লাঞ্ছিত পদদলিত পথ'। المخصص গ্রন্থে বলা হয়েছে العبادة الخضوع و التذلل الا ستكانة —এই শব্দগুলির অর্থ অভিন্ন। যে বিনয় ও আত্মসমর্পণ-আনুগত্যের উর্ধ্বে কিছু নেই, তাই ইবাদাত। আনুগত্য—তা মা'বুদের জন্য হোক, কি অন্য কারুর জন্য। বিনয়-অধীনতা-আনুগত্যের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র যে আইন পালন, তা-ই ইবাদাত।

ইবাদাত এমন এক ধরনের আত্মসমর্পণমূলক আনুগত্য, যা জীবন, বুঝ-সমঝ, শ্রবণ-দৃষ্টি ইত্যাদির দাতা ছাড়া আর কেউ পাওয়ার অধিকারী নয়—হতে পারেনা। ইমাম রাগিব তার 'লুগাত' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

العبودية اظهار التذلل و العبادة و ابلغ منها لا نها غاية التذيل ولا يستحقما الاّ من له غاية الافضال وهو الله تعالى

'উবুদিয়াত' অর্থ বিনয়-নম্রতা-অধীনতা প্রকাশ করা। আর ইবাদাত হচ্ছে তারই সর্বোচ্চ ও চূড়ান্তমাত্রা ; কেননা ইবাদাত অর্থ সর্বশেষ মাত্রার আনুগত্য-অধীনতা-আত্মসমর্পণ। তা কেবল সেই মহান সত্তা-ই পাওয়ার অধিকারী যিনি চূড়ান্ত মান ও পরিমাণের দাতা। আর তিনিই আল্লাহ্‌।

www.pathagar.com

অভিধানে শব্দটির ব্যবহারে উবুদিয়াত ও ইবাদাতের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা ইবাদাত শুধুমাত্র বিনয় বোঝায় না—'উবুদিয়াত' তাই বোঝায়। ইবাদাত বলতে এক বিশেষ ধরন ও মানের বিনয়-অধীনতা বোঝায়, যা মা'বুদকে বড় মহানকরণে আনুগত্য ও বিনয়ের দিক দিয়ে চরম মাত্রাকে আয়ত্ত করে।

'লিসানুল আরব' অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ উবুদিয়াত-এর মূল অর্থ হচ্ছে বিনয়, আনুগত্য ও অধীনতা। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে—

لاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ لِمَمْلُوْكِه عَبْدِىْ وَ اَمَتِىْ وَ لِيَقُلْ فَتَاىَ فَتَاتِىْ

তোমাদের কেউ যেন তার ক্রীতদাস-দাসীকে আমার দাস আমার দাসী না বলে, বরং যেন বলে ; আমার ছেলে, আমার মেয়ে।

তাদের উপর স্বীয় বড়ত্ব জাহির করার জন্যই ঐরূপ বলা হয়। তাদের উচিত দাস-দাসীকে নিজের বংশোদ্ভূত প্রকাশ করা। কেননা এই শব্দদ্বয় যে ভাবধারা ও তাৎপর্য প্রকাশ করে তা কেবলমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল ইবাদতই পাওয়ার অধিকারী।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া তার 'রিসালাতুল উবুদীয়া' গ্রন্থে উক্ত আভিধানিক অর্থের বাড়তি তাৎপর্য উপস্থাপিত করেছেন। তা আল্লাহ্র ইবাদাতে এক অনুভূতিক ও সংবেদনশীল চেতনার সংমিশ্রণ করে। ফলে ইবাদাতের প্রচলিত অর্থের সাথে অধিকতর তাৎপর্য সংযোজিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ ইবাদাতের আসল অর্থ বিনয় আনুগত্য। যে পথ সর্বসাধারণের চলাচলের দরুন পথিকদের পায়ের তলে দলিত মথিত হয়, তাকেই বলা হয় الطريق معيد। কিন্তু যে ইবাদাত করার আদেশ করা হয়েছে, তাতে বিনয়-অধীনতার সাথে ভালবাসাও শামিল। তাতে আল্লাহ্র জন্য যেমন চরম মাত্রার বিনয়-অধীনতা স্বীকার্য তেমনি চরম মাত্রার প্রেম-ভালবাসাও আল্লাহ্রই জন্য উৎসর্গীত। ভালোবাসার সর্বশেষ পর্যায় হৃদয়ের চূড়ান্ত সমর্পণ প্রিয়তমের সাথে। পরে তাতে অন্তরকে উজাড় করে ঢেলে দেওয়া ভাবধারা থাকে। সে হচ্ছে সর্বক্ষণ লেগে থাকা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া আরও বলেছেন ঃ ইবাদাত শব্দের তাৎপর্য দু'টি দিক দিয়ে প্রতিভাত হয়। একটি সংবেদনশীল বিনয় ও ভালবাসা—যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই পেতে পারে না। কোন লোক যদি কারোর কাছে বিনীত-অনুগত হয়, কিন্তু অন্তরে তার প্রতি থাকে ঘৃণা ও ক্রোধ, তাহলে সে নিশ্চয়ই তার ইবাদাতকারী নয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি কোন জিনিসকে ভালোবাসে কিন্তু তার বিনীত-অনুগত না হয়, তাহলেও সে তার ইবাদাতকারী নয়। কাজেই দু'টির কোন একটি মাত্র গুণ আল্লাহ্র ইবাদাতের জন্য কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়। সে জন্য প্রয়োজন, আল্লাহ্ই হবেন ব্যক্তির কাছে সর্বাধিক—সবকিছুর তুলনায় অনেক বেশি প্রিয় ; সবকিছুর তুলনায় অনেক বেশি বড়, সম্মানার্হ। বস্তুত ভালবাসা ও পূর্ণাঙ্গ বিনয় আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই বান্দাহ্র কাছে পেতে পারে

www.pathagar.com

না। আল্লাহ্ ছাড়া আর যাকেই অধিক ভালোবাসুক, তার এই ভালোবাসা তার জন্য বিপর্যয়কারী হবে। আল্লাহ্র নির্দেশ ভিন্ন কোন কিছুকে বড় মনে করা, অধিক সম্মান প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ বাতিল নীতি, তার অধিকার নেই কারোর। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَ اَبْنَاؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِه وَ جِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِه فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِه –

হে নবী ! বলে দিন, তোমাদের পিতা ও সন্তান, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বংশ-পরিবার-গোত্র, অর্জিত ধন-সম্পদ ও ব্যবসায়—যার মন্দাভাবকে তোমরা খুবই ভয় পাও—এবং পছন্দনীয় ঘর-বাড়ি তোমাদের কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের এবং তাঁর পথে জিহাদ করার তুলনায় যদি অধিক প্রিয় ও ভালোবাসার পাত্র হয়, তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফয়সালা আসছে। ....

—সূরা তাওবা ঃ ২৪

রাসূলে করীম (সা)-এর হাদীসে উবুদিয়াতের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং তার অনিবার্য দাবিস্বরূপ আল্লাহ্র শরীয়াত পালন এবং ভালোবাসা ও সন্তুষ্ট সহকারে আল্লাহ্র অধীন-অনুগত হওয়ার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কয়েকটি হাদীস ঃ

مَنْ اَحَبَّ اللّٰهِ وَ ابْغَضَ اللّٰهِ وَ اَعْطٰى اللّٰهِ مَنَعَ اللّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

যে লোক আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসলো, আল্লাহ্র জন্যই অপছন্দ করলো, দিল আল্লাহ্র জন্য, দেয়া বন্ধ করল আল্লাহ্র জন্য, তার ঈমান পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।

—আবূ দাউদ

اَوْثَقَ عُرَ الْاِيْمَانِ الْحَبُّ فِىْ اللّٰهِ وَ الْبَغْضُ فِىْ اللّٰهِ

আল্লাহ্তেই ভালোবাসা ও আল্লাহ্র কারণেই অ-ভালোবাসা-অপছন্দ হওয়াই ঈমানের দৃঢ়তর রজ্জু। —আহমদ, তিবরানী

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُه اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَ اَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءُ لَا يَحِبُّهُ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنْ يَّكْرَهُ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّلْقِىَ فِى النَّارِ

তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের মিষ্টতা ও স্বাদ লাভ করেছে বলে মনে করা যাবে ঃ তারা হচ্ছে—আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই হবেন তার কাছে অন্য সবকিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। —তিবরানী

www.pathagar.com

ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসবে তো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য, এবং আল্লাহ্‌ই তাকে কুফর থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, অতঃপর সে তাতে ফিরে যাওয়াকে তেমনই অপছন্দ করবে যেমন অপছন্দ করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।

ইসলামে ইবাদাতের তাৎপর্য

ইসলামে ইবাদাতের তাৎপর্যে সম্পূর্ণ 'দীন'ই অন্তর্ভুক্ত। কেননা তার শরীয়াত সম্মত নিগূঢ় তত্ত্ব—ঈমান ইবনে তায়মিয়ার বিশ্লেষণ অনুযায়ী—পরিপূর্ণ বিনয়-আনুগত্য এবং বাহ্যিক ও আন্তরিক ভালোবাসা মহান আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট ও উৎসর্গীত করা। আর তা সমগ্র জীবন পরিব্যাপ্ত গোটা জীবন—জীবনের সকল কাজেই আল্লাহ্‌র শরীয়ত পালন-অনুসরণ, কেবলমাত্র তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ এবং শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা ইসলামী ইবাদাতের মর্মবাণী।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া লিখেছেন ঃ 'ইবাদাত' একটা ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ। যে কথা, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যে কাজই তিনি পছন্দ করেন, যা'তে তিনি খুশি ও সন্তুষ্ট হন, যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, সত্য কথা বলা, আমানতের সংরক্ষণ ও ফেরত দান, পিতা-মাতার কল্যাণ সাধন, সেলায়ে রেহমী রক্ষা, ওয়াদাপূরণ, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ, কাফির-মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার, ইয়াতীম-মিসকীন-নিঃস্ব পথিক-অধীন মানুষ ও পশুদের হক আদায়, দোয়া, যিক্‌র, কুরআন তিলাওয়াত এইগুলি এবং এই ধরনের আরও বহু কাজই ইবাদাতরূপে গণ্য। আল্লাহ্‌ও রাসূলের ভালোবাসা, আল্লাহ্‌কে ভয় করা, তাঁরই কাছে আত্মসমর্পিত হওয়া, তাঁরইজন্য আনুগত্য খালেস করা, ধৈর্য সহকারে তাঁর হুকুম-বিধান পালন, তাঁর নিয়ামতের শোকর, তাঁর ফরসালায় রাযি থাকা, তারই উপর তাওয়াক্কুল, তাঁর রহমত পাওয়ার আশা-বাসনা পোষণ এবং তাঁর আযাবকে ভয় করা প্রভৃতি ইবাদাতের অপরিহার্য গুণাবলী। এতে করে দেখা যাচ্ছে যে ইবাদাতের তাৎপর্যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং সমস্ত দীনী ব্যাপারে তাঁর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় অনিবার্য। তাতে ফরয, নফল এবং দিলের কাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ ও সাধারণ আচার-আচারণ—যাকে নৈতিক চরিত্র, মর্যাদাপূর্ণ কাজ, নফল এবং দীনের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ; রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা, মুসলমানদের পারস্পরিক অমুসলমানদের সাথে সম্পর্ক—শান্তি ও যুদ্ধ—এই সবকিছু সমান গুরুত্ব সহকারে ইবাদাতের মধ্যে শামিল রয়েছে। এই সম্যক অর্থেই ইবাদাত আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ও দাসত্ব-অধীনতা। আদেশ পালন, নিষেধ অনুসরণ-বিশ্বাস, কথা ও কাজ—সর্বক্ষেত্রে কার্যকর। ফলে মানুষ আল্লাহ্‌র আবেদ হতে পারে কেবল তখনই যখন তার গোটা জীবন শরীয়াতের অনুসারী ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্‌ যা হালাল করেছেন তা-ই তার কাছে হালাল, আল্লাহ্‌ যা হারাম করেছেন তাই হবে তাঁর কাছে হারাম। নিজের ইচ্ছা-প্রবৃত্তি

www.pathagar.com

ও কামনা-বাসনা-লালসার অনুসরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র হিদায়েত অনুযায়ী জীবনের আচরণ গ্রহণ।

বস্তুত কতিপয় সুনির্দিষ্ট ইবাদাতের কাজ আঞ্জাম দেয়ার মধ্যেই ইবাদাতের তাৎপর্য নিহিত নয় এবং ইবাদাতের কতিপয় পরিচিত-প্রচলিত অনুষ্ঠান পালনের মধ্যেও তা সীমাবদ্ধ নয়। লোকদের ধারণা, নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিক্‌র-দোয়া-ইস্তিগ্‌ফার—এই কয়েকটি অনুষ্ঠান পালন করলেই বুঝি ইবাদাত পালিত হলো এবং আল্লাহ্‌র মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক হলো। কিন্তু তা ঠিক নয়। কেননা ইবাদাতের পরিধি অনেক অনেক বিস্তীর্ণ ও বিশাল, ব্যাপক। তাই যে লোক দুনিয়ার বিপুল কর্মকান্ডের মধ্যে মুবাহ্ কাজগুলি নিরন্তর করতে থাকে, সে-ও আল্লাহ্‌র আবেদ গণ্য হতে পারে, যদি তার নিয়ত সঠিক ও শুভ হয়, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয় শরীয়াতসম্মত। যে মুসলিম জমি চাষাবাদ করে আল্লাহ্‌র রিয্‌ক পাওয়ার আশায়, শরীয়াতসম্মত পন্থায় রোজগার পাওয়ার চেষ্টাস্বরূপ, যার দ্বারা সে নিজের রুজি ও পরিবার-পরিজনের জন্যও রুজির ব্যবস্থা করতে পারবে, সেও আল্লাহ্‌র আবেদ গণ্য হতে পারবে। এই তত্ত্ব বহু সংখ্যক হাদীস থেকেও প্রতিভাত। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে—

এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলো। রাসূলের সাহাবীগণ লোকটির অবয়ব ও তৎপরতা লক্ষ্য করলেন। তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই লোকটি যদি আল্লাহ্‌র পথেযুদ্ধে চলে আসত।' তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ 'লোকটি যদি তার ছোট ছোট সন্তানের জন্য শ্রম করে উপার্জনের লক্ষ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে তো সে আল্লাহ্‌র পথে লেগেই আছে। আর যদি তার দুই বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য উপার্জনে শ্রম করার জন্য এসে থাকে, তা হলেও সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র পথেই নিয়োজিত। সে যদি কেবল নিজের প্রয়োজন পূরণে শ্রম করার জন্য বের হয়ে এসে থাকে, তা' হলেও সে আল্লাহ্‌র পথে চলমান। কিন্তু যদি লোক দেখানো ও গৌরব কিংবা অহংকার প্রকাশার্থে বেরিয়ে থাকে, তা'হলে সে শয়তানের পথের পথিক।'

কৃষিকাজ ও বৃক্ষ রোপণের মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الاّ كان له به هدقة

যে মুসলমানই গাছ রোপণ করবে বা কৃষির ফসল বুনবে, ফলে তাতে ফল বা ফসল ফলবে, তা' থেকে পাখি, মানুষ বা জন্তু-জানোয়ার ভক্ষণ করবে, তা'হলে তাতে তার সদকার সওয়াব হবে। —বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলাই রিয্ক সন্ধানকারীদের আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের সমপর্যায়ের লোক বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছেন ঃ

وَ اخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَ اخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ –

অন্য লোকেরা পৃথিবীতে চলাফিরা করে আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করে বেড়ায় এবং আরও অন্যরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধকার্যে লিপ্ত। —সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ২০

মানুষ স্বীয় যৌন প্রবৃত্তি ও লালসা কামনার চরিতার্থতার জন্য, স্ত্রীর অধিকার আদায়, যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা ও মানব বংশের স্থিতি রক্ষার লক্ষ্যে স্ত্রী সঙ্গম করেও আল্লাহ্র কাছ থেকে বিপুল সওয়াবের অধিকারী হতে পারে। রাসূলে করীম (সা) সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাদের যে কারুর যৌনাঙ্গেও সদ্কার সওয়াব রয়েছে।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে রাসূল, একজন লোক তার যৌন কামনা চরিতার্থ করলেও কি তার জন্য সওয়াব হবে ? তিনি বললেন ঃ 'ভেবে দেখ, সে যদি হারামভাবে যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতো তা'হলে তাতে কি তার গুনাহ হতো ? বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঠিক সেইভাবেই কেউ যদি হালাল পথে তা চরিতার্থ করে তা'হলে তাতে সে অবশ্যই সওয়াব পাবে।' —মুসলিম, তিরমিযী

অকাট্যভাবে প্রতিভাত হলো, ইসলামে 'ইবাদাত' মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের রকমারি কর্মতৎপরতা পরিব্যাপ্ত। মুসলিম ব্যক্তি যেখানেই আল্লাহ্র আনুগত্যকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করবে, সে জন্যই চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে, সেই লক্ষ্যকেই সে জীবনের চরমতম ও সর্বোচ্চ লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট করে নিবে, তার সমস্ত কাজ ও তৎপরতাই 'ইবাদাত' গণ্য হবে। এ-ই হচ্ছে আল্লাহ্র এই সংক্ষিপ্ত ঘোষণার ব্যাখ্যা ঃ

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ –

আমি মানুষ ও জ্বিনকে কেবল আমারই দাসত্ব করার লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছি।
—সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬

যারা মানব মন ও বিবেককে তার উপর প্রভাব ও কর্তৃত্বশালী যে কোন আধিপত্যবাদীর প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিলাভের আহ্বান জানায়—যেন শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত 'উবুদিয়াত' একক ও একক মহান আল্লাহ্র জন্যই একান্ত হয়ে যাবে, আল্লাহ্ প্রেরিত সব নবী-রাসূলেরই ছিল এই দাওয়াত ও আহ্বান। কুরআনের আয়াতের ভাষায় ঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلهٍ غَيْرُه –

হে জনগণ, তোমরা এক আল্লাহ্র দাস হয়ে জীবন যাপন কর, তিনি ছাড়া তোমাদের মা'বুদ আর কেউই নেই। —সূরা আরাফ ঃ ৫৯

www.pathagar.com

এভাবে প্রত্যেক নবী-রাসূলই আল্লাহ্‌র একত্ব এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করার দাওয়াত প্রচার করেছেন।

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

প্রতিটি জনগোষ্ঠীতেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি এই দাওয়াত লয়ে যে, তোমরা বন্দেগী কবুল কর এক আল্লাহ্‌র এবং তাগূতসমূহকে (আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তিসমূহ—যারা নিজেরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব করে না, মানুষকে নিজেদের দাস বানায়) অস্বীকার কর, এড়িয়ে চল। —সূরা নাহ্‌ল ঃ ৩৬

وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّه لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ –

হে নবী ! তোমার পূর্বে যে রাসূলই আমি পাঠিয়েছি, তারই প্রতি ওহী পাঠিয়েছি এই কথার যে, আমি ব্যতিরেকে ইলাহ কেউই নেই। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর। —সূরা আম্বিয়া ঃ ২৫

ফিকাহ্‌বিদগণ শরীয়তের বিধানাবলীকে দু'ভাবে বিভক্ত করেছেন। একভাগ ইবাদাত এবং দ্বিতীয় ভাগ মুয়ামালাত। এ বিভক্তিটি জ্ঞানচর্চা অধ্যয়ন ও গ্রন্থ প্রণয়নকালীন সুবিধার লক্ষ্যে। আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধসমূহকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দেখা গেছে—এক পর্যায়ের আহ্‌কাম, ইবাদাতমূলক (تعبدى) শরীয়তের বিধানদাতা নিজে তার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার সীমাসমূহও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে সে পর্যায়ে কারুরই নতুন কিছু ব্যবস্থার প্রবর্তন বা সংযোজনের একবিন্দু অধিকারই থাকতে পারে না ; করা হলে তা হবে বিদ্‌আত। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত তার পরিধি বিস্তৃত না হবে, ততক্ষণ ভাবধারা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। এই জিনিসেরই নাম ইবাদাত। অতএব ইবাদাতের মূল কথা হচ্ছে ঝুঁকি, পণ, কৃত সংকল্প এবং ঐকান্তিকতা। আর একটি ধারা রয়েছে যা মানুষের জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ককে সুষ্ঠু করে গড়ে তোলে শরীয়তের মৌলনীতি সমূহের ভিত্তিতে। তার রূপ কাল-বিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হয়। এই অংশেরই নাম মুয়ামালাত। এই পর্যায়ের মূল কথা হচ্ছে 'আল-ইবাহাত'—সবই যুবাহ, কোন জিনিস বা কাজই মূলত হারাম বা নিষিদ্ধ নয়।' এই দু'টি ধারাই ইবাদাতরূপে গণ্য।

কিন্তু এই পারিভাষিক বিভক্তিই বহু মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে। তারা মনে করেছে, জীবনের 'মুয়ামালাত' অংশের সবকিছু বাদ দিলে যা থাকে, কেবল তা-ই ইবাদাত, অন্যটা নয়। অথচ এই উভয় ধারার সমষ্টিরই নাম দীন। এই দীন পালনেরই নাম ইবাদাত। শরীয়ত মুতাবিক ইবাদাতসহ 'মুয়ামালাতের' সমস্ত কাজ আঞ্জাম দেয়াই হ'ল প্রকৃত দীন পালন এবং এরই নাম 'ইবাদাত'। আর এইসব ক্ষেত্রেই বান্দাহ যদি নিজেকে একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগত-বিনীত বান্দাহ্‌ মনে করে শরীয়তের বিধান পালন করে এবং তা করে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও মুহাব্বত পেতে চায়, তা'হলেই তা ইবাদাত হবে। সে হতে পারবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাহ্‌।

www.pathagar.com

অপরাধ প্রতিরোধে ব্যাপক তাৎপর্যসম্পন্ন ইবাদাতের প্রভাব

সাধারণ ও বিস্তৃত তাৎপর্যের দৃষ্টিতে আদেশ-নিষেধ সমন্বিত আল্লাহ্‌র গোটা দীন পালন করাই ইবাদাত। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ যথাযথ পালন করা অপরিহার্য। তা'হলেই উবুদিয়াতের তাৎপর্য আল্লাহ্‌র জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়ে দাঁড়াবে। যে কাজেই মানুষের নৈতিক বা দৈহিক ক্ষতি বা কষ্টের দিক নিহিত, ইসলাম তা করতে নিষেধ করেছে। তা সগীরা হোক, কি কবীরাহ্। এর ফলে আজ পর্যন্ত যত রকমের ধরনের প্রকারের অপরাধ জানতে পারা গেছে তা সবই শরীয়তের আওতাভুক্ত। কুরআন মজীদে বর্ণনা ভঙ্গীর স্টাইল হিসাবে গৃহীত বিভিন্ন রূপ ও আঙ্গিকে তা মওজুদ রয়েছে। আর সহীহ হাদীসে কখনও তা এজমালীভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আবার কখনও বলা হয়েছে সবিস্তারে।

ইসলাম নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তা প্রকাশ্য হোক, কি গোপনে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ لاَ تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ

তোমরা নির্লজ্জতা, নগ্নতা, অশ্লীলতার নিকটেও যেও না—তা প্রকাশ্য হোক, কি গোপণীয়। —সূরা আন্‌আম ঃ ১৫১

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ

বল হে নবী ! আমার রব্ হারাম করেছেন সমস্ত নির্লজ্জতা-নগ্নতা-অশ্লীলতা, তা প্রকাশমান হোক কি গোপন। —সূরা আরাফ ঃ ৩৩

যে কাজ বা কথা জঘন্য, কুৎসিত, নির্লজ্জতাময়, কুরআনের ভাষায় তা-ই (এক বচনে) ফাহেশা (আর বহু বচনে) ফাওয়াহিশ।

সমাজকে এই নির্লজ্জতা-অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করারও তাকিদ রয়েছে ইসলামে। সমাজের লোকদের চক্ষু ও কর্ণ যাতে করে নির্লজ্জতার শব্দ ও দৃশ্য থেকে রক্ষা পায়, সে জন্য বিশেষ সতর্কতাবলম্বন ইসলামেকাম্য। এই কারণে কুরআনে নির্লজ্জতা অশ্লীলতার প্রকাশ ঘটানোকে কঠিন অপরাধের কাজ বলে ঘোষিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اِنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَ الاٰخِرَةِ – وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ –

যে সব লোক ঈমানদার লোকদের সমাজে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, ব্যভিচার প্রকাশিত হোক তা পছন্দ করে, ভালবাসে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই পীড়াদায়ক আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে। তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন, তোমরা জানো না। —সূরা নূর ঃ ১৯

www.pathagar.com

সকল প্রকার পাপ, সীমালংঘন, বিদ্রোহ-স্বেচ্ছাচারিতা ও ঘৃণ্য কাজ নিষেধ করা হয়েছে। যে সব কাজে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন, তা-ই পাপ, তা-ই গুনাহ্ ; সত্যের সীমালংঘন করে বাতিলের মধ্যে পড়ে যাওয়াই সীমালংঘন ও বিদ্রোহ। কার্যকলাপে সুবিচার ও ন্যায়পরতার বিপরীত আচরণ গ্রহণই স্বেচ্ছাচারিতা। আর সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়তের বিধানের পরিপন্থি যা কিছু তা-ই ঘৃণ্য, তা-ই পরিহার্য। ইসলামী সমাজে তা-ই অপরিচিত যেন।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الاِثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

বল, আমার রব্ যেসব জিনিস হারাম করেছে, তাতো এই নির্লজ্জতার কাজ—প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং গুনাহ্র কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি ও বিদ্রোহমূলক কাজ।

—সূরা আরাফ ঃ ৩৩

এই পর্যায়ে কুরআন মজীদে বেশ কয়েকটি আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে। তন্মধ্যে আরও চারটি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ

যারা পাপের কাজ করে, তাদের প্রতিফল দেয়া হবে তারই যা তারা করেছিল।

—সূরা আনআম ঃ ১২০

وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْىِ

আল্লাহ্ নিষেধ করেন সর্বপ্রকারের নির্লজ্জতার কাজ, ঘৃণ্য, অপছন্দনীয় এবং সত্যবিরোধী বাড়াবাড়ি কাজকে। —সূরা নাহ্ল ঃ ৯০

وَ لاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ –

তোমরা সীমাংলঘন করো না। কেননা আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। —সূরা বাকারা ঃ ১৯০

وَ لاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ

এবং পাপ ও সীমালংঘনমূলক কাজে পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা করো না।

—সূরা মায়িদা ঃ ২

ইসলাম সকল রূপের ও প্রকারের যুলুম হারাম করে দিয়েছে। তার কঠিন ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। ইসলামের ঘোষণায় বলা হয়েছে, এইসব নির্লজ্জতা, নাফরমানী, আল্লাহ্দ্রোহিতা ও পাপ কাজের ফলে এক একটা জাতি, জনসমষ্টি ধ্বংস হয়ে যায় অনিবার্যভাবে এবং যুলুমকারীদের উপর আল্লাহ্র কঠিন শাস্তি নেমে আসে। যুলুম হচ্ছে ঃ প্রত্যেক জিনিসকে তার নিজস্ব বা উপযুক্ত স্থানের পরিবর্তে অন্যত্র রাখা এবং সীমালংঘন করা। ইমাম রাগিবের বর্ণনানুযায়ী যুলুম তিন প্রকারের ঃ

www.pathagar.com

প্রথম ঃ যুলুম আল্লাহ্ ও মানুষের পারস্পরিক ক্ষেত্রে। এই পর্যায়ের বড় যুলুম হচ্ছে বান্দাহ্র কুফরী করা, আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা এবং মুনাফিকী করা।

দ্বিতীয় ঃ মানুষের পারস্পরিক ক্ষেত্রে যুলুম করা।

আর তৃতীয় হচ্ছে , ব্যক্তির নিজের প্রতি নিজের যুলুম। সকল প্রকারের যুলুম-ই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ – اِنَّمَا يُؤَخِّرُ هُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الاَبْصَارُ

যালিম লোকেরা যা কিছু করে, তোমরা মনে করো না আল্লাহ্ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না বা সে বিষয়ে জানেন না। তিনি তো তাদেরকে আযাব দেওয়ার কাজ সেই দিনের জন্য বিলম্বিত করেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ চড়কগাছ হবে। (কিয়ামতের দিন) —সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪২

وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا

তোমাদের পূর্বের বহু যুগের মানুষকে তাদের যুলুম করার দরুন ধ্বংস করে দিয়েছি। —সূরা যূনুস ঃ ১৩

وَ لاَ تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

তোমরা যালিমদের উপর নির্ভরশীল হবে না, তাহলে আগুন তোমাদেরকেও দমন ও ধ্বংস করে দিবে। —সূরা হূদ ঃ ১১৩

وَ تِلْكَ الْقُرٰى اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا –

এই জনপদবাসিদের আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের যুলুমের কারণে এবং তাদের ধ্বংস করার জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট ওয়াদাভুক্ত ছিল। —সূরা কাহ্ফ ঃ ৫৯

গণমানুষের মৌলিক ও সর্বপ্রকারের অধিকারকে ইসলাম পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত করেছে। এই অধিকারসমূহের মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষার প্রবল তাকিদ জানিয়েছে। এ অধিকার হরণ করার অপরাধের শাস্তিও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে এবং নির্ধারণ করেছে। এই অধিকার পর্যায়ে পাঁচটি সমগ্রের উল্লেখ হয়েছে আসমানী দীনের গ্রন্থে। এগুলি সংরক্ষিত হলেই গোটা দীনও সংরক্ষিত হয়। সে পাঁচটি অধিকার হচ্ছে ঃ দীন, মান-সম্মান, জান-প্রাণ, ধন-মাল ও বিবেক-বুদ্ধির সংরক্ষণ। এ কয়টি সংরক্ষণের তাকিদ কুরআন মজীদের আয়াতে স্পষ্ট, অকাট্য ও বলিষ্ঠ ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে। আয়াতসমূহ এখানে উল্লিখিত হচ্ছে ঃ

وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ

তোমরা প্রাণ হত্যা করো না। আল্লাহ্ তাকে সম্মানার্হ করেছেন। তবে বিচারের জন্য তা করা হলে সে কথা স্বতন্ত্র। —সূরা ইস্রা ঃ ৩৩

www.pathagar.com

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُه جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا

যে লোক সংকল্প গ্রহণ করে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম, তথায় সে চিরদিন থাকবে। —সূরা নিসা ঃ ৯৩

وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنى اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً

তোমরা যিনার নিকটেও যেও না। তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও (যৌন তৃপ্তি লাভের জন্য তা) নিতান্তই খারাপ উপায়। —সূরা ইস্‌রা ঃ ৩২

وَ اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبوا –

আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। —সূরা বাকারা ঃ ২৭৫

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطنُ مِنَ الْمَسِّ –

যারা সুদ খায় তারা যেন শয়তানের স্পর্শে পাগলপারা হয়ে চলাফিরা করে। —সূরা বাকারা ঃ ২৭৫

وَ لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

তোমরা পরস্পরের মাল বাতিল উপায়ে ভক্ষণ করো না। —সূরা বাকারা ঃ ১৮৮

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী উভয়কে একশতটি দোর্‌রা মারো। —সূরা নূর ঃ ২

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْ هُمْ ثُمَانِيْنَ جَلْدَةً

যেসব পুরুষ চরিত্রবর্তী মেয়েলোকদের উপর যিনার মিথ্যা অভিযোগ তোলে, কিন্তু তা প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থাপিত করতে পারে না, তাদের আশি দোর্‌রা মারো। —সূরা নূর ঃ ৪

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلى

হে ঈমানদারগণ ; হত্যাকান্ডের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। —সূরা বাকারা ঃ ১৭৮

اِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَ رَسُوْلَه وَ يَسْعَوْنَ فِى الاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الاَرْضِ –

www.pathagar.com

যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে চেষ্টা পায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে—হয় তাদের হত্যা করা হবে, না হয় শূলবিদ্ধ করা হবে। অথবা হাত ও পা বিপরীতভাবে কেটে দেয়া হবে, কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। —সূরা মায়িদা ঃ ৩৩

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأَنْصَابُ وَ الأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطنِ فَاجْتَنِبُوْهُ –

নিঃসন্দেহে মদ্য, জুয়া, বলিদানের বেদীসমূহ এবং গণনার মাধ্যমে ভাগ্য জানতে চেষ্টা করা শয়তানী কাজের অপবিত্রতা। অতএব তোমরা এর প্রত্যেকটিই পরিহার কর। —সূরা মায়িদা ঃ ৯০

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ –

চোর—স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ের হাত কেটে দাও। তারা যা করেছে এটা তার ফল এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নির্ধারিত শাস্তি। —সূরা মায়িদা ঃ ৩৮

বহুসংখ্যক হাদীসে এসব কুরআনী আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে রাসূলের সুন্নাতের অবদান। একজন মুসলমানের কাছে তার ভাই অপর মুসলিমের কি মর্যাদা ও জান-মালের নিরাপত্তা প্রাপ্য, এ থেকে তা জানতে পারা যায়। মানুষের অধিকার রক্ষা করা হয়েছে এসব বিধানের মাধ্যমে। এ অধিকার হরণ বা তার উপর হস্তক্ষেপ অত্যন্ত বড় গুনাহ্—তা কথার মাধ্যমে হোক বা কাজের মাধ্যমে করা হোক।

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন—

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে লোক আমাদের উপর অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করবে, সে আমাদের (মুসলিম সমাজের) লোক নয় এবং যে আমাদিগকে প্রতারিত করবে সে-ও আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না।

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هذِهِ غَدْرَةُ فَلاَنٍ

প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকেরই একটা পতাকা হবে কিয়ামতের দিন। ডাকা হবে এই বলে যে, এটি অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী কার্য থেকে দূরে সরে থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞসা করলেন, সে সাতটি কার্য কি কি ? জওয়াবে রাসূলে করীম (সা) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা, যাদু করা, আল্লাহ্‌র হারাম করা নর হত্যা করা—তবে আইনের জন্য করা হলে আলাদা কথা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ, কাফির শত্রুর সাথে যুদ্ধকালে পালিয়ে যাওয়া, অসতর্ক বা জানে না এমন সচ্চরিত্রবতী মহিলাদের উপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ। —বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

রাসূলে করীম (সা) সুদখোর ও যে সুদ খাওয়ায়—উভয়ের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন।

তিনি বলেছেন, কথায় খোঁচাদানকারী, অভিশাপ বর্ষণকারী, বাজে ও নির্লজ্জ কথা-বার্তার বকবককারী ব্যক্তি মুসলিম নয়।

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

যে লোক স্বীয় দীন বদলে দিল, ইসলাম ত্যাগ করে তদস্থলে অন্য ধর্মমত গ্রহণ করল, তাকে হত্যা কর। (মুসলিম ছাড়া অন্যান্য সব কয়খানি হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত)

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন 'তোমরা আমার নিকট থেকে বিধান গ্রহণ কর। আল্লাহ্ ওদের পথ বানিয়ে দিয়েছেন। অবিবাহিত-অবিবাহিতার যিনায় প্রত্যেককে একশ'টি দোর্‌রা এবং এক বছর কালের জন্য নির্বাসনের শাস্তি দিতে হবে। আর বিবাহিত-বিবাহিতার যিনার শাস্তি একশ'টি দোর্‌রা এবং রজম। (বুখারী ও নাসায়ী বাদে সব কয়খানি হাদীস গ্রন্থ)

যায়ের ইবনে ইয়াজীদ (রা) বলেছেন ঃ

كُنَّا نَاْتِىْ بِالشَّارِبِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ فِىْ اِمَرَةِ اَبِىْ بَكْرٍ فَنَقُوْمُ اِلَيْهِ نَضْرِبُهُ بِاَيْدِيْنَا وَ نَعَالِنَا وَ اَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ اِمْرَةِ عُمَرَ مُجَلَّدَ اَرْبَعِيْنَ حَتَّى اِذَا عَتَوْا فِيْهَا وَ فَسَقُوْا جُلِّدَ ثَمَانِيْنَ –

আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের আমলে মদ্যপায়ীকে আমাদের হাতে জুতা ও চাদর দ্বারা মারপিট করতাম। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে চল্লিশ দোর্‌রা মারা হতো। কিন্তু পরে দেখা গেল মদ্যপায়ীরা খুব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং সীমালংঘন করে যাচ্ছে, তাই তখন আশি দোর্‌রা মারার বিধান কার্যকর করা হয়।

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنْ اَرْضٍ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعَ اَرْضِيْنَ –

যে লোক এক বিঘত পরিমাণ জমি যুলুম করে দখল করে নিবে তার গলায় সাত তবক যমীনের মালা ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

যে লোক নিতান্ত মূর্খতাবশত আত্মহত্যা করবে, সে চিরদিন জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে। যেলোক কোন লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে সেই অস্ত্র দ্বারা নিজের পেট কাটতে থাকবে জাহান্নামে বসে। চিনদিনই তাকে তথায় থাকতে হবে। এটিও রাসূলেরই হাদীস।

কুরআন ও সুন্নাতের এইসব অকাট্য দলীল অবশ্যই পালনীয়। যে মুসলিমই এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী গ্রহণ করবে, তার পক্ষে এগুলি যথাযথভাবে পালন করা একান্তই

www.pathagar.com

কর্তব্য। আর বাস্তবিকই কেউ যদি উপরোক্ত দলীলসমূহ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারে, তার মনে, চরিত্রে অপরাধ প্রবণতা কোন স্থান পেতে পারে না। আর থাকলেও এই বিধানাবলী পালনের মাধ্যমে তার মূলোৎপাটন অবশ্যম্ভাবী।

মানুষের চরিত্রে ও আচার-আচরণে ইবাদাতের প্রভাব

ইসলামের চারটি ইবাদাত সর্বজনপরিচিত, মৌলিক এবং ইসলামী জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী। সে চারটি ইবাদাত হচ্ছে—সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ। মূলত এর প্রত্যেকটিই মানুষের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া উপস্থাপিত করেছে। প্রত্যেকটিরই চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সকল প্রকার হীনতা-নীচতা থেকে মুক্ত করে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ্ বানানো। মানব জীবনকে সকল প্রকার পাপ, না-ফরমানী ও পংকিলতা থেকে মুক্ত করা গেলেই এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। তখন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সকল প্রকার অন্যায় ও অপরাধজনক কাজ থেকে দূরে সরে থাকবে। এই ইবাদাতসমূহের প্রত্যেকটিই মানুষকে সেই লক্ষ্যে প্রস্তুত করে। ইবাদাতসমূহের সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কিভাবে সম্ভব হয়, এখানে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করা হচ্ছে।

১. সালাত ঃ সালাত মূলত মহান আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর বান্দাহ্‌র এবং বান্দাহ্‌র সাথে তার মা'বুদের গভীর পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন করে, মনে-হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের ভাবধারার সৃষ্টি করে। সালাতে মানবদেহের প্রায় সবকয়টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়োজিত হয়। দিন-রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টায় পাঁচবারের সালাত আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণবয়স্ক সব মানুষের উপর ফরয করেছেন। এরই মাধ্যমে বান্দাহ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দুনিয়ার কোন ফিতনাই সে সম্পর্ককে দুর্বল বা ছিন্ন করতে পারে না। বান্দাহ্ তখন ভুলে যায় না যে, তার উপর আল্লাহ্‌র হক সর্বাগ্রে এবং তাঁর ফরমানসমূহ কাজে পরিণত করেই তাঁর সে অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম হতে পারে।

আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ দিনের সূচনা করে ফজরের সালাত আদায়ের মাধ্যমে। দাঁড়িয়ে রুকূ সিজদা দিয়ে তার হাম্‌দও সানা পাঠ করে প্রমাণ করে যে, সে একমাত্র আল্লাহ্‌র বান্দাহ্। তাঁর বন্দেগীতে তার হৃদয় যেন স্বচ্ছ ও পবিত্র রয়েছে। এভাবে সে সকল প্রকার পাপ থেকে দূরে থেকে সারাদিনব্যাপী কার্যকলাপের মধ্যে পবিত্র থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। অতঃপর সে তার নিরলস কর্মতৎপরতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। এই ক্ষেত্রে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ থাকার জন্য যে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক অবলম্বনের প্রয়োজন, তা-ই নামাযের মাধ্যমেই সে তা সংগ্রহ করে নেয়। তার কর্মব্যস্ততার মধ্যেই উপস্থিত হয় জোহরের সালাতের জন্য নির্দিষ্ট সময়। তারপরে আসরের সালাতের সময়ও তার কর্ম ব্যস্ততার একবিন্দুও ভাটা পড়ে না। মাগরিবের সালাতের

www.pathagar.com

মাধ্যমে তার দিনের অবিশ্রান্ত কর্মব্যস্ততার পরিসমাপ্তি ঘটে। সে যেমন ফজরের সালাতে আল্লাহ্‌র সমুখে উপস্থিত হয়েও তাঁর সাথেও গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে দিনের যাত্রা শুরু করেছিল, ইশা ও বিত্‌রের সালাতে হাযির হয়ে সে সর্বশেষবারের তরে প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ হিসাবে দিনের তৎপরতা শুরু করেছিল ও নানা ব্যস্ততায় ডুবে গিয়েছিল, এখনও সে সেই আল্লাহ্‌রই একনিষ্ঠ বান্দাহ্‌ই রয়েছে। সারাদিনে বিচিত্র ধরনের কর্মতৎপরতায় মশগুল হয়েও সে আল্লাহ্‌র বন্দেগীর সীমালংঘন করেনি।

সারাদিনের কোন মুহূর্তেও মহান আল্লাহ্‌কে ভুলে না যাওয়াই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বড় সুফল, মহামূল্য প্রাপ্তি। এরূপ অবস্থায় কোনরূপ অপরাধজনক কাজে অংশগ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। এই কারণে সালাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা হচ্ছে ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ –

নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে সর্বপ্রকারের নির্লজ্জ ও ঘৃণ্য কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে। —সূরা আনকাবুত ঃ ৪৫

নবী করীম (সা) একটি উদাহরণের মাধ্যমে সালাতের উক্ত শুভফলের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

তোমাদের কেউ যদি তার ঘরের সমুখে প্রবাহিত ঝর্ণায় প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করে, তা'হলে তার দেহে কোনরূপ মলিনতা অবশিষ্ট থাকবে বলে কি তোমরা ধারণা করতে পার ? সাহাবীগণ বললেন 'না'। তিনি বললেন ঃ

كَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسَ يَمْحُوْ اللّٰهَ بِهَا الْخَطَايَا

ঠিক এমনিভাবেই পাঁচ বারের সালাত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্‌র যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি নিশ্চিহ্ন করে দিতে থাকেন।

সালাত মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করা বাঞ্ছনীয়। সেখানে সে অন্যান্য মুসল্লী মুসলিম ভাইর সাথে সাক্ষাত লাভ করে। তারা একই কাতারে দাঁড়িয়ে একই ইমামের পিছনে ইক্‌তিদা করে আল্লাহ্‌র ইবাদাত সম্পন্ন করে এবং তারই সন্তুষ্টি লাভ করে। প্রত্যেকেই তার অপর ভাইয়ের হাল-অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অবহিত লাভ করে। নিয়মিত মসজিদে আসা কোন লোক কখনও অনুপস্থিত হলে তার বিষয়ে খবর জানার তাকিদ লোক অনুভব করে। এভাবেই মুসল্লীদের মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামষ্টিকতার উদ্রেক ঘটে। ফলে তারা সকলেই প্রত্যেকের পরিপূরক হয়ে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তাবোধ সহকারে জীবন যাপন করার সুযোগ পায়। এভাবে দৈহিক দিক দিয়ে পরস্পর নিকটস্থ লোকেরা অন্তরের দিক দিয়ে গভীরভাবে একাত্ম হয়ে

www.pathagar.com

উঠে। তারা সকলে একই ইমামের পিছনে একই কেবলামুখী হয়ে একই ইবাদাত পালন করে, একই আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করে ঐক্যবদ্ধ এক জনসমষ্টিতে পরিণত হয়। এভাবেই মুসলিম উম্মতের একত্ব গড়ে তোলা ও পরস্পরকে পরস্পরের ভাই বানিয়ে দেয়াই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও বাসনা। বলেছেন ঃ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ সব মু'মিনরাই পরস্পরের ভাই।

মুসলমান যখন একদিনের পাঁচবারের সালাতের মাধ্যমে অভিন্ন উম্মত হয়ে গড়ে উঠে, তখন তারা পবিত্র হৃদয়, নিষ্কলুষ পবিত্র মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। তখন প্রত্যেক মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে, যা সে পছন্দ করে নিজের জন্য। আল্লাহ্‌কে সে ভয় করতে থাকে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাই তার পক্ষে কোন অপরাধ করা সম্ভব হয় না। কেননা তার অকৃত্রিম বিশ্বাস রয়েছে, অপরাধ বা নাফরমানি করলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

২. সিয়াম (রোযা) ঃ রমযানের একমাসকালীন সিয়ামের প্রশিক্ষণমূলক অবদান অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও গভীর। সিয়াম মানব মনের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তির উপর শক্ত লাগাম লাগিয়ে দেয় এবং রোযাদারকে যাবতীয় নাফরমানীর কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে। অপরাধ যে ধরনের ও যে প্রকৃতিরই হোক, তা নফ্‌সের খাহেশ, কামনা, বাসনা, লোভ ও লালসা থেকেই উৎসারিত হয়। আর তার গোড়াতে তিনটি প্রবল শক্তি-উৎস নিহিত থাকে। প্রথম, লোভ-লালসার শক্তি ; দ্বিতীয় যৌন স্পৃহা ও কু-প্রবৃত্তি এবং তৃতীয় হচ্ছে অহমিকতা-দাম্ভীকতা বোধ। সিয়ামের প্রবল প্রশিক্ষণমূলক প্রভাব রয়েছে এই তিনটি শক্তি-উৎসের উপর।

আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র রিয্‌কসমূহ হালাল করেছেন এবং সকল প্রকার অপচয়-অপব্যবহারমুক্ত পানাহারকে মুবাহ ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ করেছেন ঃ

وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لاَ تُسْرِفُوْا اِنَّه لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ – قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِه وَ الطَّيِّبتِ مِنَ الرِّزْقِ – قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ –

.....আর খাও, পান কর, কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ্‌ তা'আলা সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। হে নবী, এই লোকদের বল, আল্লাহ্‌র সেসব সৌন্দর্য অলংকারকে হারাম করেছে, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য বের করে এনেছেন এবং আল্লাহ্‌র দেয়া পবিত্র জিনিসসমূহকে নিষিদ্ধ করেছে ? বল, এই সমস্ত জিনিস দুনিয়ার জীবনেও ঈমানদার লোকদের জন্যই বরং কিয়ামতের দিন তো একান্তভাবে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে।

—সূরা আ'রাফ ঃ ৩১-৩২

www.pathagar.com

মানুষ সাধারণত দিন-রাতে তিনবার পানাহারে অভ্যস্ত—সকাল, দুপুর এবং রাতে। আর যখনই পিপাসা লাগে পান করে এবং যখনই ইচ্ছা হয় পানাহার করে। কিন্তু রমযান মাসে এই পানাহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। ছুব্হে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তা সবই বন্ধ থাকে। এই সময় ক্ষুধা তাকে যন্ত্রণা দেয়, পিপাসা তার বক্ষদেশ জ্বালায়—যদিও তার সম্মুখে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু আহার্য সবই বর্তমান থাকে। আর তার জন্য আল্লাহ্ তা হালাল-ও করেছেন। কিন্তু সিয়ামের এই সময় সে সেইসব কিছু পান ও গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। তার অর্থ, যে আল্লাহ্ তার জন্য এ সব পানাহার হালাল করে দিয়েছেন, এই সময়টায় তারই আদেশে তা থেকে বিরত থেকে মানুষ এই কথাই প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে দেয় যে, সে আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া কিছু করে না। সে সেই কাজ করে এবং সেই সময় করে, যখন আল্লাহ্ যা করার অনুমতি দান করেন। বছরের বারোটি মাসের মধ্যে একটি মাসকাল ধরে যে নিজেকে এভাবে চালিত করতে অভ্যস্ত হয়, তার এ অভ্যাস দীর্ঘস্থায়ী বলে পরবর্তী এগারোটি মাস সে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ পানাহার ও ধন-মাল থেকে নিজেকে বিরত রাখতে খুবই সাফল্য সহকারে সক্ষম হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার জন্য বিয়ে ও স্ত্রী সঙ্গম হালাল করেছেন। বলেছেন ঃ

فَانْكِحُوْ مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

অতএব তোমরা স্ত্রীরূপে গ্রহণ কর, দু'জন তিন জন, চারজন যা তোমার ইচ্ছা। আর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারবে না বলে ভয় হলে মাত্র একজন।

—সূরা নিসা ঃ ৩

ফলে বান্দা দিনে-রাতে যখন ইচ্ছা স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করতে ও আসল ক্ষেতে বীজ বপন করতে পারে, কোন বাধা-নিষেধ নেই—কেবলমাত্র স্ত্রীর হায়েয অবস্থা ছাড়া। বলেছেন ঃ

نِسَاءُ كُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত সমতুল্য। অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে গমন কর যখন যেভাবে ইচ্ছা। —সূরা বাকারা ঃ ২২৩

কিন্তু রমযান মাসে এই মুসলিম ব্যক্তির জীবনে এই অবাধ স্বাধীনতা সীমিত হয়ে আসে। তখন এই কাজ কেবলমাত্র রাত্রিকালেই সম্পন্ন হতে পারে ; দিনের বেলা নয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ – هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ – عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ – فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ –

www.pathagar.com

রমযানের রাত্রিকালে তোমাদের স্ত্রীদের সহিত যৌন মিলন হালাল ও সঙ্গত ঘোষণা করা হয়েছে। ওরা তোমাদের পোশাক, তোমরা ওদের পোশাক। আল্লাহ্ জানতে পেরেছেন, তোমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস রক্ষা করতে অসমর্থ হচ্ছ। এই কারণে আল্লাহ্ তোমাদের তওবা কবুল করেছেন, ক্ষমা করে দিয়েছেন ইতিপূর্বের ভুল-ত্রুটি। এক্ষণে তোমরা তাদের সহিত (রাত্রিকালে) সঙ্গম করতে পার এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্ যা লিখে দিয়েছেন তার সন্ধান করতে পার।

—সূরা বাকারা ঃ ১৮৭

রোযাদার মুসলিম একমাসকাল ধরে দিনের বেলা স্বীয় যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকতে যখন সক্ষম হচ্ছে, অথচ স্ত্রীসঙ্গম তার জন্য সম্পূর্ণ হালাল—তখন স্বভাবতই আশা করা যায় যে, বছরের পরবর্তী মাসগুলিতে নিষিদ্ধ যৌন সঙ্গম থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে অতীব যোগ্যতা সহকারে।

সিয়াম মুসলিমকে অশ্লীল, বাজে ও অর্থহীন কথাবার্তা বলা থেকেও বিরত রাখে। এই কাজ মুসলিম ব্যক্তির জন্য সাধারণভাবেও হারাম বটে ; কিন্তু রমযান মাসে এইগুলির হারাম তো আরও তীব্র ও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَ الْعَمَلَ بِه فَلَيْسَ اللهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعْ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ –

যে লোক মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আমল ত্যাগ করল না, তার খাদ্য-পানীয় পরিত্যাগ করে চলায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। —বুখারী, মুসলিম

অপর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

كَمْ مَنْ صَائِمٍ لَيْسَ مِنْ صِيَامِهِ اِلاَّ الْجُوْعُ وَ الْعَطْشُ –

বেশ সংখ্যক রোযাদার এমন হয়ে থাকে, যাদের রোযায় ক্ষুধা, পিপাসার কষ্ট সহ্য করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। —বুখারী, মুসলিম

কুরআনে যদিও অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সকলকেই দেওয়া হয়েছে—যেমন বলা হয়েছে ঃ جَزٰؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا 'অন্যায়ের প্রতিফল অনুরূপ অন্যায়ই হয়।' কিন্তু রোযাদারকে এক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হয়। কারুর পক্ষ থেকে অন্যায় হলেই সেও তার জওয়াবে অন্যায় করবে এইরূপ স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হয়নি। কেউ তাকে গাল-মন্দ বললে সেও অনুরূপ গাল-মন্দ তাকে শুনিয়ে দেবে, তা রোযাদারের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। এরূপ অবস্থা দেখা দিলে সিয়ামই তাকে ঢাল স্বরূপ আড়াল করে রাখবে। হাদীসে এই কথাই বলা হয়েছে এই ভাষায় ঃ

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَرْفَثْ وَ لاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرَؤٌ صَائِمٌ –

www.pathagar.com

সওম (রোযা) ঢাল বিশেষ। রোযার দিনে কারুরই স্ত্রীসঙ্গম করা উচিত নয়, উচিত নয় হল্লা চিৎকার ও গোলমাল করা। কেউ যদি তাকে গাল-মন্দ বলে বা তার সহিত মারামারি করতে আসে, তা হলে তার বলা উচিত ঃ আমি একজন রোযাদার ব্যক্তি। —বুখারী, মুসলিম

এভাবে একজন লোক যদি সারা মাস ধরে ক্রোধ-আক্রোশ এড়িয়ে চলার অভ্যাস করে, অন্যদের উপর বাড়াবাড়ি করা থেকেও বিরত থাকে, তা হলে পরবর্তী এগারো মাসকাল এই অভ্যাসের শক্তি দিয়ে সকল প্রকার অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে ওসব এড়িয়ে চলতে সক্ষম হবে—এটাই তো আশা করা যায়।

মানুষের উপর সর্বাধিক প্রভাব ও কর্তৃত্ব খাটায় মানুষের ইচ্ছাশক্তি। সেই ইচ্ছাশক্তিই যদি একমাসকাল ধরে উক্তরূপ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়,তাহলে সে তার ঈমানী শক্তিকে প্রবল ও অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির উপর বিজয়ী করে ও তাকে শরীয়তের বিধানের আওতায় নিয়ন্ত্রিত রাখতে সক্ষম হবে। এই উদ্দেশ্যেই রোযার এই সুমহান ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়তে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. যাকাত ঃ যাকাত মুসলিম ব্যক্তির সামষ্টিক-অর্থনৈতিক ইবাদত। লোভ-লালসা, কার্পণ্য, সংকীর্ণতা, হিংসা, দ্বেষ, ধন-সম্পদের প্রেম-মায়া ইত্যাদি থেকে মানব মনকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে এই যাকাত। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِه فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ –

যেসব লোক তাদের মধ্যকার কৃপণতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে, তারাই সফলকাম। —সূরা তাগাবুন ঃ ১৬

বহুলোক শুধু ধন-মালের লোভে পারস্পরিক শত্রুতায় লিপ্ত হয়। একদল অন্য দলের ধন-সম্পদ কেড়ে নেয় শুধু এই জন্য যে, ওদের আছে, আর এদের নেই। মানুষকে 'আছে ও নেই' এই দুই ভাগে বিভক্ত করে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যাকাত এইসব বিপদ-আপদকে দূর থেকেই প্রতিরোধ করে। যে মুসলিম যথারীতি যাকাত আদায় করে এবং এই যাকাতের সাহায্যে দারিদ্র্য পীড়িত জনগণকে দারিদ্র্য ও অভাবমুক্ত করেছে, সে কখনও অন্য লোকের ধন-মালকে কোনরূপ মূল্য বা বিনিময় না দিয়ে হরণ করতে পারে না। লোভ-লালসাও কখনও তাকে অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করবে না।

দরিদ্র ব্যক্তি যদি শান্তিপূর্ণভাবে ও সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে ধন-সম্পদ থেকে নিজের ন্যায্য অংশ লাভ করে, তখন তার মনে কোন হিংসা-দ্বেষ থাকতে পারে না। 'আছে' ও 'নাই'র মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঠিক তখনই সংঘটিত হয়েছে, যখন 'আছে'রা সব ধন-সম্পদ আঁকড়ে ধরে আছে। 'নাই'দের এক পয়সা দিতেও প্রস্তুত হয় না। এরূপ অবস্থায় 'আছে' ও 'নাই'র মধ্যে সর্বাত্মক ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সৃষ্টি হওয়া

www.pathagar.com

অপরিহার্য হয়ে উঠে। যাকাত এই ভুল বিভক্তিকে যেমন মিথ্যা করে দেয়, তেমনি তা ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার দূরত্ব ও বিভেদ-পার্থক্য চিরতরে খতম করে পরস্পর ভাই ভাই বানিয়ে দেয়। দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের অভাব মোচন করে সচ্ছলতার দিকে যাওয়ার অবাধ সুযোগ করে দেয়। এইরূপ সমাজেই মানুষ পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার বন্ধনে বন্দী হতে পারে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا –

তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর। তাছাড়া তুমি তাদের পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ কর। —সূরা তাওবা ঃ ১০৩

বস্তুত যাকাতের যে সামষ্টিক ভূমিকা রয়েছে, তাতে দারিদ্র্যের প্রতিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত মানুষের মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে গিয়ে তারা সচ্ছলতার দিক দিয়ে অতি নিকটে এসে যায়। ফলে কোন শ্রেণী পার্থক্য থাকে না যেমন, তেমনি লোকদের অন্তরে নিহিত হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা দূরীভূত হয়। তার দরুণ শ্রেণী-সংগ্রামের আগুন কখনই জ্বলে উঠে না। মানুষ পরস্পরের ভাই হয়ে পরম একাত্মতার মধ্যে জীবন যাপন করার সুযোগ পায়। সমাজের অভাবগ্রস্ত দরিদ্র লোকদের অভাব মোচনের লক্ষ্যে নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর হয়। যাকাতের বণ্টন খাতসমূহ দেখলেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِيْنِ وَ الْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَ ابْنُ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ – وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ –

যাকাতের সম্পদ ফকীর, মিসকীন, সেই কাজে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের মন রক্ষার প্রয়োজন, যারা দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্‌র পথে এবং নিঃস্ব পথিকের জন্য—আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্য। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সুবিজ্ঞানী। —সূরা তাওবা ঃ ৬০

বস্তুত ধনীদের ধন-মালে গরীব-মিসকীনদের হক রয়েছে। এই চেতনাই সামষ্টিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণের প্রাণ-শক্তি। এই চেতনা মুসলমানদের শোষণ-পীড়ন ও যুলুম-সীমালংঘনের জ্বালায় জর্জরিতকরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ফলে ইসলামী সমাজে এই ধরনের কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

৪. হজ্জ ঃ হজ্জ মুসলিম ব্যক্তির দেহ-আত্মা-হৃদয়-মন সহকারে আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে এক মহাযাত্রা। তথায় সে আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ করে, সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে 'সায়ী' করে, মিনা ও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান গ্রহণ করে। পালন করে অন্যান্য যাবতীয় জরুরী অনুষ্ঠানাদি।

www.pathagar.com

হজ্জের ক্ষেত্রে প্রত্যেক এলাকার হজ্জযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট 'মীকাত' থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়। তখন সে তার মন ও দেহ—দেহ ও মন উভয়কেই সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করে নেয়, পবিত্র থাকে তার পরনের দীনাতিদীন ব্যক্তির উপযোগী পোশাক। এভাবে হজ্জ পালন করে সে গুনাহ্ মুক্ত হয়, নিষ্পাপ হয়ে যায় মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিসাৎ হওয়ার দিনের মতই।

হজ্জের সমগ্র সফরে 'তাল্‌বিয়া'—লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা—পাঠ করতে হয়। তা পাঠ করে হজ্জযাত্রী ঘোষণা করে, 'হে রব ! আমি তোমার ডাকে হাজির হয়েছি। আমি তোমার নিকটে হাজির হয়ে আছি।'[১]

বস্তুত হজ্জ এক সাথে বিপুল সংখ্যক ইবাদতের সমন্বয়। হাজী যখন বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করে, তখন তার দিল সালাতের সেই কিবলার সাথে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত হয়ে যায়, যে দিকে মুখ করে সে নিজের ঘরে থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। কা'বার তওয়াফকারী সব মানুষ যদিও বিভিন্ন দেশের, বর্ণের, আকার-আকৃতির, পোশাক-পরিচ্ছদের, তবুও তারা এক ও অভিন্ন এই দিক দিয়ে যে, তারা সকলে এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার এবং এক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই তাদের প্রত্যেকেরই এবং সকলেরই চরমতম লক্ষ্য। এ কারণে তারা এক ও সম্পূর্ণ একাত্ম। এই গোটা অনুষ্ঠানই আর একটা বিরাট ঐতিহাসিক ও দৃষ্টান্তহীন আত্মদানের মর্মস্পর্শী দৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ফলে তাদের অন্তর গভীরভাবে ভারাক্রান্ত ও অবনত হয়ে উঠে মহান আল্লাহ্‌র অসীম অনুকম্পায়। আরাফাতের বিশাল ময়দানে প্রায় একটি দিন সে অতিবাহিত করে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি ও দোয়া-প্রার্থনা করে। দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে সম্প্রসারিত করে আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত রহমত কামনা করে। অন্তর দিয়ে স্মরণ করে সেই দিনের কথা ঃ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَه اَمَدًا بَعِيْدًا –

যেদিন প্রত্যেকটি মানুষ তার কৃত ভালো কাজের সুফল সম্মুখে উপস্থিত পাবে। আর যে খারাপ কাজ সে করেছে, সে বিষয়ে তার মনে এই কামনা জাগবে যে, কতই ভালো হতো যদি তার সাথে সে জিনিসের অনেক বেশি দূরত্ব হতো।

—সূরা আল-ইমরান ঃ ৩০

হাজী হজ্জ করে এই আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করে এবং সেই পাথেয় নিয়ে সে নিজের দেশে ফিরে আসে। এই শক্তিই তার পরবর্তী সমগ্র জীবনে সর্বপ্রকারের পাপ ও অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য ঢালের কাজ করে।

---

১. বখারী- মসলিম।

www.pathagar.com

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَ لَدَتْهُ اُمُّهُ –

যে হজ্জ করল এবং তাতে সে স্ত্রী সঙ্গম করল না, কোনরূপ পাপের কাজও করল না, সে ফিরে এল মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়ে। —বুখারী, মুসলিম

ঈমানভিত্তিক ইবাদত

অপরাধ প্রতিরোধে ইবাদতের যে ভূমিকার বিবরণ উপরে প্রদত্ত হয়েছে, তার মূল ভিত্তি হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান। এই ঈমানই এসব ইবাদত ফরয করেছে। আর ঈমানের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে তা মানুষের মন-মানসিকতা সংশোধন ও সুসংবদ্ধকরণের সুদৃঢ় স্তম্ভ। মানুষের আচার-আচরণকে সুদৃঢ় ও সুশোভন করে গড়ে তোলে এই ঈমান। মানুষের জীবন্ত মনকে লালন করে এই ঈমান। এই ঈমানই হচ্ছে মানুষের মান-মর্যাদা সংরক্ষণে অতন্দ্র প্রহরী। ঈমান ছাড়া অপর কোন জিনিস—কোন প্রক্রিয়াই এই কাজ করতে পারে না।

তা সত্ত্বেও ঈমানদার লোকদের সমাজে অপরাধ প্রবণতার এত ব্যাপক বিস্তৃতি কেন, তা একটা প্রবল জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই লোকেরা ইবাদতের প্রায় সব অনুষ্ঠানই পালন করে থাকে। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাব, ইবাদত তো হচ্ছে, কিন্তু তা ইবাদতের প্রকৃত প্রাণশক্তি শূন্য। আল্লাহ্‌র যতটুকু ভয় মানব মনে জাগ্রত থাকলে সেই প্রাণশক্তি লাভ করা সম্ভব, তার অভাব অত্যন্ত প্রকট। সেই সাথে জাতীয় জীবনে অন্ধ অনুসরণের যে ব্যাপক অভ্যাস, তা-ও উক্তরূপ প্রাণশক্তির পরিপন্থী। বস্তুত মুসলিমের ইবাদতের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়া। এ জিনিস প্রবল থাকলেই ঈমানের কথিত কার্যকরতা অবশ্যই লক্ষণীয় হবে।

ঈমান মানুষের জীবনে তার বাঞ্ছিত সুফল দিতে পারে, যদি তাতে নির্ভুল আকিদা ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে এবং কথার সহিত কাজের পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। যেসব লোক মুখে ঈমান প্রকাশ করে, কিন্তু সেই ঈমানের সাথে অন্তরের গভীর সম্পর্ক ও সাযুজ্য নেই, এই কারণে তা নিতান্তই দেখানোপনা বা প্রতারণায় পরিণত হয়। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ – يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ مَا يَخْدَعُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ –

এমন লোকও রয়েছে যারা মুখে বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন গণ্য হওয়ার অধিকারী নয়। তারা আল্লাহ্ ও ঈমানদার লোকদের ধোঁকা দিচ্ছে। কিন্তু আসলে সে ধোঁকাটি তাদের উপরই প্রতিফলিত হয়—যদিও তারা তা বুঝে উঠতে পারে না। —সূরা বাকারা ঃ ৮-৯

www.pathagar.com

আরো বলেছেন ঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلوةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَ لاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً –

মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সহিত ধোঁকাবাজি করে ; কিন্তু আসলে এই ধোঁকা তাদের নিজেদেরই উপর পড়ে। তারা যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় নিতান্তই অনিচ্ছুকভাবে। তারা লোকদের দেখায় যে, তারা সালাত আদায় করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কে তারা খুব কম-ই স্মরণ করে। —সূরা নিসা ঃ ১৪২

অনুরূপভাবে এমন লোকও রয়েছে যারা প্রকৃত সত্যকে চিনে ; কিন্তু সে সত্য ও সে সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ ঈমানের মাঝে তাদের অহংকারই বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

وَ إِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ

একদল লোক প্রকৃত সত্যকে গোপন করে রাখতে চায়, অথচ সে সত্যকে তারা জানে। —সূরা বাকারা ঃ ১৪৬

প্রকৃত ঈমান হচ্ছে সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করা, মুখে সে সত্যকে স্বীকার করা এবং সে সত্য অনুযায়ী কাজ করা। সত্য বলে বিশ্বাস করা আল্লাহ্‌কে রাসূলকে এবং পরকালকে, তাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ না থাকা। তা'হলেই সে ঈমানের মিষ্টতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। আর তা না করা পর্যন্ত সে কিছুতেই শান্ত ও আশ্বস্ত হতে পারে না।

কথা মুখে জিহ্বার সাহায্যে উচ্চারিত হয়। অন্তরের স্থিত ও সুদৃঢ় বিশ্বাস ভাষার পোশাকে প্রকাশিত হয়। তা মুসলিম ব্যক্তির প্রতি রক্তবিন্দুর সহিত মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে। তার আচার-আচরণ ও কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়েই তা প্রতিফলিত হয়। আর আমল উৎসারিত হয় সত্যিকার ঈমানের বাস্তব ফলস্বরূপ। তাতে কল্যাণের দিকে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। আল্লাহ্‌র প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস সহকারেই শরীয়ত পালন ও অনুসরণ করা হয়। তখন ঈমান জীবন্ত ও বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। এই ঈমানেরই দাবি হচ্ছে, ইসলামকে বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষভাবে জিহাদ করা। চূড়ান্ত মাত্রার ত্যাগ স্বীকার করা।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ – أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ

প্রকৃত মু'মিন সেসব লোক' যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের প্রতি। পরে তারা কখনই সন্দেহের আবর্তে নিমজ্জিত হয়নি। তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে তাদের ধন-মাল দিয়ে ও তাঁদের জান-প্রাণ দিয়ে। বস্তুত তারাই সত্যিকার ঈমানদার। —সূরা হুজুরাত ঃ ১৫

www.pathagar.com

এই ঈমানই মানুষকে এক নবতর সৃষ্টি বানিয়ে দেয়। এ ঈমান প্রথমে অন্তরের গভীর সূক্ষ্ম পরতে দানা বাঁধে। পরে বাহ্যিকভাবে সত্যিকার মু'মিনের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তারই আনুগত্য করে। তখন তার যাবতীয় তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচারিত হয় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে।

فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْ فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

তোমার খোদার কসম, 'লোকেরা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার হতে পারবে কেবল তখন, যখন তারা তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে তোমাকেই বিচারক ও মীমাংসাকারী— বিধানদাতারূপে গ্রহণ করতে পারবে এবং তোমার বিচার ফয়সালার প্রতি তাদের মনে একবিন্দু কুণ্ঠা বা দ্বিধা জেগে উঠবে না, বরং পুরাপুরিভাবেই মেনে নেবে।

—সূরা নিসা ঃ ৬৫

অতএব আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ অমান্য করার কোন ইখ্‌তিয়ার থাকতে পারে না কোন ঈমানদার মানুষের।

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُه اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যখন লোকদের কোন বিষয়ে ফয়সালা করে ফেলেন, তখন তা মেনে নেওয়া ও না-মেনে নেওয়ার কোন ইখ্‌তিয়ারই থাকতে পারে না।

—সূরা আহযাব ঃ ৩৬

এইরূপ ঈমানই মানুষের জীবন ও বাহ্যিক আচার-আচরণকেও সুন্দর করে গড়ে তোলে, সুষ্ঠু ও সুপরিচ্ছন্ন করে। সুবিচার ও ন্যায়পরতার মৌল নিয়ম ও বিধান কার্যকর হয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করে। অরাজকতা, বিপর্যয়, অশান্তি ও অনিষ্ট সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়। পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা, সহৃদয়তা ও সহানুভূতির বন্ধনে ঈমানদার লোকদের জড়িত করে। এ বন্ধনের কোন বিকল্প নেই। ভাষা, বর্ণ, শ্রেণী জাতীয়তা, সম-স্বার্থ ইত্যাদি কোন একটি ভিত্তিও মানুষকে অতটা ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না, যতটা পারে এই ঈমান। এই ঈমান যে জনসমষ্টির নিকট প্রাধান্য পাবে, তথায় অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে ব্যক্তির মানসিক প্রশান্তির সাথে সাথে সামষ্টিক জীবনেও পরিপূর্ণ শান্তি ও স্বস্তি বাস্তবায়িত হবে। আর কোন জনসমষ্টি যদি এই ঈমান হারিয়ে ফেলে তাহলে তথায় ব্যাপক বিপর্যয়, মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় এবং মারাত্মক ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা-অরাজকতা দেখা দেওয়া অবধারিত। আর আজকের দিনের এটাই হচ্ছে রূঢ় বাস্তবতা।

বর্তমানে সভ্যতা বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব ও ফুলে-ফলে সুশোভিত জীবন-যাত্রার উচ্চতর মান এবং বৈষয়িক ও বস্তুগত উন্নতির সর্বোচ্চতা মানুষের করায়ত্ত।

www.pathagar.com

কিন্তু চরম অনিশ্চয়তার প্রচণ্ডতা, অপরাধের হতাশাগ্রস্ততা ও ভয়-ভীতির ব্যাপকতা বর্তমানে গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে। যা পূর্বে কোন দিনই দেখা যায়নি।

সন্দেহ নেই, মনুষ্য সভ্যতা দ্রুত সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রকৃতি বিজ্ঞান, বাস্তব পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যা অভূতপূর্ব উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করেছে। কিন্তু এই উন্নতি ও অগ্রগতি মানবজীবনের মৌলিক সমস্যাসমূহের সমাধানে—মানুষকে এক বিন্দু শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ প্রদানে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

একালের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত এবং বিশাল। মানবীয় বিবর্তন ও প্রগতির সকল পর্যায় ও স্তরই এক্ষণে তার আওতাভুক্ত। প্রত্যেক স্তরের মনস্তাত্ত্বিক কারণ সমূহও আজ আলোচিত। এর প্রতিটি শাখা এক্ষণে এক-একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানে পরিণত। যথা শিশু মনস্তত্ত্ব, কিশোর মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা মনস্তত্ত্ব, অপরাধ সংক্রান্ত মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি। এছাড়া পরিবেশ, উত্তরাধিকার, অনুকরণপ্রিয়তা এবং পরিবার, সমাজ, গ্রাম, শহর, মরুভূমি ইত্যাদি পর্যায়ে জ্ঞান-গবেষণার গভীরতা ও ব্যাপকতা আজ বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু এসব অধ্যয়ন অন্যায় ও দুষ্কৃতি দমনে মানুষের সম্মুখে কোন সফল পরিকল্পনা বা কর্মকাণ্ডের কোন সুস্পষ্ট রূপরেখা উপস্থাপিত করতে পারেনি। সক্ষম হয়নি অপরাধকে মূলোৎপাটিত করতে। বরং বিশ্বের চতুর্দিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে শুধু অশান্তি-অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে। বিপর্যয় ক্রমবৃদ্ধিমান, আইন লংঘনের ধারা তীব্র গতিতে অগ্রসর। রাষ্ট্র সরকারসমূহ কোন কোন অপরাধ দমনে রূঢ় ও প্রচণ্ড কার্যক্রম গ্রহণ করেও—আর্থিক পাইকারী জরিমানা এবং গ্রেফতার, কারারুদ্ধকরণ ইত্যাদির আশ্রয় নিয়েও চলমান ঘটনাবলীর উপর একবিন্দু সীমারেখা টানতেও সক্ষম হচ্ছে না, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতাই শুধু কুড়াচ্ছে।

বর্তমান সময় মানবীয় সভ্যতা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উড্ডীন। এই সময়ও বিশ্বমানবতার এই চরম দুরবস্থা ও ব্যর্থতার সঠিক কারণ আঁচ করতে পারছে না কোন ক্রমেই। মানব মনের গভীর গহনে যে সূক্ষ্ম রোগজীবাণু তাকে তিলে তিলে কুরে কুরে খাচ্ছে, তাকে আয়ত্ত করতে সম্পূর্ণ অক্ষমই থেকে যাচ্ছে।

বস্তুত মানুষের মনই হচ্ছে মানব প্রকৃতি এবং ভালো—সত্য ও কল্যাণ প্রীতির মাঝখানে ভারসাম্য রক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। জীবনের কোন বাস্তব ক্ষেত্রে একবিন্দু পরিবর্তন আনতে হলে সেজন্য সর্বাগ্রে পরিবর্তন সূচিত করতে হবে মানুষের মনে, এই কথা আধুনিক বস্তু-বিজ্ঞানে পারদর্শী জগতের সুধীজনগণ আদৌ উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। এরা অন্যায় ও দুষ্কৃতি দমনে শরনিক্ষেপ করে সম্পূর্ণ ভুল লক্ষ্যে। ফলে সব চেষ্টা-প্রচেষ্টাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায় অতীব বাস্তব কারণে। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ চিন্তা-বিবেচনা গবেষণা মানব মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থানে পৌঁছেতে পারছে না। মানুষের অন্তরকে এসব অন্যায়, বিপর্যয় ও দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে সজাগ ও সক্রিয় করে তুলতে সক্ষম হচ্ছে না। মানুষের হৃদয় মনকে সেসব থেকে রক্ষা করার অতন্দ্র প্রহরী

www.pathagar.com

বানাতে পারছে না। ফলে অন্যায়, দুষ্কৃতি ও অরাজকতা বন্ধ করতেও সক্ষম হতে পারছে না। মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার ইতিহাসে মানুষের জীবনের কোন ক্ষেত্রেই বোধ হয় এতটা ব্যর্থতা কুড়াতে হয়নি, যতটা ব্যর্থতা কুড়াতে হয়েছে এই ক্ষেত্রে। সভ্যতা সংস্কৃতির সব উন্নতি উৎকর্ষ আজ ম্লান হয়ে গেছে এই ব্যর্থতার কারণে।

মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, এটা মানব প্রকৃতি নিহিত এক মহাসত্য। মানুষ লক্ষ্য করে যে, তার কর্মতৎপরতাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তারই মত কিছু সংখ্যক লোক প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে, কৌশলের পর কৌশল আঁটছে, আইনের পর আইন রচনা করে চলেছে, অথচ সে-ও তাদেরই মত মানুষ। সে কেন মানুষের মনগড়া কৌশল জালে পা জড়িয়ে নিজেকে বন্দী করবে, সে কেন অনুগত হবে তারই মত মানুষের মনগড়া সব আইন-বিধানের ? এটা মানুষের গভীর প্রকৃতিতে নিহিত মনস্তত্ত্ব। একটা মৌলিক প্রশ্ন। আধুনিক কালের আইন-দার্শনিক, আইন ও মনস্তত্ত্ব বিশারদদের নিকট এই মনস্তত্ত্বের কোন ইতিবাচক বিশ্লেষণ আছে কি ? পারেন কি এই প্রশ্নের সঠিক ও সান্ত্বনাদায়ক কোন জওয়াব দিতে ?

মানুষকে কোন বৈষয়িক বঞ্চনা বা বৈষয়িক শাস্তির ভয় কি মানুষকে মানুষের রচিত আইন ও কলাকৌশল লংঘন করা থেকে বিরত রাখতে পারে ?

মানুষ মানুষের রচিত আইন-কানুন ও কলা-কৌশল লংঘন করবে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই, আইনের প্রহরী ও শান্তি নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের চোখে ধূলি দিয়ে তাদের অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে আইনের গোটা প্রাসাদের ইট এক একখানা খুলে ফেলবে, তা ঠেকাবার সাধ্য কারুর আছে কি ?

মানব রচিত আইন-বিধান ভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা ঠিক এই কারণেই সম্পূর্ণ অকেজো ও অচল প্রমাণিত হয়েছে। অদৃশ্যের পর্দা উন্মোচন করা এবং লোকচক্ষুর আড়ালে নিত্য সংঘটিত অপরাধসমূহ প্রতিরোধ বা দমন করা একালের প্রচলিত প্রশাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

পরকালীন জীবনের সমগ্র ব্যাপারও এই প্রশাসন কর্তৃপক্ষের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থিত। সেখানে কোন অপরাধীকে ধরা ও তার জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা যেমন তার সাধ্যায়ত্ত নয়, তেমনি সেই ভয় দেখিয়ে অথবা পরকালীন কোন সওয়াবের আশ্বাস দিয়েও কাউকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তার অধিকারও কারুর নেই।

কিন্তু আসমানী আইন-বিধান—মানুষের জন্য মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ আইন-বিধানের ব্যাপারটি এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সমস্ত মানুষই জানে, বুঝে ও বিশ্বাস করে যে, সে আইন একান্তভাবে আল্লাহ্‌র রচিত। আর আল্লাহ্ সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ। তাঁর কর্তৃত্ব কেবল ইহজীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত নয়, পরকালীন জীবনে সর্বাত্মক কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই। এই দুনিয়ার জীবনে কোন অপরাধের শাস্তিকে ফাঁকি দিয়ে

www.pathagar.com

তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলেও পরকালীন জীবনে তাঁর কর্তৃত্বের আওতার বাইরে যাওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া ইহজীবনে ইসলামী প্রশাসনিক আইন লংঘন করলে পরকালীন জীবনে তাকে আরও কঠিন শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। ফলে আইন ফাঁকি দেওয়া বা প্রশাসনের অগোচরে আইন লংঘনের কোন প্রবণতা মানব মনে বাসা বাঁধতে পারে না। এটা যদিও বিশ্বাসের ব্যাপার, কিন্তু এই বিশ্বাস যে মানুষের জন্মগত ও মজ্জাগত, তাই এর কার্যকরতা আমোঘ ও অবশ্যম্ভাবী।

ইসলাম এই বিশ্বাস ও ভাবনা-চিন্তা দিয়েই মানুষের মনকে লালন করে। বানিয়ে তোলে অকৃত্রিম বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসী মনের তাকীদে মানুষের গোটা কর্মজীবন যখন গড়ে উঠে, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করতে হয় যে, এই মন কখনই বিদ্রোহী হবে না, আইন লংঘনে উদ্যত হবে না।

ঠিক এই কারণে ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষকে গায়বের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী বানাতে সচেষ্ট হয়। ইসলামের আহ্বান হচ্ছে ঃ

اَنْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ كُتُبه وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الاخِرِ و بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ

তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর নাযিল করা কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ, পরকালীন জীবন এবং তকদীরের ভালো-মন্দ আল্লাহ্ থেকে নির্ধারিত হওয়াকে। —বুখারী

অতএব কেবলমাত্র বাহ্যিকভাবেই কুরআন ও সুন্নাহর আইন অনুসৃত ও পালিত হয় না, তার পূর্বে মনের নিভৃত গহনে তার প্রতি জাগে অকৃত্রিম বিশ্বাস ও সুদৃঢ় ঈমান। এই ঈমানই মানবমনকে করে গভীরভাবে প্রশান্ত, আশ্বস্ত ও দৃঢ় নিশ্চিত। সে আইনের অনুসরণ ও পালন করে মনের দৃঢ় প্রত্যয় দিয়ে, অন্তরের সুষমামণ্ডিত ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে। কেননা আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। বৈষয়িক জীবনে শাস্তি এড়াতে পারলেও পরকালীন জীবনে তা সম্ভব হবে না বলে এই জীবনেই অপরাধের দণ্ড গ্রহণ করে দোষমুক্ত হওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয় হয়ে দাঁড়ায় প্রত্যেকটি ঈমানদার ব্যক্তির নিকট।

আল্লাহ্ই মানুষের স্রষ্টা। তাই তিনি মানুষের মনস্তত্ত্ব, মন-মানসিকতার আবর্তন-পরিবর্তন, স্থিতি-অস্থিরতা সব কিছুই প্রত্যক্ষভাবে জানেন। তাঁর এই যথার্থ পরিচিতিই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ্র সমস্ত আইন পালন করতে, তাঁর আইন পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের সৌভাগ্যে নিজেকে ভাগ্যবান বানাতে চেষ্টা করে। তাই আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اَنْشَاَكُمْ مِنَ الاَرْضِ وَ اِذَا اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِى بُطُوْنِ اُمَّـاتِكُمْ فَلاَ تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ط هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى

www.pathagar.com

আল্লাহ্ যখন তোমাদের উন্মেষ ঘটাচ্ছিলেন মাটির মৌল উপাদান থেকে এবং তোমরা যখন তোমাদের মায়েদের গর্ভে ভ্রূণ আকারে ছিলে, তখনও তিনি তোমাদের জানতেন। অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্র-পরিশুদ্ধ মনে করার অহমিকায় পড়বে না। প্রকৃতপক্ষে কে আল্লাহ্কে ভয় করার নীতি অবলম্বন করেছে, সে বিষয়ে তিনি সবচাইতে অধিক অবহিত। —সূরা নাজম ঃ ৩২

বস্তুত স্রষ্টা সৃষ্টিকুলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হবেন—এটাই তো স্বাভাবিক ঃ

اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

জেনে রাখ, যিনি স্রষ্টা তিনি জানেন। তিনি তো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানী এবং সর্ববিষয়ে অবহিত। —সূরা মুলক ঃ ১৪

তাঁর নিকট গোপন ও প্রকাশ্য কোনই পার্থক্য নেই। সব সমান—একাকার ঃ

يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ط وَ اللهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

আস্মানসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই তিনি বুঝেন, তিনি সেসব কিছুই জানেন, যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। বস্তুত আল্লাহ্ তো মানুষের গোপন হৃদয়ে নিহিত সব তত্ত্ব ও তথ্যই জানেন খুব ভালোভাবে।
—সূরা তাগাবুন ঃ ৪

মানুষের মনস্তত্ত্ব মনের পটে আবর্তিত ভাবধারা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যা বাস্তবায়িত হয় তা-ও আল্লাহ্রই জ্ঞানের আওতাভুক্ত। কিছুই তার অজানা নেই ঃ

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

সন্দেহ নেই, মানুষকে আমরাই সৃষ্টি করেছি এবং তার মনে যেসব খারাপ চিন্তা-ভাবনা জাগে তা আমরা জানি। আসলে আমরা তার বক্ষশিরা অপেক্ষাও অতি নিকটে।
—সূরা কাফ ঃ ১৬

বান্দার যাবতীয় কার্য—ছোট বা বড়—সংরক্ষিত, রেকর্ডকৃত, লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। কোন কিছুই হারিয়ে যায় না, মুছে যায় না।

وَ كُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ وَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَّ كَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ

তারা যা কিছুই করেছে কিতাবে সংরক্ষিত, ছোট বড় সবই লিপিবদ্ধ।
—সূরা কামার ঃ ৫২-৫৩

প্রকৃত ঈমানদার লোকদের বিশেষত্ব হচ্ছে, তারা আল্লাহ্র নিকট আনত, চির অবনত। না-দেখেই তারা ভয় করে সেই মহান আল্লাহ্কে ঃ

www.pathagar.com

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ

যে ভয় করেছে আল্লাহ্‌কে এবং অবনত একনিষ্ঠ মন নিয়ে হাজির হয়েছে .....

—সূরা কাফ ঃ ৩৩

এসব কারণে ইসলামী শরীয়তের আইন বিধানে প্রত্যেকটি কাজের বৈষয়িক প্রতিফলের সাথে পরকালীন প্রতিফলকেও যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যেন কেউ যদি ইহকালীন শাস্তি থেকে কোনভাবে এড়িয়েও যায়, তবু পরকালীন শাস্তি এড়ানো কারোর পক্ষেই এবং কোনক্রমেই সম্ভব হবে না।

হত্যা, আল্লাহ্‌ ওর মূলের সহিত শত্রুতা বা যুদ্ধ, শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা, চুরি, ডাকাতি, সুদ খাওয়া, সুদী কারবার করা, ইসলামী যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া—প্রভৃতি প্রত্যেকটি অপরাধের বৈষয়িক শাস্তির সাথে সাথে পরকালীন শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে প্রমাণ বলিষ্ঠভাবে।

হত্যা কাণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَ مَن يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُه جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَه وَ اَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيْمًا

যে লোক কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে সংকল্প করে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, তথায় সে চিরদিনই থাকবে। আল্লাহ্‌র ক্রোধ তার উপর পড়বে, আল্লাহ্‌ তার উপর অভিশাপ দিয়েছেন এবং তার জন্য খুব বড় আযাব নির্দিষ্ট ও প্রস্তুত করে রেখেছেন। —সূরা নিসা ঃ ৯৩

আল্লাহ্‌-রাসূলের সহিত শত্রুতা, যুদ্ধ ও শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধ পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه وَ يَسْعَوْنَ فِيْ الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

যেসব লোক আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের সহিত শত্রুতা ও যুদ্ধ করে এবং দেশের মধ্যে ফাসাদ ও বিপর্যয়-অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হবে, অথবা শুলিবিদ্ধ করা হবে, কিংবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক দিয়ে কেটে ফেলা হবে। অথবা সে দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে। এটা হচ্ছে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে শাস্তির লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে আরও বড় আযাব। —সূরা মায়িদা ঃ ৩৩-৩৪

www.pathagar.com

'তবে যারা ধরা পড়ার পূর্বেই তওবা করবে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। জেনে রাখ, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই খুব বেশি ক্ষমাশীল এবং অতিশয় দয়াবান।'

চুরির শাস্তি পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ ط وَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

চোর—স্ত্রী বা পুরুষ—যে-ই হোক, উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে শিক্ষামূলক দণ্ড। আল্লাহ্ সর্বজয়ী শক্তির অধিকারী, সুবিজ্ঞানী। অতঃপর যে লোক যুলুম করার পর তওবা করবে এবং নিজের সংশোধন করে নেবে, তার প্রতি আল্লাহ্র দয়ার দৃষ্টি পুনরায় পড়বে। আল্লাহ্ তো খুব বেশি ক্ষমাশীল, এবং অতীব দয়াবান। —সূরা মায়িদা ঃ ৩৮-৩৯

সুদ খাওয়া ও সুদী কারবার সম্পর্কে বলার পর ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّه فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ وَ اَمْرُه اِلَى اللهِ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

যে লোকের নিকট তার রব্-এর পক্ষ থেকে উপদেশ আমল এবং অতঃপর যে বিরত হলো, তার জন্য পূর্বে সে যা করেছে তা বৈধ হবে, তবে এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ থাকবে। আর যে লোক তা পুনরায় শুরু করবে, তারা জাহান্নামী এবং চিরদিন তথায় থাকবে। —সূরা বাকারা ঃ ২৭৫

ইসলামী যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধ পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَ مَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَه اِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَ مَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ

যুদ্ধের ময়দান থেকে যুদ্ধের কৌশল বা স্বতন্ত্র কোন বাহিনীর সহিত মিলিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনভাবে যে পশ্চাদপসরণ করবে, সে আল্লাহ্র গজবে পরিবেষ্টিত হবে। তার স্থান হবে জাহান্নাম এবং তা খুবই খারাপ পরিণতি। —সূরা আনফাল ঃ ১৬

মানবীয় কর্মপদ্ধতিসমূহ আইনরূপে বিধিবদ্ধ হওয়ার পরও অপরাধ প্রবন মন এমন সব কলা-কৌশল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়ে থাকে, যদ্বারা আইনের শৃঙ্খল অতি সহজেই চূর্ণ করা সম্ভব হয়, আইনকে ফাঁকি দিয়ে অথবা আইনের আশ্রয় নিয়েই আইনকে অতি সহজেই লংঘন করা যায় এবং এভাবেই আইনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে বর্তমান দুনিয়ার সর্বত্র। তাছাড়া রাতের অন্ধকারে অপরাধ আপনিই গোপন থেকে যায়। আইনের প্রহরীদের অসতর্কতায় অথবা তাদের নীরব সমর্থনে অপরাধের

www.pathagar.com

কালো হাত যত্রতত্র সঞ্চালিত হয়। যে গোপন পিপীলিকাকে দমন বা নিস্পিষ্ট করার কোন সাধ্যই আইনের নেই। তা'ছাড়া আইন নিজেই কোন কাজ করে না, করার সাধ্য নেই। মানুষই আইনকে কার্যকর করে। কিন্তু সেই মানুষ—আইন কার্যকরকরণের দায়িত্বে নিযুক্ত মানুষই যদি আইন লংঘন করে বা লংঘিত হতে দেয়, তা'হলে বেচারা আইনের ধুলায় গড়াগড়ি করা কান্নাকাটি করা ছাড়া তো কোনই উপায় থাকে না।

এরূপ অবস্থায় ইসলাম ঈমানদার ব্যক্তির মন-মানসিকতাকেই এক তীক্ষ্ণ শাণিত তরবারিরূপে গড়ে তুলতে চায়, যা অন্যায়-পাপ-দৃষ্কৃতি অরাজকতার জীবানুকে তার পক্ষ বিস্তারের পূর্বেই হত্যা করবে। আর মু'মিনের মনের আধিপত্য অন্য সকল প্রকারের আধিপত্যের তুলনায় যে অনেক বেশি শক্তিশালী, তা বলে বোঝাবার প্রয়োজন করে না। রাসূলে করীম (সা) এই দিকে ইঙ্গিত করেই পাপের সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَ الاِثْمُ مَا حَاكَ فِىْ صَدْرِكَ وَ كَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

যে কাজ তোমার মনে কুণ্ঠা জাগায় এবং লোকেরা জানুক তুমি তা পছন্দ কর না, তা-ই হচ্ছে পাপ কাজ। —বুখারী, মুসলিম

ঈমানদার ব্যক্তিরএই জীবন্ত অন্তরই হয় ইসলামী আইন প্রণয়নের আসল দিগদর্শন। যে অন্তরকে সকল প্রকার পাপ-পংকিলতা-মলিনতা থেকে পবিত্র রাখাই সে আইনের প্রথম লক্ষ্য। ফলে ধরা পড়লেও কোন শাস্তি হবে না, অথবা অপরাধ করলে কেউ-ই দেখতে পাবে না—যে পরিস্থিতিতে মানুষ এই ধরনের চিন্তা করার সুযোগ পায় সেই পরিস্থিতিতেও, সে ঈমানদার ব্যক্তি কোন পাপ করতে উদ্যত হয় না। এতদসত্ত্বেও কোন অসতর্ক মুহূর্তে শয়তানী প্ররোচনায় পড়ে সে যদি পাপ করেও বসে, কেউ তা দেখতে না পেলেও সে নিজেই নিজের ঈমানের প্রহরী হয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে স্বীয় অপরাধের কথা অকপটে স্বীকার করে নিতে ও সেজন্য নির্দিষ্ট শাস্তি—তা যত কঠিন ও নির্মমই হোক—গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না। ইসলামের প্রশাসনিক ইতিহাসে দুইটি ঘটনা চির অম্লান হয়ে থাকবে। একটি গামেদীয়ার, আর দ্বিতীয়টি মায়েজ-এর। উভয়ই নিজ নিজ ঈমানের তাকীদে রাসূলে করীমের সমীপে উপস্থিত হয়ে কঠোরতম শাস্তি গ্রহণের প্রস্তাব করেছিল। কোন ব্যক্তি বা পুলিশের কোন লোক তাদের ধরে আনেনি। রাসূলে করীম (সা) গামেদীয়াকে সন্তান প্রসব ও সন্তান বড় হওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন তাও কোন পুলিশের প্রহরায় নয়।

অনুরূপভাবে যেখানেই মানবীয় অধিকার লংঘিত হয়েছে, সেখানেই অধিকার লংঘনকারী ব্যক্তি নিজে অগ্রসর হয়ে সে অধিকার যথাযথভাবে আদায় করে দিতে অকপটে প্রস্তুত হয়েছে, এরূপ ইতিহাস কেবলমাত্র ইসলামেরই অবদান। আর এরূপ না হলে মানুষের অধিকার কিছুতেই সংরক্ষিত হতে পারে না। কেননা অপরাধ প্রতিরোধ

www.pathagar.com

বা দমনের জন্য শুধু আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের উপর নির্ভর করা হলে এই কয়টির ব্যর্থতা তো সকলেরই সম্মুখে প্রকট। বিচারক অদৃশ্যকে জানে না। বাহ্যিক ও উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণই বিচারের একমাত্র ভিত্তি—অবশ্য তা যদি উপস্থিত করা হয়, তবে। আর বিচার কখনোই হালালকে হারাম কিংবা হারামকে হালাল করতে পারে না। এই সুযোগে যেসব লোক মিষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে পারদর্শী তারা তার মাধ্যমে আইনকে ফাঁকি দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইলে তাকে ঠেকাতে পারে। এরূপ অবস্থায় ইসলাম মুখের মিষ্টতা ও আইনের মারপ্যাচের সাহায্যে লব্ধ স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ও জাহান্নামের টুকরা নামে অভিহিত করে তা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছে। রাসূলে করীম (সা) বাস্তব অবস্থার ব্যাখ্যাস্বরূপ ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَ اِنَّهُ يَأْتِيْنِى الْخَصَمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسِبُ اَنَّهُ صَدَقَ فَاَقْضِىْ لَهُ بِذٰلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاَنَّمَا هِىَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْ هَا اَوْ لِيَتْرُكْهَا

আমি একজন মানুষ। আমার নিকট বিবদমান পক্ষগুলি আসে বিচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে। অবস্থা এই হয় যে, তোমাদের কেউ হয়ত অন্য লোকের তুলনায় অধিক বাকপটু, তখন আমি মনে করি, সে সত্য কথাই বলেছে। তখন সেই প্রেক্ষিতে তার পক্ষে রায় দিয়ে দিই। এক্ষণে আমি যদি অন্য কোন মুসলমানের হক কাউকে দেওয়ার রায় দিই, তা'হলে মনে রাখতে হবে, তা আগুনেরই একটি টুকরা, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, অন্যথায় পরিহার কর।

অপরাধ দমনে বা অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের অনুসৃত পন্থার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হ'ল। এই আলোচনায় তা সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলেই মনে করি। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এই পর্যায়ে কোন মানবীয় চেষ্টা প্রচেষ্টা কি ততটা উচ্চতর মান পর্যন্ত পৌছতে পেরেছে ?

সত্যি কথা হচ্ছে, কোন সমাজ-সমষ্টিই কল্যাণময় হতে পারে না ঈমান ছাড়া। আর ঈমান তো স্থান লাভ করে—দানা বেঁধে উঠে মানুষের মনে, অন্তরে, হৃদয়ে, চেতনায় এবং এই মন ও চেতনা ইসলামকে বাদ দিয়ে কখনই জীবন্ত হতে পারে না। এই ঈমান ও ইসলামকে হারিয়েই আধুনিক সমাজ সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, বিশ্বমানবতার জীবনে চরম দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছে। তাদের মন-অন্তর-চেতনা মরে গেছে। অতএব এখনও কি আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসার, কুরআন ও সুন্নাহকে জীবনাদর্শের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার এবং ইসলামী শরীয়তকে বাস্তবায়িত করার সময় উপস্থিত হয়নি ? আল্লাহ্‌র নির্দেশ তো এই ঃ

www.pathagar.com

وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُوْنَ ۰ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

তুমি লোকদের মাঝে প্রশাসন কায়েম কর আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে এবং ওদের কামনা-বাসনা-ইচ্ছার অনুসরণ করো না। তুমি ওদের ভয় কর এজন্য যে, ওরা আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধানের কিছু অংশে তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে। ওরা পিঠ ফিরিয়ে গেলে কোন ভয় নেই, জেনে রাখ, আল্লাহ্ ওদের কোন কোন গুনাহের দরুন ওদের বিপদে ফেলতে পারেন। আর অনেক লোকই তো সীমালংঘনকারী। ওরা কি এখনও জাহিলিয়াতের বিধান কার্যকর দেখতে চায় ? অথচ আল্লাহ্‌র চাইতে উত্তম বিধানদাতা দৃঢ় প্রত্যয়শীল লোকদের জন্য আর কেউ হতে পারে না। —সূরা মায়িদা ঃ ৪৯-৫০

www.pathagar.com

অপরাধ দমনে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ বিধান। এই বিধানের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব এবং বিরাটত্বের কারণ হচ্ছে, তা জীবনের প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় পরিব্যাপ্ত। মানুষ যে পরিবেশে বসবাস ও জীবন ধারণ করে, অপরাধ এবং অপরাধের শাস্তি সেই পরিবেশের সহিত গভীরভাবে সম্পৃক্ত ব্যাপার। সেক্ষেত্রে ইসলামের অবদান পূর্ণমাত্রায় অনুধাবনীয়।

সম্ভবত মানুষের জানা-পরিচিত জীবন বিধানের মধ্যে ইসলামই একক ও অতুলনীয়, যা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তার প্রতিরোধ করে, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তার শাস্তি বিধান করেই ক্ষান্ত হয়না। অবশ্য দুনিয়ার অপরাপর মানবীয় বিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তার শাস্তির ব্যবস্থা করা মাত্র। এই কারণেই কুরআনে সেই অপরাপর বিধানসমূহের নামকরণ হয়েছে 'জাহিলিয়ত'— অজ্ঞতা ও বর্বরতাই তার আসল পরিচিতি। বলা হয়েছে ঃ

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

ওরা কি জাহিলিয়তের বিধান ও প্রশাসন চায় ? আসলে দৃঢ় প্রত্যয়শীল লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র চাইতে উত্তম বিধানদাতা ও প্রশাসক আর কে-ই বা হতে পারে।

এ আয়াতের দৃষ্টিতে আইন-বিধান ও শাসন-প্রশাসন দু'ভাবে বিভক্ত ধরা যায়। একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান ও প্রশাসন এবং দ্বিতীয় হচ্ছে জাহিলিয়তের বিধান ও প্রশাসন।

মানুষ আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান-পদ্ধতি বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে যে সব আইন-বিধান ও প্রশাসন পদ্ধতি রচনা করে, কুরআনে তার নামকরণ হয়েছে জাহিলিয়তের বিধান বা প্রশাসন-সংস্থা। এই প্রশাসন সংস্থা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে যত না প্রতিরোধ ও নিষেধমূলক বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তার চাইতে অনেক বেশি করে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হিসাবে। ইসলামও শাস্তির ব্যবস্থা করেছে বটে ; কিন্তু আসলে ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তা সংঘটিত না হওয়া বা সংঘটিত হতে না দেওয়ার উপর কিংবা তার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণতর করে দেওয়ার উপর। আর সে জন্য ইসলাম বহু প্রকারের উপায় অবলম্বন করেছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান ব্যাপকতরকরণ ইসলাম অবলম্বিত উপায়-পন্থাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রাধান্যের অধিকারী।

www.pathagar.com

তবে ইসলাম ব্যাপারটিকে সর্বদিক দিয়ে এবং সর্বাত্মকভাবে গ্রহণ করেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চৈন্তিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ প্রভৃতির মধ্যে কোন একটি দিককে ইসলামেও বাদ দেওয়া হয়নি। যে যে ছিদ্র পথে অপরাধ অনুপ্রবেশ করতে পারে ও করার সুযোগ পায়, তার প্রত্যেকটিই বন্ধ করে দিতে ইসলাম আগ্রহী এবং সচেষ্ট। এই কারণেই এ ঐতিহাসিক সত্য কেউ-ই অস্বীকার করতে পারবে না যে, মানব সমাজের মধ্যে অপরাধের সর্বনিম্ন মাত্রার দিক দিয়ে এখনও—এই চরম পতন যুগেও ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসাবে গৃহীত ও অনুসৃত না হওয়া সত্ত্বেও—ইসলামী সমাজ অনন্য ও তুলনাহীন। আর তার কারণ হচ্ছে, ইসলাম চতুর্দিক দিয়েই এই লক্ষ্যে অগ্রসর হয় এবং অপরাধ নির্মূল কিংবা তার ক্ষেত্র সংকীর্ণতরকরণে বাস্তব কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ চুরি অপরাধের উল্লেখ করা যেতে পারে। ইসলাম সে অপরাধ থেকে লোকদের দূরে রাখার জন্য হাত কাটাকে দণ্ড হিসাবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু হাত কাটার দণ্ড তো একমাত্র বা সূচনাকালীন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নয়, তা হচ্ছে চরম ব্যবস্থা। এই পর্যায়ে সূচনাকালীন প্রতিরোধ ব্যবস্থা হচ্ছে, ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষকে ইসলামী জীবন-বিধানে বিশ্বাসী ও তার বাস্তব অনুসরণকারী বানাতে চায়, যেন চৌর্য কাজটিকে মুসলিম মাত্রই অন্তর থেকে ঘৃণা করে। (অবশ্য এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা হবে)। সেই সাথে ইসলাম যে অর্থ ব্যবস্থা কার্যকর করে, তার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে, সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকার হিসাবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা পাওয়ার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। এ জন্য ইসলাম দু'টি পন্থা গ্রহণ করেছে। প্রথমত, সমাজের প্রত্যেকটি কর্মক্ষম, পুরুষের জন্য হালাল পবিত্র রিয্ক উপার্জন করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়, সাধারণভাবে সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা (Social security system) ব্যবস্থা। এ দু'টি বাস্তব ব্যবস্থা কার্যকর হলে কোন একটি ব্যক্তির পক্ষেও চুরি কার্যে নিযুক্ত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা বা কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন লোক যদি (চারিত্রিক দোষের কারণে বা লোভের বশবর্তী হয়ে) চুরি কাজে লিপ্ত হয়, তা'হলে অপরাধের শাস্তি হিসাবে শরীয়তে নির্ধারিত দণ্ড (হাত কাটা) অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। কেননা নাগরিকদের জীবনের সাথে সাথে ধন-মালের নিরাপত্তা দানও ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

কিন্তু তা সত্ত্বেও—চুরি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রতিবন্ধক সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার পর-ও এই অপরাধ সংঘটিত হলে খুব দ্রুততা সহকারে হস্ত কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামের বিচারনীতির পরিপন্থী। ইসলাম প্রত্যেকটি অপরাধকে স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করে। অপরাধী কেন অপরাধ করল, কোন জিনিস তাকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করেছে। তা বিস্তারিত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা ও বিচার-বিবেচনা করা অপরিহার্য হবে। এ ভাবে পর্যালোচনা ও বিচার-

www.pathagar.com

বিবেচনায় এই অপরাধকরণে কোন বৈষয়িক কারণ প্রমাণিত হলে অপরাধীকে 'সন্দেহ-সুবিধা' অবশ্যই দেওয়া হবে এবং দণ্ড কার্যকরকরণ থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে।

তা ছাড়া ক্ষমা দান করে ভুল করা শাস্তি দানে ভুল করা—অর্থাৎ ভুল করে নিরপরাধীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে দণ্ডদান করা অপেক্ষা অনেক বেশি উত্তম, ইসলামের দণ্ড বিধানে এক নির্গূণ সর্বজনগৃহীত মৌলনীতি। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তার প্রতি ইসলামের গৃহীত এ একটি বিশেষ কর্মপদ্ধতি। ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার পথ বন্ধ করার জন্যও ইসলাম অনেকগুলি পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। এই কারণে কন্যার পূর্ণ বয়স্কা হওয়ার সাথে সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষ উৎসাহ—বরং তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়টিকে একটি নীতিগত বা মতাদর্শগত দাওয়াত বানিয়েই রাখা হয়নি। সে জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও পরিবার নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বায়তুল মালই হয়ে থাকে সে জন্য প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তার পক্ষে কারণ বিশ্লেষণও করা হয়েছে। যুবক-যুবতীদের কোন রূপ যৌন অপরাধে জড়িত হওয়ার পূর্বেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত জরুরী। এ ভাবে শরীয়তসম্মত পন্থায় যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ থাকলে অন্তত যৌন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পথ অনেকখানি রুদ্ধ হয়ে যাবে, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। যাদের অস্বাভাবিক যৌন উত্তেজনার ধারক হওয়ার কারণে একজন মাত্র স্ত্রী যথেষ্ট হয় না, তাদের জন্য একাধিক—চারজন পর্যন্ত স্ত্রী এক সময় গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সর্বদিক দিয়ে ব্যভিচারের পথ বন্ধ করাই এই সব ব্যবস্থার লক্ষ্য। কেননা আধুনিক ইউরোপ-আমেরিকায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে যতই ঘৃণা করা বা লজ্জাকর ও সামাজিকভাবে ভয়ানক আপত্তিকর মনে করা হোক, বহু সংখ্যক বিয়েহীন 'স্ত্রী'-রক্ষিতা, মেয়ে বান্ধবী গ্রহণে ও তাদের সহিত প্রকাশ্যে ও গোপনে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে কোনদিক দিয়েই একবিন্দু বাধা বা অসুবিধা নেই।

কিন্তু ইসলামের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলাম তার তওহীদী আকীদার কারণে পবিত্র এক দীন। মানুষকেও আল্লাহ্‌র পবিত্র সৃষ্টি হিসাবে গড়ে তোলা এবং জীবন যাপনে অভ্যস্ত করাই ইসলামের লক্ষ্য। ইসলাম বিশেষ করে পুরুষদের বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের স্বভাব প্রকৃতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম লক্ষ্য করেছে যে, এমন পুরুষ রয়েছে যারা একজন মাত্র স্ত্রীর দ্বারা নিজেদের যৌন তৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না, তাদের একের অধিক স্ত্রীর প্রয়োজন। তাই এই স্বাভাবিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে একসাথে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি তাদের দিয়েছে। কিন্তু তাকে অসীম ও বাধা-বন্ধনহীন করে দেওয়া ও পুরুষের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার দিক দিয়ে উচিত নয়। সে কারণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে চার পর্যন্ত সীমিত করে দিয়েছে। বলে

www.pathagar.com

দিয়েছে, এক সাথে বড়জোর চারজন স্ত্রী রাখতে পারবে, তার বেশি নয়। যেন এই চারজনের বাইরে তাদের যৌন পরিতৃপ্তির ক্ষেত্র গ্রহণ করে অপরাধী হতে না হয়। দ্বিতীয়ত সে একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ ন্যায়পরতা ইনসাফ ও সমান আবরণ গ্রহণের শর্ত করা হয়েছে।

এক কথায়, ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই সম্ভাব্য অপরাধের দ্বার রুদ্ধ করে দিতে বদ্ধ পরিকর। তারপরও যদি অপরাধ সংঘটিত হয়, এবং তা হয় কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, তা'হলে সে জন্য অপরাধীকে কঠিন ও কঠোর শাস্তি দেওয়া ইসলামের সিদ্ধান্ত এবং তার যৌক্তিকতাও কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যে সব অপরাধের জন্য ইসলামে 'হদ্দ'—সুনির্দিষ্ট শাস্তি ঘোষিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এই কথার সত্যতা অনস্বীকার্য। অবশ্য কোনরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হলে অভিযুক্তকে সেই সুযোগ দিতে হবে।

এই প্রেক্ষিতেই অপরাধ দমনে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রভাব কি, তা বিশ্লেষণ করতে হবে। এই পর্যায়ে আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে, ইসলাম মূলতই একটি শিক্ষা প্রশিক্ষণমূলক দীন। ইসলামের মৌল ভাবধারা—ঈমান, আকীদা, মূল্যমান ও জীবন-বিধানের ব্যাপক শিক্ষাদানের মাধ্যমে সেই অনুযায়ী সমাজ-ব্যক্তিদের তৈরি করা ইসলামের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। তখন কুরআন ও সুন্নাতের উপস্থাপিত জীবন বিধানই হয় তাদের জীবনের অনুসরণীয় একমাত্র বিধান। কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে যা সত্য, যা কল্যাণকর, তা-ই হয় তাদের নিজ নিজ জীবনে একমাত্র সত্য ও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে কুরআন ও সুন্নাতের দৃষ্টিতে যা মিথ্যা, বাতিল, অন্যায় ও পাপ, তাদের মন-মানসিকতা ও জীবনের কর্মতৎপরতায় তা-ই হয় সম্পূর্ণরূপে বর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত। এ ভাবে তৈরি করা লোকেরা প্রথমোক্ত জিনিসকে অগ্রাহ্য করতে এবং শেষোক্ত কার্যাবলী গ্রহণ ও অবলম্বন করতে কখনই—কোন অবস্থাতেই প্রস্তুত হয় না। এ ভাবেই ইসলাম তার যাবতীয় মূল্যমান ও নিয়ম-বিধানসহ উক্ত ব্যক্তিদের জীবনে এবং সেই ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সমাজের ক্ষেত্রে পুরাপুরিভাবে বাস্তবায়িত হয়।

বস্তুত ইসলামের এই বাস্তবায়ন সম্ভব হয় কেবলমাত্র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। নবী করীম (সা) প্রথমে মক্কায় এবং পরে মদীনায় এই কাজে প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম করেছেন। দিন-রাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর দীনী দাওয়াত ছিল ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রচার-মাধ্যমে এবং সেই অনুযায়ী সাহাবীগণকে চলতে অভ্যস্ত করে দিয়ে তিনি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন পূরণ করতেন, নাযিল হওয়া মাত্রই তিনি কুরআন পাঠ করে তাদের শোনাতেন। সেই অনুযায়ী নিজে কাজ করে ও সাহাবীগণ দ্বারা তা করিয়ে তবে ক্ষান্ত হতেন। রাসূলে করীম (সা) কর্তৃক দীন-ইসলাম এভাবেই পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

www.pathagar.com

অতএব ইসলামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান-ই ছিল ইসলামকে বাস্তবায়িত করার প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়, তা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টাও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ছিল আর্দশ চরিত্রের ব্যক্তি গড়ে তোলা, সেই আদর্শ শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রশিক্ষিত চরিত্রবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে আদর্শ সমাজ গঠন করা।

এই দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে যে, দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম ও জীবন বিধানের সহিত ইসলামের কোন তুলনাই করা যায় না। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম ও জীবন-বিধানকে জাহিলিয়ত বলে অভিহিত করেছেন। কেননা সে মনে দীন শিক্ষাকে জীবন ও চরিত্র গঠনের মৌলিক প্রক্রিয়া হিসাবে গৃহীত হয়নি।

দুনিয়ার অপরাপর ধর্ম ও জীবনাদর্শের লক্ষ্য হচ্ছে 'আর্দশ নাগরিক' তৈরি করা। কিন্তু ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে 'আদর্শ মানুষ' গড়ে তোলা।

'আদর্শ নাগরিক' ও 'আর্দশ মানুষ' এ দু'য়ের মাঝে কি কোন পার্থক্য আছে ? উপরোক্ত কথার প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। কিন্তু বাহ্যত এ দুইয়ের মাঝে কোন পার্থক্য আছে বা হতে পারে—তা মনে হয় না। কেননা আদর্শ নাগরিকই তো আদর্শ মানুষ কিংবা আদর্শ মানুষই তো আদর্শ নাগরিক হতে পারে বলে স্পষ্ট মনে হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভিত্তিহীন ধারণা মাত্র। এর সত্যতার কোন ভিত্তিই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আধুনিককালের এবং ইতিহাসের যে কোন সময়ের জাহিলিয়তের প্রতি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ইংরেজদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই দুনিয়ায় আদর্শ রূপে গণ্য হতো। কেননা তা ভারসাম্যপূর্ণ ছিল, যা ইসলামেরও লক্ষ্য। কিন্তু সে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ আদর্শ বা দৃষ্টান্তমূলক ছিল জাহিলিয়তের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দৃষ্টিতে এবং তার লক্ষ্য ছিল উপযুক্ত আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা। আমরা যদি সেই আদর্শ নাগরিককে ইসলামের তুলাদণ্ডে ওযন করি, তা হলে আমরা অবশ্যই দেখতে পাব যে, 'আদর্শ নাগরিক', 'আদর্শ মানুষ' থেকে অনেক—অনেক দূরে অবস্থিত। আমরা বিশেষভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বকালীন বৃটিশের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কথা বলছি এ জন্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইউরোপীয় সমাজের মূল গ্রন্থিকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, তথায় নিয়ে এসেছে চরম বিপর্যয়। সেখানকার অনেক ভালো ভালো মূল্যমান ও শুভ ব্যবস্থাপনাকেও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ফলে অনেক বেশি খারাপ হয়ে গেছে সেখানকার সমাজ পরিবেশ ও ব্যক্তি-চরিত্র, যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে দৃষ্টিগোচর হতো না। আমরা সেই সময়কার বৃটিশ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করছি এই কারণে যে, তখন তা বাস্তবিকই অনেক ভালো ছিল এবং তাতে যে আদর্শ নাগরিক গড়ে উঠত, তারা বিশ্বমানবতার নিকট আদর্শ ও দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হতো। কিন্তু যখন এই গ্রেট

www.pathagar.com

বৃটেনের সুনাগরিকরা যখন বিশ্বের নানা দেশ দখল করে তার উপর কর্তৃত্ব করতে বে'র হয়ে আসত, তখন তারাই সর্বত্র চরম নির্মমতা, অমানুষিকতা ও চরিত্রহীনতার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিত। বৃটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষ, সুদান ও মিসরে তাদের যে রূপ দেখা গিয়েছে, তা 'আদর্শ নাগরিকের' রূপ হলেও হতে পারে ; কিন্তু 'সাধারণ মানুষের রূপ'-ও ছিল না। এমনকি তাদের নিজ দেশের অভ্যন্তরে আচরিত সমস্ত ভদ্রতা ও সুনাগরিকত্ব তাদের অধিকৃত ভূ-খণ্ডসমূহে চরম হিংস্র পাশবিকতার রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করত। তথায় তাদের আদর্শ নাগরিকত্ব ও বিশ্বাস পরায়ণতার নাম চিহ্ন-ও খুঁজে পাওয়া যেত না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তারা তো নিজেদের দেশে উন্নত চরিত্র ও আদর্শ নাগরিক রূপেই গড়ে উঠেছিল ? কিন্তু তাদের দখলিকৃত জনপদসমূহে তা কোথায় উঠে যেত ? তবে তারা তথায় গিয়ে কি সম্পূর্ণ বদলে যেত ? না, বদলে যেত না। আসলে তাদের সেই রূপ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই দেওয়া হয়েছিল। তাদের মানবিক রীতি-নীতিতে, মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারীরূপে আদপেই গড়ে তোলা হয়নি। মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় অন্যান্য মানুষের সহিত মানবিক আচার-আচরণ গ্রহণের শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করা হয়নি। মহান আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে জীবন যাপনেরও কোন শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়নি। আসলে তাদের তৈরি করা হয়েছিল 'গ্রেট বৃটেন' নামক দেবতার পূজারীরূপে। তারা দেশের অভ্যন্তরে সেই দেবতার কল্যাণে যা কিছু ভালো, তারই অনুসরণ করত। আর যখন তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহ শাসনের দায়িত্ব নিয়ে বাইরে বের হয়ে আসত, তখনও সেই দেবতার কল্যাণই হতো তাদের একমাত্র কাম্য। যদিও পদ্ধতি হতো ভিন্নতর। তখন ব্যাপক লুটতরাজ, চুরি-ডাকাতি, অপহরণ, নিরীহ অক্ষম মানুষের রক্তের বন্যা প্রবাহিত করা,মানুষের ইজ্জত-আবরু বিনষ্ট ও ধন-মাল আত্মসাৎ করাই হতো সেই দেবতার পূজার নৈবেদ্য। অথচ দেশের অভ্যন্তরে তারা হতো অত্যন্ত সৎ, সাধু বিশ্বাস্য, মানবতার দরদী ও নিরতিশয় ভদ্র মানুষ।

তাহলে বোঝা গেল, গ্রেট বৃটেনের বাইরে এসে তারা ঠিক বদলে যেত না। দেশে তারা যে 'আদর্শ নাগরিক', বাইরের দেশসমূহে সেই নাগরিক আদর্শত্ব কিংবা আদর্শ নাগরিকত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটত, যদিও তার রূপ ভিন্নতর। তাদের দেশের অভ্যন্তরে অনুসৃত নিয়ম-নীতি ও সাম্রাজ্যসমূহে গৃহীত আচরণে কোন স্ববিরোধিতা ছিল না। ছিল পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্য। এ ছিল একই মানুষের দুই রূপ। পরিবর্তিত সাম্রাজ্যের রূপ নয়। এই কথাটির আরও ব্যাখ্যার জন্য আমি এখানে দুইটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। তাতে জাহিলিয়তের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করি।

প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল সাহারা মরুভূমিতে বৃটিশ বা মিত্রবাহিনী এবং আলমানীয়দের মধ্যে। এ এক দীর্ঘ প্রাণান্তকর যুদ্ধ ছিল। তবরুকে অবস্থিত রোমানদের উপর মন্টোগোমারীর বিজয় লাভে এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছিল।

www.pathagar.com

আলমানীয়রা তবরককের চতুর্দিকে অবস্থিত যুদ্ধক্ষেত্রে ডিনামাইট বসিয়ে সুরক্ষিত করে রেখেছিল। একবার সাময়িকভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছিল আলমানীয়দের তবরক ত্যাগ করে চলে যাওার এবং বৃটিশদের তথায় প্রবেশ করার ফলে। কিন্তু শেষবারে আলমানীয়দের তবরক ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পূর্বে তারা চতুর্দিকে ডিনামাইট বসিয়ে রেখে চলে যায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তবরক দখলকারীরা যেন তা দখলে আনবার সময়ে ভীষণ-ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মরু অঞ্চলে সাধারণত প্রথমে উট ও গাধা পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেন ওদের পায়ের আঘাতে ডিনামাইট ফেটে যায় এবং মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি খুব সামান্যই হয়। কিন্তু বৃটিশ সেনাবাহিনীর চরম নির্মমতা এই দেখা গেল যে, তারা উট ও গাধার পরিবর্তে বৃটিশ সাম্রাজ্যাধীন ভারতীয় বাহিনীকে সেই ডিনামাইট বসানো প্রান্তরে প্রবেশ করার নির্দেশ দিল। তারা সামরিক বাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী সেনাধ্যক্ষের নির্দেশ অমান্য করতে পারে না। তারা জানত যে, এ প্রান্তরটি ডিনামাইটে ভরে আছে এবং তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার অর্থ নির্ঘাত মৃত্যু। তা সত্ত্বেও গোটা বাহিনী তাতে প্রবেশ করে ডিনামাইট ফাটিয়ে নিজেরা ধ্বংস হয়ে গিয়ে বৃটিশ বাহিনীর অগ্রযাত্রার পথ বিপদমুক্ত করে দিল। এর পরই মিত্রবাহিনী তথায় প্রবেশ করে এবং পরের দিন সামরিক ইশতেহারে তবরক দখল ও যুদ্ধ জয়ের সংবাদ প্রকাশ করা হয়। বলা হয়, এ যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি খুব সামান্যই হয়েছে।

এ-ই হচ্ছে বৃটিশের আদর্শ নাগরিকদের বিশেষ চরিত্রের নমুনা। আসলে ওদের তৈরিই করা হয়েছিল গ্রেট বৃটেন দেবতার উপযুক্ত পূজারী রূপে এবং জন্তু-জানোয়ারের পরিবর্তে মানুষকে—নিরীহ অক্ষম মানুষকে ধ্বংস করে গ্রেট বৃটেনের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিল পৃথিবী ব্যাপী। ভেতরে অত্যন্ত উদার মানবিক চরিত্র এবং বাইরে নিতান্ত হীন মানব দুশমন চরিত্রের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে তারা খুবই দক্ষ ও পারঙ্গম।

দ্বিতীয় ঘটনাটি জনৈক বৃটিশ সামরিক ব্যক্তির ভারতবর্ষে অবস্থানকালীন একটি আলোকচিত্র। চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে, সে তার জন্য নির্দিষ্ট অশ্বের পৃষ্ঠে জিনের (Saddle) সাহায্যে আরোহণ করছে না, আরোহণ করছে তারই মত একজন ভারতবর্ষীয় মানুষের কাঁধের উপর পা রেখে। এইরূপ আচরণ যে আদৌ মানবিক নয় এবং যে মানুষকে মানুষ মনে করে, জন্তু-জানোয়ার নয়, এমন কোন লোকের পক্ষে এরূপ আচরণ করা সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য।

এখানে বৃটেনের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আদর্শ নাগরিকের যে জঘন্য ও বীভৎস ঘটনাদ্বয়ের উল্লেখ করা হলো, 'আদর্শ নাগরিক' ও আদর্শ মানুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রকট করার জন্য তা সর্বতোভাবে যথেষ্ট। ইসলাম মানুষকে শুধু আদর্শ নাগরিক রূপেই বিবেচনা করে না, গড়ে তুলতেও চেষ্টা চালায় না, বরং আদর্শ মানুষ বা প্রকৃত মানুষের আওতায় তার লালন পালন করতে বদ্ধপরিকর। মানুষের সাথে ইসলামের আচরণ মানুষ

www.pathagar.com

হিসাবে। ইসলাম চায়, মানুষ তার সেই আসল প্রকৃতি ও চরিত্রে প্রতিভাত হোক, যে প্রকৃতি ও চরিত্রে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ۞ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আমরা মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি। পরে আমরা তাকে উল্টা ফিরিয়ে সর্বনিম্নে পৌঁছে দিয়েছি—সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে .....

—সূরা তীন ঃ ৪-৬

এই ঈমান-ই মানুষকে তার সেই আসল রূপে ও গুণে বিভূষিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, যাতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মূলতই সৃষ্টি করেছেন। আর তা-ই হচ্ছে আদর্শ মানুষ, 'শুভ মানুষ'—ইনসানে সালেহ্'। এই আদর্শ মানুষ গড়াই ইসলামের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের লক্ষ্য।

ইসলাম যে 'ইনসানে সালেহ্'—আদর্শ-উন্নত মানুষ' তৈরি করে, তা কোন কৃত্রিম মানুষ নয়, নয় বিশেষ বিন্দুতে ও নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মধ্যে উন্নত চরিত্রের অধিকারী বা আদর্শ মানুষ। সে তো পৃথিবীর সর্বত্র—যেখানেই তার পদধূলি পড়বে, মুসলিম সমাজের মধ্যে কিংবা তার বাইরে—সকল ক্ষেত্রেই তার উন্নত মানবিক চরিত্রের সংরক্ষক। তার সম্পর্ক ও যোগাযোগ কেবল মুসলিমদের সাথেই নয়, অমুসলিম যিম্মীদের সাথে তার যোগাযোগ থাকবে। অর্থাৎ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষেরই সাথে তাঁর যোগাযোগ সম্পর্ক ও আদান-প্রদান থাকবে। এই সত্যেকে সমুদ্ভাসিত করে তোলার জন্য এখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা যাচ্ছে।

ইসলাম আফ্রিকায় সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ সীমারেখা বরাবর অর্থাৎ মধ্য আফ্রিফার সম্পূর্ণ অঞ্চল এবং এশিয়ার পূর্ব ও পশ্চিমের সর্বত্র কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত ব্যতীতই ব্যাপক প্রচার লাভ করে। কিন্তু তা কিভাবে প্রচারিত হলো, কে প্রচার করল ? .....বলা হয়, মুসলিম প্রচারকগণই তা করেছেন। .....এ কথা অসত্য নয়। ইসলামের প্রচারকদের খুব বড় এবং বেশি তৎপরতা ছিল এই বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী ইসলামের ব্যাপক প্রচার লাভের মূলে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু আসলে এ ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যবসায়ীদের ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক প্রবল। আর তাদের অধিকাংশ ছিল আরব উপদ্বীপের অধিবাসী হাদরামী বংশের লোক। তাঁরা পৃথিবীর দিকে দিকে সফর করেছেন—দীনের দাওয়াত প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে নয়, শুধু ব্যবসায়ের লক্ষ্যে। কিন্তু নিছক ব্যবসায়ী অভিযাত্রীদের দ্বারা ইসলাম কি করে এতটা প্রসারতা লাভ করতে পারলো, অথচ তারা ইসলাম প্রচারের জন্য এই বিদেশ যাত্রা করেন নি ? .....তা কি করে সম্ভব হলো, সে একটা বড় প্রশ্ন বটে।

এ সব এলাকার অধিবাসীরা যখন আরব মুসলিম ব্যবসায়ীদের অতীব উত্তম চরিত্র দেখতে পেয়েছিল, যখন দেখল ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে এই লোকগুলির

www.pathagar.com

চরিত্র কত উন্নত, মধুর ও মানবিক ; প্রত্যক্ষ করলো তাদের নৈতিক পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা, আনুভূতিক, আত্মিক, নৈতিক, পারস্পরিক লেনদেন ও সম্পর্ক-সম্বন্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় আচার-আচরণের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও নিষ্কলুষতা, তখনই তারা ইসলামের সত্যতার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠলো। তারা বলল, এ-ই যদি ইসলাম হয়, তা হলে সে ইসলামের জন্যই আমরা প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করছি এবং পাওয়া মাত্রই তারা তা গ্রহণ করে নিল। কেননা যে দীন এরূপ আদর্শ মানুষ তৈরি করতে পারে, তার মত আর দীন হতে পারে না। তা অবশ্যই সত্য ও অনন্য হতে বাধ্য। তা হলে বলা যায়, আরব-মুসলিম ব্যবসায়ীদের আচার-আচরণই ইসলামের ব্যাপক প্রচারের জন্য প্রধানত দায়ী এবং এটা তাদেরই বিশেষ অবদান, সন্দেহ নেই।

আর ইসলাম মানুষের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চালিয়েছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ভিত্তিতে। তা সেই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যার সাক্ষ্য ও ঘোষণা স্বয়ং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) দিয়েছেন। তা আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত। আমরা মুখে যতটা উচ্চারণ করি, কালেমা আসলে ঠিক ততটাই নয়। মূলত তা এক বিরাট বিপ্লব। উপরন্তু মুখে কালেমার শব্দসমূহ উচ্চারণ করার নাম-ই ইসলাম নয়। ইসলাম হচ্ছে এই কালেমাকে বাস্তবায়িত করা, কালেমা অনুযায়ী যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা। ইসলাম এই কালেমার ভিত্তিতেই মানুষকে তৈরি করেছে, তৈরি করতে চাচ্ছে, কেননা এই কালেমাই তো ঈমান, ঈমানের মর্মবাণী। ইসলামে যে ঈমান, তার কতিপয় শর্ত ও লক্ষ্য রয়েছে, রয়েছে কতগুলি নৈতিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি লক্ষণীয় ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

মু'মিনরা কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেছে।

কিন্তু মু'মিন কারা, তাদের গুণ-পরিচিতি কি ? কোন্ সব গুণের কারণে তারা মু'মিন নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে ? তার পরিচয় ঃ

هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۞ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ۞ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلاَّ عَلى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغى وَ رَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ۞ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لاَمَانَتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ۞ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۞ اُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۞

মু'মিন তারা, যারা তাদের সালাতে বিনয়ী-বিনম্র-অবনত মন, যারা বেহুদা ও অর্থহীন কাজ থেকে বিরত, যারা যাকাতের কাজ সম্পন্নকারী বা নিজেদের চরিত্র

www.pathagar.com

পরিশুদ্ধ পরিবর্ধিতকারী, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারী (নিজেদের স্ত্রী বা ক্রীতদাসী ছাড়া—তাতে তারা তিরস্কৃত নয়, যারা এর বাইরে নিজেদের স্পৃহা চরিতার্থ করতে চাইবে, তারা সীমালংঘনকারী) আর যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা সমূহ পরিপূরণকারী, যারা নিজেদের নামাযের হিফাজতকারী—তারাই উত্তরাধিকারী, যারা ফিরদাউস জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে এবং তথায় চিরদিন থাকবে।

অর্থাৎ শুধু কালেমার প্রতি বিশ্বাসী বা মুখের দাবিদার হওয়ার কারণেই মু'মিন নামে অভিহিত হতে পারে না। সেই ঈমান অনুযায়ী তাদের জীবন যাপন করতে হবে, এরই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে, তা-ই হবে তাদের বাস্তব জীবনের কর্মধারা। এই সঙ্গেই কুরআনের আরও একটি আয়াত বিবেচ্য। আয়াতটি এই ঃ

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ط وَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ٥ وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنّٰتُ عَدْنٍ ٥

যারা জানলো যে, তোমার নিকট যা নাযিল হয়েছে তা বরহক, তারা কি তার মত যে অন্ধ। সেই বুদ্ধিমানরাই নসীহত কবুল করে, যারা আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণ করে এবং পাকা-পোখ্‌ত করা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। আর যারা সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করে, যা স্থাপন ও রক্ষা করার নির্দেশ আল্লাহ্‌ দিয়েছেন এবং ভয় পায় তাদের রবকে, ভয় করে অত্যন্ত খারাপ হিসাব লওয়াকে। আর যারা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়ার লক্ষ্যে এবং নামায কায়েম করে ও ব্যয় করে তা থেকে যা আমরা তাদের দিয়েছি রিযিক হিসাবে—গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে, তাদের জন্যই রয়েছে পরিণতির ঘর হিসাবে সদাপ্রস্তুত জান্নাত।

আল্লাহ্‌র নিকট থেকে রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা যারা জানতে পারে এবং এই জানার ফলশ্রুতিতে তাদের আচরণ এই হবে যে, আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করবে, আল্লাহ্‌ যা পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন তা পূরণ করবে, নামায কায়েম করবে, অর্থদান করবে, অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করবে, বস্তুত কুরআনের দৃষ্টিতে তারাই মু'মিন। তার অর্থ কালেমা'র একটা পূর্ণাঙ্গ নৈতিক বিধান রয়েছে, শুধু মুখের উচ্চারণে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তাদের মন-মগজেও এই কালেমা প্রতিষ্ঠিত হবে সুদৃঢ়ভাবে।

www.pathagar.com

যখন বলি যে, ইসলাম লোকদের প্রশিক্ষণ করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র ,খন তার অর্থ এই হয় না যে, লোকদের শুধু এই কালেমার ওয়াজ শোনাতে হবে—ওয়াজ-নসীহত ও কালেমা বাস্তবায়নের একটি পন্থা সন্দেহ নেই—বরং এই কালেমা অনুযায়ী বাস্তব জীবন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে, সে জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিও ব্যয় করতে হবে—এই কথাও তার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

রাসূলে করীম (সা) ছিলেন মুসলমানদের আদর্শ নেতা, গোটা বিশ্বমানবতার অনুসরণীয় আদর্শ। বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللهَ وَ الْيَوْمَ الاخِـرِ وَ ذَكَـرَ اللهَ كَثِيْرًا ٥

তোমাদের জন্য রাসূলে রয়েছে অতীব উত্তম আদর্শ, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের মুক্তির আশা করে ও আল্লাহ্‌কে খুব বেশি করে স্মরণ করে।—সূরা আহসাব ঃ ২১

তাঁর পরে সাহাবায়ে কিরামের স্থান ও মর্যাদা এবং তাঁদের পরে তাবেয়ীনরা প্রত্যেকটি ইসলামী সমাজের নিকট আদর্শ। এ জন্য প্রত্যক্ষ আদর্শের প্রয়োজন, আর তা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দীন ইসলাম। এই কারণেই ইসলাম ফরয করেছে যে, প্রতিটি পরিবার মুসলিম বাবা ও মা সমন্বিত হতে হবে। তারা হবে ইসলামী নৈতিকতার ধারক ও বাহক। কেননা যে পরিবার ইসলামী আদর্শ অনুসারী নয়, সে পরিবারের শিশুদের ইসলামী চরিত্রে ভূষিত হওয়া সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় ইসলামী শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের সূচনা কেন্দ্র হচ্ছে ইসলামী পরিবার। এই পরিবারই অপরাধ প্রতিরোধ করবে—তার সীমা সংরক্ষিত করবে সূতিকাগার থেকেই। এই পরিবারে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হচ্ছে পিতা—স্বাভাবিকভাবেই যদিও তা পালন করবে বাবা ও মা মিলিতভাবে। কিন্তু কর্তা ও পরিচালক হবে পুরুষ—পিতা।

কুরআনের ঘোষণা ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

মেয়েদের উপর পুরুষরাই কর্তৃত্বশীল হবে।

অতএব নারী ও পুরুষ সমন্বিত একটি পরিবারে পুরুষই হবে প্রথম দায়িত্বশীল। দায়িত্বশীল পরিবারের সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে, তাদের ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যাপারে।

দীন-ইসলামের অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে কুরআন মজীদের আক্ষরিক পাঠও ইবাদত বলে গণ্য। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা চান যে, মুসলিম মাত্রেরই হৃদয়মন এই কিতাবের শাব্দিক ঝংকারেও মুখরিত হয়ে থাক। তার ফলে এই কিতাব তার অতীব নিকটবর্তী সাথী হবে, সে নিজেও হবে তার চিরন্তনের সঙ্গী।

www.pathagar.com

এভাবে প্রথম আদর্শ রাসূলে করীম (সা)। তারপরে প্রথম মুসলিম সমাজ—সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনের জীবন চরিত। তারপরই আমাদের সম্মুখে আসছে এই মহান কিতাব। আমাদের যাবতীয় তৎপরতা চলবে তাকেই ভিত্তি করে। আমাদের চিন্তা চরিত্র ও কর্মকাণ্ড এরই আলোকে পরিচালিত হবে। আর এভাবেই ইসলামী সমাজের প্রথম বীজ হবে মুসলিম পরিবার। এই পরিবার তার সন্তানদের ইসলামের নৈতিক বিধানের উপর গড়ে তুলবে। তাদের প্রথম শিক্ষা হবে বাস্তব আদর্শের আলোকে। তার পরে আসবে উপদেশ-নসীহত। তবে তাই একমাত্র এবং সার্বক্ষণিক ব্যাপার হবে না। কেননা অনেক ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক উপদেশ-নসীহত বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই কারণে স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-ও প্রতিদিনই উপদেশ-নসীহত প্রদান করতেন না। আসলে শিশু সন্তানরা মৌখিক উপদেশ নসীহতের পরিবর্তে বাস্তব আদর্শে বেশি করে অনুপ্রাণিত হয়। বিশেষ করে পিতা-মাতার নিকট সন্তানরা বাস্তবে যা দেখতে পায়, তারা তারই অনুসরণ করে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। সন্তানদের উপর পিতা-মাতার একটা স্বাভাবিক কর্তৃত্বও থাকে। ফলে তাদের চারিত্রিক আদর্শ সন্তানদের মন-মগজে বেশি করে প্রতিফলিত হয়। অনুরূপভাবে শিক্ষকদের চরিত্রেরও প্রবল প্রভাব পড়ে শিক্ষার্থীদের উপর। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকদের নিকট থেকে বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীরা যা কিছুই শেখে, তা তাদের মন ও মগজে দৃঢ়মূল—বদ্ধমূল হয়ে থাকে। কাজেই পরিবারের প্রাথমিক ও সীমিত পরিসর থেকে শুরু করে শিক্ষাঙ্গণের শুরু থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের যদি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও লালনে ভূষিত করা যায়, তাহলে মুসলিম সমাজে অপরাধ বলতে কোন কিছুর অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। আর মানবীয় দুর্বলতা ও শয়তানের অব্যাহত প্ররোচনার দরুন কখনও কোন কিছু সংঘটিত হলে একে তো তা হবে সাময়িক দুর্বলতার এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং চেতনার উদ্রেকের সাথে সাথে অপরাধী নিজেই তওবা করে তা থেকে বিরত হবে। এ ধরনের অপরাধ কখনই ব্যাপক ও সামাজিক ব্যাধির রূপ পরিগ্রহ করতে পারবে না।

বস্তুত ইসলামের আদর্শিক যুগের এটাই হচ্ছে শুভ ফলশ্রুতি। আর বর্তমান পতন যুগেও এই দাবি করা নিশ্চয়ই প্রগলভতা হবে না যে, প্রাচীন জাহিলিয়তের যুগের এবং আধুনিক জাহিলিয়তের সমাজের তুলনায় এখনকার পতনমুখী মুসলিম সমাজে অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতা তুলনামূলকভাবে নিতান্তই সামান্য। যেখানে যেখানে এই সামান্যও রয়েছে, তাও শুধু এই কারণে যে, তথায় ইসলামী সমাজ পূর্ণ বৈশিষ্ট্য সহকারে গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত নয়। ইসলামী সমাজ তার ব্যাপক বিশেষত্ব ও পরিবেশ মত পবিত্রতা সহকারে যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা'হলে আজও দুনিয়ার বুকে সম্পূর্ণভাবে অপরাধ মুক্ত সমাজ হতে পারে কেবল মাত্র মুসলিম সমাজ।

www.pathagar.com

অপরাধ দমনে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ-এর অবদান

দুনিয়ার জাতিসমূহ অপরাধ প্রতিরোধে প্রাণপণ চেষ্টা ও সংগ্রাম করে থাকে এবং সেজন্য তারা নানাবিধ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণেও এক বিন্দু দ্বিধা বোধ করে না। কেননা নিত্য সংঘটিত অপরাধ মানুষের নিরাপত্তা বোধকে ধ্বংস করে, মানুষকে প্রতি মুহূর্ত রাখে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে। নিরাপত্তাহীন সমাজে মানুষের মনে সব সময়ই একটা আতংক বিরাজ করে। কি জানি, কোন্ মুহূর্তে কি অঘটন সংঘটিত হয়ে পড়ে।

বস্তুত অপরাধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী। তা সমাজ জীবনে টেনে আনে চরম মাত্রায় দুর্ভাগ্য ও হতাশা। কেননা অপরাধ শান্তি ও নিরাপত্তাকে নির্মূল করে দেয়। অথচ এই শান্তি ও নিরাপত্তা বোধই হচ্ছে সামাজিক জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর। এই প্রশান্ত সমাজ জীবন সংরক্ষণের লক্ষ্যে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য জাতিসমূহ নানা উপায় ও পন্থার উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়। এজন্য নানা প্রকারের আইন-কানুন ও বিধি বিধান রচনা করে। সে সব আইন বিধানে তারা নানা প্রকারের ধারা-উপধারা সংযোজিত করে। সে জন্য প্রশাসনিক ও পুলিশী পাহারাদারীর বাস্তব ব্যবস্থাপনাও গ্রহণ করে। এই সব কিছুর মূলে লক্ষ্য থাকে অপরাধ প্রতিরোধ, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরে প্রবল প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করা যেন অপরাধ আদপেই সংঘটিত হতে না পারে।

অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুনিয়ার বিভিন্ন সমাজে সাধারণভাবে গৃহীত উপরোক্ত কর্মপন্থা সম্পর্কে একটু গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার-বিবেচনা করলেই একটি মাত্র সিদ্ধানেই উপনীত হওয়া যায়। আর তা হচ্ছে, এই সব আইন-বিধান এবং সেজন্য গৃহীত প্রশাসনিক কর্মপন্থাসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর কিংবা তাৎক্ষণিকভাবে অপরাধ প্রতিরোধ করা, অপরাধ হতে না দেওয়া। বলা হয়, কোন একটা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হলে তা ভবিষ্যতে অনুরূপ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকের কাজ করে। কিন্তু বাস্তব ঘটনায় এই কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুদীর্ঘ কাল ধরে বারবার সংঘটিত একই ধরনের ঘটনাবলীর বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, অপরাধের শুধু শাস্তি বিধান অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর শুধু অপরাধীকে শাস্তি প্রদানই অপরাধ বিস্তার ও পুনরাবৃত্তি সাধনকে রুখতে পারে না, তেমনি অন্যদেরকেও শুধু তা-ই অপরাধ সংঘটন থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয় না।

www.pathagar.com

অপরাধী অপরাধ সংঘটনের জন্য যেমন একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করে নেয়, তেমনি তার অনিবার্য শাস্তি এড়ানোর জন্যও অনেক সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। অপরাধ তদন্তকারীরা যাতে করে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে পেতে না পারে এবং এই অপরাধের বিচার করাও যাতে করে অপরাধীর উপর দণ্ডারোপ ও কার্যকর করতে সক্ষম না হয়, সেজন্য সম্ভাব্য সর্ব প্রকারের কৌশল গ্রহণেও এক বিন্দু পিছ্ পা হয় না। ধরা পড়ে গেলেও যাতে করে আইনের মারপ্যাঁচ ও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম আইনের বিশ্লেষণের সাহায্যে সে দণ্ড থেকে রক্ষা পেয়ে যেতে পারে, তার জন্য একালে কলাকৌশলের এক বিন্দু কম নেই। রকমারি অপরাধের উদ্ভাবন যেমন একালের বৈশিষ্ট্য, তেমনি আইনের চোখে ধূলি দিয়ে দণ্ড এড়ানোর উপায় উদ্ভাবনেও এ কালের অবদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এটা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি এবং এই দিকে ইঙ্গিত করেই মানুষের স্রষ্টা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَ كَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً

কিন্তু মানুষ খুব বেশি ঝগড়াটে ও বিতর্ককারী হয়ে দাঁড়িয়েছে।—সূরা কাহ্ফ ঃ ৫৪

مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ جَدِلُوْنَ

ওরা এসব দৃষ্টান্ত তোমার সম্মুখে নিয়ে এসেছে নিছক কুটতর্কের উদ্দেশ্যে। আসলে ওরা লোক খুব ঝগড়াটে। —সূরা যুখরুফ ঃ ৫৮

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অপরাধ প্রতিরোধে সফল এমন অনেক উপায় ও পন্থাই রয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও আধুনিক মানব সমাজ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও অবহিত নয়। এই কারণে তারা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করছে না। আর এ পর্যায়ে চেষ্টা-প্রচেষ্টা যতই তারা চালাচ্ছে, সবই একের পর এক ব্যর্থই হয়ে যাচ্ছে।

অপরাধ দমনের জন্য অতীব সফল ও অধিকতর কার্যকর যে পন্থার দিকে এই মাত্র ইঙ্গিত করা হলো তা হচ্ছে অপরাধ সংঘটিত হতে না দেওয়ার কার্যক্রম। এমন উপায় অবলম্বন যার দরুন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আশংকাই থাকে না। অথবা খুবই কম আশংকা থাকবে এবং অপরাধের মাত্রা খুবই কম হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি, অপরাধ সংঘটিত হলেও সাধারণ নিরাপত্তাহীনতা ও আতংক সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া নিঃশেষ হয়ে যাবে। বস্তুত শুধুমাত্র মানবীয় চিন্তা-গবেষণা উদ্ভাবন এমন সম্যক আইন বিধান রচনায় সম্পূর্ণ অক্ষম, যা অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে মানবতার জন্য একমাত্র বিকল্প হয়ে দাঁড়াতে পারে। অভিজ্ঞতা অর্জনে দীর্ঘাতিদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে মানুষের উপর দিয়ে কিন্তু মানুষ অপরাধ দমন প্রচেষ্টায় এক বিন্দু সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

এরূপ অবস্থায় মানবতার জন্য একমাত্র করণীয় হচ্ছে মহান আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন। কেননা ভাল-মন্দ সমন্বিত এই মানুষের তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। মানুষ তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান এবং কল্যাণ পথের দিশা একমাত্র তাঁরই নিকট থেকে

www.pathagar.com

লাভ করতে পারে। অপরাধ দমনে তাঁর ঐকান্তিক সাহায্য মানুষের জন্য একান্তই অপরিহার্য। আগেই বলেছি, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই—এমনকি তার পরেও দমন করতে মানবীয় আইন রচনা ও কার্যকর ভিত্তিক যাবতীয় চেষ্টা সাধনাই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গেছে। মানুষ অপরাধের শাস্তি বিধানের আইন অনেক রচনা করেছে কিন্তু তা অপরাধ প্রবণ লোকদের মধ্যে অপরাধ বিমুখতা—অপরাধের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। তার প্রমাণ এত সব আইন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া কার্যকর থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মাত্রা নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যাওয়া। এমনকি যারা একবার অপরাধ করে আইনের বিচারে দণ্ডিত হয়েছে, তারাও অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে দ্বিধান্বিত হচ্ছে না। প্রচলিত আইনে অপরাধের দণ্ড সাধারণত জেল-হাজতই হয়ে থাকে। কিন্তু একথা সকলেরই মুখে মুখে যে, চোর-ডাকাত খুনী জেল থেকে ফিরে আসতে পারলে সে হয় বড় চোর, ভয়ানক ডাকাত এবং অধিকতর নির্মম খুনী। কেননা অপরাধ করার পর আইনের বিচারে তারা যে শাস্তি ভোগ করেছে, তা তাদের মন-মগজে ও মেজাজের উপর একবিন্দু দাগ কাটতে পারেনি। মূল প্রকৃতিতে নিহিত অপরাধ প্রবণতা নির্মূল হয়নি। শুধু তা-ই নয়। তা সতেজ বৃক্ষের মত শক্ত কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে।

আসলে মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ কিসে তা তাঁর মত আর কেই-ই জানে না, জানতে পারে না। তাই তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণকে সামনে রেখে নিজেই আইন প্রণয়ন করে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে নাযিল করেছেন। এই পর্যায়ে দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলতে চাই।

একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে চোরের হাত কাটার ব্যাপার। শরীয়ত আরোপিত শর্তসমূহের ভিত্তিতে চুরি প্রমাণিত হলে অবশ্যই চোরের হাত কাটতে হবে। আল্লাহ্ অন্য যে কোন সৃষ্টির তুলনায় মানুষের প্রতি অধিকতর দয়াশীল। তিনি চোরের জন্য যে শাস্তি বিধান করেছেন, তাতে মানুষের সার্বিক কল্যাণই বিধৃত, অকল্যাণের লেশমাত্র নেই এ'তে। কিন্তু একালের আইন রচয়িতাগণ চুরি অপরাধের জন্য এই দণ্ড অগ্রাহ্য করেছে। তার পরিবর্তে তারা যে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, তা মানুষকে সংশোধন করতে ও চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়নি। সে শাস্তি এই অপরাধের অবসান ঘটাতেও পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের একবিন্দু বোধোদয় হচ্ছে না।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ফৌজদারী অপরাধের শাস্তি অনুরূপ ঘটনা ঘটানো।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ

তোমরা যুলুম করবে না, তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না।

—সূরা বাকারা ঃ ২৭৯

www.pathagar.com

অর্থাৎ ফৌজদারী অপরাধের শাস্তি হবে অপরাধের সমান। অপরাধ যা, তার শাস্তিও তাই। তাতে কোনরূপ যুলুম হওয়ার আশংকা বা অবকাশ থাকবে না।

সন্দেহ নেই, এমন বহু লোকই রয়েছে যারা চুরি ও দেহের ক্ষতিসাধনের অপরাধ থেকে বিরত থাকতে পারে বলে মনে করা যায় কেবল মাত্র তখন, যদি তারা তাদেরও অনুরূপ অঙ্গহানি বা কিসাস হওয়ার ভয়ে ভীত হয়।

মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট অতীব সম্মানার্হ সৃষ্টি। তাই তাদের সভ্য করে তোলার এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসার ব্যাপারটি এত কম সংখ্যক লোকের উপর ন্যস্ত করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত মনে করা যায় না, যারা তাদের বিশেষ অবস্থার সংশোধন সফল করতে সক্ষম হবে না। তাদের যাচাই করলে তাদের বিশেষ জীবনেই বহু সংখ্যক স্ব-বিরোধিতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নানা জটিল সমস্যা দেখা যাবে। এরূপ অবস্থায় মানুষের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব তাদের উপর কিছুতেই অর্পণ করা যেতে পারে না।

এই প্রেক্ষিতেই মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে তাঁরই সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নিকট যে মহামূল্য গ্রন্থ কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে, তার গুরুত্ব বিবেচ্য। মানুষের উপর দিয়ে বহু আবর্তন-বিবর্তন অতিবাহিত হওয়ার পরই সর্বশেষ পর্যায়ে এই মহান গ্রন্থখানি অবতীর্ণ হয়েছে। এর পূর্বে আরও যে সব গ্রন্থ নাযিল হয়েছিল তা যেমন বিশেষ লোকদের জন্য বিশেষ সময়ের মধ্যে সীমিতভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার লক্ষ্যে, সেই লোক ও কালের অবর্তমানে সে সব অপ্রয়োজনীয় যুগ-অনুপযোগী ও মানব সমস্যার সমাধানে অক্ষম প্রমাণিত হওয়ায় বাতিল হয়ে গেছে। অবশ্য তাতে যে সব স্থায়ী অক্ষয় ও সর্বকালীন মূল্যমান (Values) সম্বলিত নীতি আদর্শ ছিল এবং যা মানব প্রকৃতির বিবর্তনশীল প্রবণতার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল তা সর্বশেষ গ্রন্থে স্ব-মর্যাদা সহকারে সংযোজিত হয়ে শাশ্বত হয়ে রয়ে গেছে। এখনও তা অমোঘ ও চিরন্তন, যেমন অন্য নতুন বিধানসমূহ চিরন্তন ও অমোঘ। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নিম্নোদ্ধৃত দুইটি আয়াতে তা ঘোষণা করেছেন ঃ

حم تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ط كِتَابٌ فُصِّلَت ايتُه قُرْانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ٥
بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ٥

মহা দয়াবান ও অতিশয় মেহেরবানের নিকট থেকে অবতীর্ণ এই কিতাব। এর আয়াতসমূহ আলাদা আলাদা করে পেশ করা হয়েছে আরবী ভাষায় পঠনীয় করে সেই লোকদের জন্য যারা জানে, সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদাতা হিসাবে।

—সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ১-৩

الر كِتَابٌ اُحكِمَتْ ايتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ

www.pathagar.com

এ এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ সুদৃঢ় ও পরিপক্ক করা হয়েছে এবং পরে ভিন্ন ভিন্ন করা হয়েছে সুবিজ্ঞানী ও সর্ববিষয়ে অবহিত (মহান আল্লাহ্‌র) নিকট থেকে। —সূরা হুদ ঃ ১

বস্তুত কুরআনের আয়াত এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারী সুন্নাতের মূলের অকাট্য দলীলসমূহে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ও পরে তার প্রতিরোধের সমস্ত দিক সম্পর্কে বিপুল উপাদান সঞ্চিত হয়ে আছে। বিপুল সংখ্যক ইসলামী গ্রন্থেও রকমারি অপরাধমূলক ঘটনাবলীর সুবিন্যস্ত আলোচনা-পর্যালোচনার ও ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভান্ডার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। এখানে সেই সবকিছুর পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। আমি এখানে যে দিক নিয়ে আলোচনার অবতারণা করেছি, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিজের উপস্থাপিত 'আমর বিল মা'রূফ ও নিহী আনিল মুনকার'-এর বিষয়। মুসলিম উম্মাতকে লক্ষ্য করে তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল অবশ্যই এমন হতে হবে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাতে, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করণের কাজে সব সময়ই ব্যাপৃত থাকবে। —সূরা আল-ইমরান ঃ ১৫৪

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ اللهَ

তোমরাই হচ্ছ উত্তম জনসমষ্টি। তোমরা ভালো কাজের আদেশ কর মন্দ কাজ করতে নিষেধ কর এবং সর্বাবস্থায়ই ঈমান রাখো আল্লাহ্‌র প্রতি।—সূরা আল-ইমরান ঃ ১১০

আল্লাহ্‌ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে ঃ

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى وَ لاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ه وَ اتَّقُوْا اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (المائده – ٢)

তোমরা পরস্পরের সাহায্য কর পূণ্যময় কল্যাণ ও আল্লাহ্‌র ভয়সম্মত। কাজে-কর্মে এবং কোনরূপ পারস্পরিক সাহায্যে এগিয়ে আসবে না গুনাহ, পাপ অন্যায় ও সীমালংঘনমূলক কার্যাদিতে। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কঠিন আযাব প্রদাতা। —সূরা মায়্যিদা ঃ ২

ইসলামী ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে বায়'আতে আকাবা।[১] তাতেও 'ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ' এর উপর অকাট্য দলীলের উল্লেখ হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

১. মদীনার আউস ও খাজরায বংশের লোকেরা হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় এসে রাসূলের হাতে দীন ইসলাম কবুলের বায়'আত করেছিলো মিনার দিকের এক পর্বত গুহায় হিজরতের পূর্বে এই বায়'আত দুইবার অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

আমরা বললাম, হে রাসূল ; আমরা আপনার হাতে কি বিষয়ের উপর বায়'আত করব ? বললেন ঃ

علي السمع و الطأعة فى النشاط و الكسل و على الامر بالمعروف و النهى عن المنكر –

তোমরা আমার হাতে বায়'আত করবে শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য খুশি ও অখুশি সকল অবস্থায়ই। এবং ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ নিষেধকরণের বিষয়ে।

আমর বিল মারূফ-এর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জনসাধারণের হৃদয়-মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়প্রত্যয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ইহকালীন কার্যকলাপের প্রতিদান দেওয়ার জন্য জান্নাত, জাহান্নাম, কবর জীবনের আযাব বা নিয়ামতসমূহের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহ্র রোষ-অসন্তোষ কিংবা তাঁর সন্তুষ্টির উপর ভিত্তি করেই নির্ণীত হয় বান্দার পরকালীন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য। এই বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে 'আমর বিল মারূফ' ও নিহী আনিল মুনকার'-এর ভূমিকা অত্যন্ত প্রকট ও প্রবল। ফলে অপরাধ পরিহার করে চলার প্রবণতা এই বিশ্বাস থেকেই উৎসারিত হয়। অপরাধ করার ইচ্ছা কারুর মনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেই এই বিশ্বাস ও প্রত্যয় তার পথে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। সেদিকে এক পা অগ্রসর হওয়াও আর সম্ভব থাকে না। বস্তুত অপরাধ দমন—অপরাধ সংঘটিত হতে না দেওয়ার ব্যাপারে এ এক কার্যকর ও সফল প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক, সন্দেহ নেই। অতএব অপরাধের পথে এই প্রত্যয় সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার সাথে মানব রচিত আইনের প্রতিবন্ধকতার কোন তুলনা-ই করা চলে না।

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর কর্মফল প্রদান ব্যবস্থার প্রতি বর্ণিত বিশ্বাস সব মানুষের মনে সমানভাবে প্রবল হয়ে থাকে না। কোন কোন লোক অত্যন্ত দুর্বল ঈমানের ধারক হয়ে থাকে। ফলে যে প্রবল অপরাধ প্রবণতার কাছে অনেক সময় পরাজিত হয়ে অপরাধ ঘটিয়ে থাকে। অথবা এমন সব কার্যকলাপের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়ে যার পরিণতিতে অপরাধ করাটা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই তত্ত্বটি প্রকট করে তোলার জন্য এখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

মদ্যপানের পরিণতি অত্যন্ত খারাপ—একথা সর্বজনস্বীকৃত। হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) তা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের পূর্বের এক সমাজের একটি লোককে বলা হলো, তুমি এই যুবককে হত্যা কর, না হয় এই মেয়েলোকটির সাথে যিনা কর। আর তা-ও করতে রাযি না হলে তোমার সম্মুখস্থ এই মদ্য পান কর। লোকটি ভাবল, যুবকটিকে শুধু শুধুই হত্যা করতে বলা হচ্ছে। অথচ সে তো কাউকে হত্যা করেনি। এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করা মহা গুনাহের কাজ হবে। আর যিনা করতে বলা হয়েছে, কিন্তু তা খুবই লজ্জাকর ও নির্লজ্জ চরিত্রহীনতার কাজ

www.pathagar.com

হবে। তার তুলনায় বরং মদ্যপান অনেক সহজ কাজ। অতঃপর সে মদ্যপান করল। তাতে সে মাতাল হলো ও বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। ফলে সে যুবকটিতে হত্যা করল প্রথমে এবং পরে মেয়েলোকটির সাথে যিনাতেও লিপ্ত হল।[১] এই কারণে মদ্যকে 'উম্মুল খাবায়েছ'—সকল অন্যায় ও পাপ কার্যের মৌল উৎস বলা হয়। আর সকল প্রকার অন্যায়, দুর্নীতি ও পাপ কাজ বন্ধ করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম এই মদ্য পানকেই নিষিদ্ধ করতে হবে।

বস্তুত আমর বিল-মারূফ ও নিহী আনিল মুনকার' এই মদ্যপান, মদ্য উৎপাদন বা আমদানী, মদ্য উৎপাদকের সহিত সহযোগিতা-সাহচর্য, মদ্য ব্যবসায়, মদ্য বিক্রয় ইত্যাদি সবই বন্ধ করে দেয়। ইসলামী শরীয়তে এসব কাজকে চূড়ান্তভাবেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যেসব উচ্চতর মূল্যবোধের ফলে সমস্ত প্রকারের অপরাধ দমিত হতে পারে, আমর বিল্-মা'রূফ ও 'নিহী আনিল মুনকার' সেই মুল্যবোধকেই মানুষের মনে জাগ্রত ও সক্রিয় করে তুলে। কিন্তু মানব রচিত আইন সেই মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে কখনই পারে না। অপরাধ প্রতিরোধে আল্লাহ্‌র শরীয়তের মহান অবদান হচ্ছে এই ব্যবস্থা। 'আমর বিল্ মা'রূফ ও 'নিহী আনিলী মুন্‌কার'-এর বড় দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের চরিত্র ও ইজ্জত রক্ষা করা। আর অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণেই যে মানুষের ইজ্জত ও চরিত্রের পতন ঘটে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুন্‌কার'-এর চরিত্র ও মান-সম্মান সংরক্ষণ পর্যায়ের বড় কাজ হচ্ছে মূলতই কোন অপরাধ যেন সংঘটিত হতে না পারে, অপরাধ হওয়ার কারণসমূহই যেন নির্মূল হয়ে যায় এবং তার ফলে যেন মান-মর্যাদা বিনষ্ট হওয়ার মত ঘটনাও সংঘটিত না হয়।

ভিন্ পুরুষের সম্মুখে স্ত্রীলোকদের নগ্নতা-উলঙ্গতা সহকারে বের হতো নিষেধ করা হয়েছে। এই নিষেধটিও উপরোল্লিখিত দৃষ্টিকোণে বিবেচ্য। বলা হয়েছে ঃ

وَ لاَ تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الاُوْلى

আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে তোমরা ভিন্ পুরুষের সামনে বেরোবে না, যেমন করে জাহিলিয়তের যুগে মেয়েরা বের হতো। —সূরা আহযাব ঃ ৩৩

আরও বলা হয়েছে ঃ

وَ لاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَاءِ هِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

১. কেননা Wine and Woman—মদ ও নারী অবিচ্ছেদ্য। যেখানে একটি আসবে সেখানে অপরটি অবশ্যই আসবে।

www.pathagar.com

এবং তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, পুত্র-সন্তান, স্বামীর পুত্র-সন্তান, তাদের ভাই, ভাই পুত্র, তাদের বোনের পুত্র বা তাদেরই মত স্ত্রীলোক অথবা তাদের ক্রীতদাস, কিংবা অধীন যৌন তাকীদহীন পুরুষ বা স্ত্রীলোকদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে ধারণাহীন বালকদের ছাড়া অপর কারুর সামনে যেন তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। সেই সাথে তাদের পা যেন এমনভাবে নিক্ষেপ না করে, যার ফলে তাদের গোপন সৌন্দর্য লোকদের নিকট প্রকাশমান হয়ে পড়ে। —সূরা নূর ঃ ৩১

বলেছেন ঃ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ (النور – ٣٠) '(মেয়েলোকরা চলাফিরা করবে) নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশিত না করে।'

নারী দেহের সৌন্দর্য গোপন করে রাখার ও চলার এই নির্দেশ এবং তা ভিন্—গায়ের মুহরিম পুরুষদের সম্মুখে প্রকাশ করার এই নিষেধও ঠিক এই লক্ষ্যেই ঘোষিত হয়েছে, যেন তা দেখে পুরুষরা অপরাধের কাজে প্রবৃত্ত হয়ে না উঠে।

বস্তুত মুসলমানরা যদি এই উন্নতমানের নিষেধ ও নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে পালন করে বলে—নারী-পুরুষের মাঝে শরীয়তসম্মত পর্দা পুরাপুরি পালন করা হয়, তা'হলে স্বাভাবিকভাবেই এই পর্যায়ের অপরাধ খুবই বিরল হয়ে যাবে। যদি কোথাও এই বিধান লংঘিত হতে থাকে, তা'হলে 'আমর বিল্ মারূফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' বিভাগীয় লোকজন তা কঠোর হস্তে দমন করবে, তা হতে দেবে না। তাদের এই কার্যক্রম ও প্রকারান্তরে অপরাধ দমনের কাজকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও কার্যকর করে তুলবে।

গায়র মুহরিম স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করে ইসলামে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَ الدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ

তোমরা ভিন্ মেয়েলোকদের মধ্যে ঢুকে পড়া থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

সাহাবীগণ বললেন, হে রাসূল, দেবরকে দেখা দেওয়ার ব্যাপারে আপনার রায় কি ? বললেন ঃ اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ দেবর তো মৃত্যু। অর্থাৎ দেবর নৈতিক দিক দিয়ে মৃত্যু ঘটাতে পারে। অতএব তাকে মৃত্যুবৎ ভয় করতে হবে এবং তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। তার সাথে অবাধে বা নিরিবিলিতে দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলামেশা করা চলবে না।

হাদীসে ব্যবহৃত اَلْحَمْوُ শব্দটির আসল অর্থ 'স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে কেউ। স্বামীর ভাই, বন্ধু, খালাতো-চাচাতো, মামাতো-ফুফাতো ভাইরাও এর মধ্যে গণ্য। তাই এদের 'মৃত্যু' সমতুল্য মনে করে এদের সহিত অবাধ মেলামেশা করা থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَا يَحِلُّ لِامْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مُحْرِمٍ

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ও পরকালের উপর কোন ঈমানদার কোন মহিলার পক্ষেই মুহারিম পুরুষের সঙ্গে ছাড়া বিদেশ সফরে যাওয়া কিছুতেই জায়েয নয়।

একজন সাহাবী বললেন, আমার স্ত্রী একাকিনী হজ্জ করতে চলে গেছে ; আমি যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিলাম বলে আমি তার সঙ্গে যেতে পারিনি। এই কথা শুনে নবী করীম (সা) বললেন ঃ

اِذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ

তুমি এক্ষুণি চলে যাও, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে থেকে হজ্জ পালন কর।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ اِلاَّ وَ كَانَ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

কোন ভিন্ পুরুষ নারী নিভৃতে একাকীত্বে মিলিত হলে শয়তান তথায় তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে ওয়াসওয়াসা দিবার জন্য উপস্থিত হয়।

হযরত উমর (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন নিরিবিলিতে এক মহিলার সাথে কথা বলছে। তিনি তখনই তাকে দোর্‌রা মেরে শায়েস্তা করে দিলেন। এ করে তিনি প্রকৃতপক্ষে 'আমর বিল্ মা'রুফ এবং 'নিহী আনিল মুন্‌কার'-এরই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। নারী পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি নীচু করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুরআন মজীদে এর মূলে নিহিত কারণ পর্যায়ে জনৈক আরব কবির একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট ঃ

نظرة فابتسامة فلام فكلام فموعد فلقاء

প্রথমে দৃষ্টি বিনিময়, পরে মুচকি-মিষ্টি হাসির প্রকাশ, পরে অভিবাদন, তারপরে কথাবার্তা, ওয়াদা তথা প্রতিশ্রুতি, আর শেষ কালে সাক্ষাতকার।

বস্তুব যে সমাজেই চরিত্রহীনতার কাজ ব্যাপক, তথায় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কঠিন আযাবসমূহ ক্রমাগত অবতীর্ণ হওয়া অবধারিত। হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لَمْ تَظْهَرُ فِى قوم الفاحشةُ حتى يعلنوا بها اِلاَّ نَشَى فيهم الطاعون و الاوجاع التى لم تكن فى اسلا فهم (ابن ماجه – بيهقى)

যে জনগোষ্ঠীর মধ্যেই নির্লজ্জতা প্রকাশমান, পরে তারা তারই ব্যাপক প্রচারেরও ব্যবস্থা করে, তথায় তার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ মহামারি, সংক্রামক রোগ এবং ক্ষুধা-দুর্ভিক্ষ এত প্রকট হয়ে দেখা দেবে, যা তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে কখনই দেখা যায়নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসের একটি অংশ ঃ

وَ لاَ فَشَى الزِّنَا فِىْ قَوْمٍ قَطُّ اِلاَّ كَثُرَ فِيْهِ الْمَوْتُ –

www.pathagar.com

যে জনগোষ্ঠীর মধ্যেই ব্যভিচার ব্যাপক হবে, তথায় মৃত্যুর আধিক্য ব্যাপক হয়ে দেখা দেবে। রাসূলে করীম (সা) আরও বলেছেন ঃ

اِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَ الرِّبَا فِىْ قَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلُّوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ –

কোন জনপদে ব্যভিচার ও সূদী কারবার ব্যাপক হলে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার আযাব টেনে আনবে।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلاَّ اَخَذُوْا بِالْفَنَاءِ

যে জনগোষ্ঠীর মধ্যেই ব্যভিচার ব্যাপক ও প্রকাশমান হবে, তারা নিজেরাই ধ্বংস হতে শুরু করবে।

হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

وَ لاَ تَظْهَرُ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ اِلاَّ سَلَّهَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ –

যে জনগোষ্ঠীর মধ্যেই নির্লজ্জতা প্রকাশমান হয়ে পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরই উপর মৃত্যু অবধারিত করে দেবেন।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

لاَ تَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيْهِم وَ لَدُ الزِّنَا فَاِذَا فَشَى فِيْهِمْ وَلَدُ الزِّنَا اَوْشَكَ اَنْ يُعَمَّهُمُ اللهُ –

আমার উম্মতের লোকদের মধ্যে অবৈধ সন্তানের প্রকোপ না হওয়া পর্যন্ত তারা মহা কল্যাণের মধ্যেই থাকবে। তাদের মধ্যে অবৈধ সন্তান যদি ব্যাপক হয়ে পড়ে তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে ব্যাপক আযাবে পরিবেষ্টিত করে দেবেন, তা অসম্ভব নয়।

উপরোদ্ধৃত হাদীসমূহে যেসব নির্লজ্জতার কাজ সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে, তার ব্যাপকতার অর্থ সেসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহের ব্যাপকতা। অর্থাৎ আসল ঘটনার পূর্বে এমন সব অগ্রবর্তী ঘটনাবলী অবশ্যই সংঘটিত হবে, যার ফলে উক্ত নিষিদ্ধ ঘটনাবলী সংঘটিত হবে। আর তা হচ্ছে নারীদের উলঙ্গ ও সুসজ্জিত হয়ে অবাধ উন্মুক্তভাবে ভিন্ পুরুষদের মধ্যে চলাফেরা করা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ধরাধরি, ইশারা-ইঙ্গিত, চুম্বন-মর্দন ইত্যাদি। আর এগুলি অতীব অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজ। 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুন্কার' বিভাগের কাজই হচ্ছে, এইগুলির প্রচলন হতে না দেওয়া, এসব সম্পর্কে জনতাকে সতর্ক করা। কেননা এগুলি হতে দেওয়ার পরিণতি চূড়ান্তভাবে পাশবিকতার সমর্থন এবং লোকদের সম্মুখে তা প্রকট হয়ে দেখা দেওয়া।

www.pathagar.com

আমরা মানুষের দুই ধরনের সমাজের কল্পনা করতে পারি। এক ধরনের সমাজ তা যেখানে মহান শরীয়তের বিধান পুরাপুরি কার্যকর। আর দ্বিতীয় ধরনের সমাজ তা, যেখানে তা হয়নি। যে সমাজে শরীয়তের অনুশাসন কার্যকর নয়, তথায় অপরাধ প্রবণতা যে কত প্রচণ্ড তা সহজেই অনুমেয়। পক্ষান্তরে যে সমাজে ইসলামী অনুশাসনসমূহ পুরাপুরি বাস্তবায়িত, সে সমাজ কতইনা পবিত্র, নিষ্কলুষ এবং সকল প্রকারের চরিত্রহীনতা থেকে মুক্ত। এক কথায় তা-ই হচ্ছে অপরাধ মুক্ত সমাজ।

উপরোক্ত বিধানগুলো হচ্ছে ইসলামের নেতিবাচক, নিবর্তনমূলক বা Preventive আইন, যা 'নিহী আনিল মুন্‌কার' পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু ইসলামের ইতিবাচক ও উৎসাহ প্রদানমূলক বিধান এ থেকেও অধিক গুরুত্বের অধিকারী। এসব আইনের শিরোনাম হচ্ছে 'আল-আমর বিল মা'রূফ—ন্যায় সত্য ও সুন্দরতম কার্যাবলীর নির্দেশ ও উৎসাহ দান। ইসলামের দৃষ্টিতে এই ইতিবাচক বিধানের গুরুত্ব নেতিবাচক বিধানের তুলনায় অনেক বেশি। তাই এর উল্লেখও প্রথম।

ইসলামের এ পর্যায়ের কাজ হচ্ছে, জনগণের মধ্যে উত্তম পবিত্র চরিত্রের প্রবণতা সৃষ্টি ও সেজন্য ব্যাপকভাবে উৎসাহ দান এবং সেই সাথে সকল প্রকার হীনতা-নীচতা নির্লজ্জতা পরিহার করার উদাত্ত আহ্বান। এই পথে লোকদের অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করার জন্য উভয় দিকের ধারক পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ, যেন মানুষ কোনক্রমেই অপরাধের মধ্যে পড়ে না যায়। কেননা একথা জানা-ই আছে যে, এই ব্যাপারটি যদি তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হতো, তাহলে তারা নিঃসন্দেহে নিজেদের বড় ক্ষতি সাধান করত। গোট জাতি বা জনসমষ্টি তাদের কৃত অপরাধে জর্জরিত হয়ে পড়ত। এই কথা বোঝাবার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা অতীতকালের একটি জনসমষ্টি সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, যারা আমর বিল মা'রূফ-এর কাজ সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল, প্রত্যাহার ও প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর তারই ফলে তাদের উপর অভিসম্পাত এসেছিল। এই সংবাদ দানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাদের মত কার্যপদ্ধতি ও আচার-আচরণ গ্রহণের স্পষ্ট নিষেধ।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ٥ كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

বনী ইসরাঈল বংশের যেসব লোক কুফরী অবলম্বন করেছিল, তাদের উপর দাউদ ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার মুখে অভিশাপ বর্ষণ করানো হয়েছে। তার কারণ ছিল এই যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং তারা প্রায়ই সীমালংঘনমূলক কার্যকলাপ করতে থাকত। আর তার আসল কারণ এই ছিল যে, তাদের লোকেরা যেসব অন্যায় কাজ করত, তা থেকে তারা পরস্পরকে বিরত রাখতে চেষ্টা করত না—কেউ কাউকে নিষেধ করত না। আসলে তাদের এই কাজটিই ছিল অত্যন্ত খারাপ পরিণতির উদ্ভাবক। —সূরা মায়িদা ঃ ৭৮-৭৯

www.pathagar.com

রাসূলে করীম (সা) যখন এই আয়াতটি পাঠ করে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে শুনিয়েছিলেন এক-একটি বাক্য করে, তখন তিনি সাথে সাথে এই কথাও বলেছিলেনঃ

لاَ وَ اللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ السَّفِيْهِ وَ لَتَطْرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اطْرًا اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ اَنْ يَّعُمَّكُمْ بِعِقَابٍ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ –

না, না, এটা ভালো নয়। আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে লোকদের নিষেধ করবে—বিরত রাখবে নির্বোধের হাত ধরে ফেলবে এবং তাকে সত্য নীতির উপর শক্তভাবে দাঁড় করিয়ে রাখবে। নতুবা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে আযাবে পরিবেষ্টিত করে ফেলবেন। পরে হাজার ডাকলেও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না।

মূলত 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুন্‌কার'-এর কাজটি একটি ঢাল বিশেষ। তা বড় বড় অপরাধ সংঘটনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক ও প্রতিরোধক। রাসূলে করীমের (সা) নিম্নোক্ত রূপক ও উপমামূলক ঘটনা থেকেও তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। কথাটি এই ঃ

আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমাসমূহ রক্ষা করে যে চলে এবং যে তা লংঘন করে এই দুই-জনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, অনেক গুলো লোক একত্রে একটি দ্বিতল নৌকাযোগে সমুদ্র যাত্রা করেছিল। তাদের কিছু লোক ছিল নিচের তলায় এবং অপর কিছু লোক বসেছিল উপর তলায়। পানির ভাণ্ডার ছিল উপর তলায়। নিচের তলার লোকেরা পানির প্রয়োজনে উপর তলায় আসা-যাওয়া করত। তাতে উপর তলার লোকেরা খুবই উত্ত্যক্ত ও অস্বস্তি বোধ করল। তা দেখে নিচ তলার লোকেরা বলল, হ্যা আমরা যদি নৌকার তলায় ছিদ্র করে পানি গ্রহণ করি, তা'হলে আর আমাদের কারুর উপর তলায় যাতায়াতের প্রয়োজন পড়বে না। এক্ষণে উপর তলার লোকেরা যদি নিচতলার লোকদিগকে নৌকার তলায় ছিদ্র করা থেকে শক্তভাবে বিরত রাখতে পারে, তা'হলে সকলেই বেঁচে যাবে। আর তারা যদি ওদের ইচ্ছার উপরই ছেড়ে দেয় ব্যাপারটি, তা'হলে নৌকারোহী সকলেই ডুবে মরবে।

ইসলামের এই প্রতিরোধমূলক ও উৎসাহদানমূলক বিধান অত্যন্ত স্পষ্ট। ইসলাম ঘোষিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারের সহিত এ আইনের কোন বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই। মুসলিম জাহানের অনেকেই ইসলাম প্রদত্ত ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের ভুল অর্থ বুঝেছেন। আর তার এই ভুল অর্থ বোঝানোর দরুন তারা 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নিহী আনিল মুন্‌কারের'-কাজটি প্রত্যাহার করেছে, আসলে ইসলাম ঘোষিত ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থ সমষ্টিকে ধ্বংসের আয়োজন করার অধিকার নয়। সে অধিকার কখনই এবং কাউকেই দেওয়া হয়নি।

'ভালো'র আদেশ' ও 'মন্দের নিষেধ' সংক্রান্ত উপরোক্ত বিধান মুসলিম সমাজে সদ্য কার্যকর রয়েছে। ফলে সে সমাজ চিরন্তন শান্তি ও নিরাপত্তায় ধন্য হয়ে রয়েছে চিরকাল।

www.pathagar.com

'ভালো'র আদেশ' ও 'মন্দের নিষেধ'-এর শুভ ফল ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে—একথা স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-ই বলেছেন। তাঁর ইসলামী দাওয়াতের সেই শুভ সূচনাকাল, সাহাবীদের সংখ্যা তখনও খুবই অল্প। তাঁদের উপর কাফিরদের অত্যাচার নিপীড়নের করুণ কাহিনী রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট বর্ণনা করেছিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করেছিলেন ঃ

وَ اللهِ لَيُتَمَنَّ اللهُ هذَا الاَمْرَ حَتَّـى يَسِيْرُ الرَّاكِـبُ مِـنْ صَنْعَـاءَ اِلَـى حَضَـرَ مَـوْتَ لاَ يَخَافُ اِلاَّ اللهَ وَ الذِّئْبُ عَلى غَنَمِهِ –

'আল্লাহ্‌র নামে শপথ ! আমার আরব্ধ এই ইসলামী বিপ্লবের কাজটিকে তিনি অবশ্যই পূর্ণপরিণত ও সম্পূর্ণ করবেন। ফলে এমন নিরাপত্তা সর্বত্র বাস্তবায়িত হবে যে, একজন পথিক 'সামা' থেকে হাজারা মাউত পর্যন্ত একাকী চলে যাবে ; কিন্তু তাতে সে কিছু মাত্র ভয় পাবে না—আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেই তাকে ভয় করতে হবে না। অবস্থা এমন হবে যে, বাঘে-শৃগালে এক সাথে বিচরণ করবে।

হাতেম তাই পুত্র আদী (রা) ইসলাম কবুল করলে নবী করীম (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হয়ত তুমি ইসলাম কবুল করতে বিলম্ব করেছ শুধু এই কারণে যে, তুমি দেখতে পাচ্ছিলে, ইসলামের দুশমনদের সংখ্যা অনেক বেশি, আর ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের সংখ্যা অনেক কম ?

فَوَ اللهِ لَيُوْشَكَنَّ اَنْ تَسْمَعَ بِالْمِرْءَةِ تَخْرُجُ مِنَ الْقَادِسِيَةِ عَلى بَعِيْرِهَا حَتَّى تَزُوْرَ هـذَا الْبَيْتَ مَا تَخَافُ عَلَى مَطِيَّتِهَا الْبَسَرْتَةَ

আল্লাহ্‌র নামের শপথ করে বলছি, খুব শীঘ্রই তুমি শুনতে পাবে, একটি মেয়েলোক কাদেসিয়া থেকে তার উষ্ট্রযানে সাওয়ার হয়ে মদীনার এই ঘর পর্যন্ত চলে আসবে ; কিন্তু এই দীর্ঘ পথের মধ্যে সে তার সওয়ারীর চুরির ভয় করবে না।

আদী বলেন ঃ এই কথা শুনে আমি মনে মনে ভাবছিলাম, তা-ই যদি হয়, তাহলে তখন 'তাই' গোত্রের চোরদের অবস্থা কি দাঁড়াবে ?

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসলিম উম্মত 'আমর বিল মা'রূফ-এর দায়িত্বের প্রতি যখনই উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে, আল্লাহ্‌র শরীয়তকে সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়িতকরণের দায়িত্ব পালনে অনীহা বা অবজ্ঞা দেখিয়েছে, তখনই সমাজ ক্ষেত্রে নানাবিধ অপরাধ প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। আর তা খুবই স্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যশীল পরিণতি তাতে একবিন্দু সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ ও ঘোষণা কতই না সত্য !

اَنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ٥

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কোন জনসমষ্টির অবস্থা পরিবর্তন করে দেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করছে।

বস্তুত যখনই ঈমান শক্তিশালী হবে এবং ইসলামী শরীয়ত সাধারণভাবেই বাস্তবায়িত হবে আর তার ফলে সমাজের ক্ষেত্রে আমর বিল-মা'রূফ-এর কাজ পুরাপুরি কার্যকর হলো, তখনই মানুষ সর্বপ্রকারের শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে এবং যাবতীয় অপরাধের উৎপাত ও নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এই কথার ঘোষণা দিয়েছেন কুরআন মজীদে ঃ

وَ عَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ وَ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ۰ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ۰

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যকার ঈমানদার, নেক আমলকারীদের পৃথিবীতে খলীফা বানাবার ওয়াদা করেছেন যেমন তাদের পূর্ববর্তী লোকদের খলীফা বানিয়েছেন, এ-ও ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের সেই দীন সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং এ-ও ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের ভয়-ভীতি পরিবর্তন করে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করবেন, তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সহিত কোন একবিন্দু জিনিসও শরীক করবে না। অতঃপর যারাই কুফরী নীতি অবলম্বন করবে তারা নিঃসন্দেহের সীমালংঘনকারী।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, মুসলিম উম্মাতের যে সমাজটিতে আমর বিল মা'রূফ ও নিহী আনিল মুন্‌কার প্রধান্য পাবে—অধিকতর গুরুত্ব সহকারে সদা কার্যকর হয়ে থাকবে, সে সমাজে শান্তি নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা যথাযথভাবে বর্তমান থাকবে। এই কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য অকাট্য দলীলপত্র খুব বেশি নিয়ে আসলে এ আলোচনাটি অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবে একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, দুনিয়ার যে দেশেই ইসলামী শরীয়ত পুরাপুরি বাস্তবায়িত হবে, তথায় সকল প্রকারের অপরাধ-ই হয় নির্মূল হবে, কম পক্ষে হ্রাস পাবে।

কিন্তু সেই সাথে দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, দুনিয়ায় ধর্ম হিসাবে ইসলামে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা কিছু মাত্র কম নয়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানও রয়েছে বহু কয়টি দেশে। কিন্তু ইসলামকে তারা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করছে না। ফলে সেসব দেশে ও দুনিয়ার অন্যান্য অনৈসলামী দেশের মতই অপরাধের মাত্রা দিন

www.pathagar.com

দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এসব দেশ ও দেশের মুসলিম জনতা কার্যত এই কথাই দুনিয়াবাসীদের সামনে পেশ করেছেন যে, ইসলাম শুধু একটা ধর্ম হিসাবেই ভালো বটে ; কিন্তু তা মানুষের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অক্ষম। আর মুসলিমদের দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান। আসলে ইসলামের কিছু অংশ গ্রহণ এবং অপর কিছু অংশ বর্জন নিজের ইচ্ছা-কামনা-বাসনারই অনুসরণ মাত্র। আর স্বীয় ইচ্ছা-বাসনা-কামনা-ধারণা এমন একটা বৃত্ত, যার পূজা দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاءُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِىْ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ –

আল্লাহ্র নিকট থেকে আসা হিদায়েতকে বাদ দিয়ে যা'রাই স্বীয় ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করবে, তাদের চাইতে অধিক গুমরাহ আর কে হতে পারে ? এরা আসলে যালিম। আর আল্লাহ্ যালিম লোকদের হিদায়েত করেন না

ইয়াহুদীরা আল্লাহ্র কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান রেখে তদনুযায়ী কাজ করত। আর অপর অংশকে অবিশ্বাস করত। আল্লাহ্র নিকট এটা ছিল একটা কঠিন অপরাধ। তাই অপরাধের দরুন তারা ধর্মত্যাগী রূপেই চিহ্নিত হয়েছে আল্লাহ্র কালামে।

বলা হয়েছে ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ٥

তোমরা কি আল্লাহ্র কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান রাখো, আর কিছু অংশকে কর অবিশ্বাস ? জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ নীতি অবলম্বন করবে, তাদের নিশ্চিত শাস্তি হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং কিয়ামতের দিন তদের নিক্ষেপ করা হবে কঠিন আযাবের দিকে। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে গাফিল নন।

এই প্রেক্ষিতে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নে দুনিয়ার মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে কত বেশি তা আমাদের স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের জন্য যেসব অভূতপূর্ব ও অকল্পনীয় নিয়ামত ও সুখ-শান্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা তারা কেবল তখনই পাওয়ার অধিকারী হতে পারে। আর তা'হলে এই দুনিয়ার জীবনে তারা মহা সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে। দূর হতে পারে যাবতীয় ভয়-ভীতি, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা।

www.pathagar.com

অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামী বিধান

মহান আল্লাহ্ তাঁর সর্বশেষ রাসূল পাঠিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ হিদায়েত ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সহকারে। তিনি তাঁর তেইশ বছরের নবুয়তী জীবনে এই দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করেছেন। মুসলিম উম্মাতের কল্যাণে আদর্শগত ও বাস্তব ভাবে যা কিছু করা সম্ভব, তা সবই তিনি করে গেছেন। অতঃপর এমন কোন কল্যাণ অবশিষ্ট থাকল না, যার পথ তিনি দেখিয়ে যান নি এবং এমন কোন অন্যায় থাকল না, যা করতে তিনি নিষেধ করেন নি বা যার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে তিনি মুসলিম উম্মাহ্কে সাবধান ও সতর্ক করেন নি।

তিনি সব পাক ও পবিত্র জিনিস হালাল ঘোষণা করেছেন, সব খারাপ ও ক্ষতিকর জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছেন। সুবিচার ও ন্যায়পরতা এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন, সর্বপ্রকারের নির্লজ্জতা ও ঘৃণ্য জিনিস নিষিদ্ধ করেছেন। গোটা মুসলিম উম্মাহ্কে তিনি এমন এক উদার উন্মুক্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রেখে গেছেন, যার রাত্রি ছিল দিনের মতই আলোদ্ভাসিত। অতঃপর যে-ই তথায় বাঁকা পথ অবলম্বন করবে, সে-ই ধ্বংস হবে। আর যে লোক সিরাতুল মুস্তাকীম পরিহার করবে, তাঁর নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘন করবে—হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ করবে, তাকেই পরিবেষ্টিত করবে অপমানকর আযাব ও বিরাট রকমের লাঞ্ছনা ও অবমাননা। এই পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা হচ্ছে ঃ

وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَه يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَ لَه عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ٥

যে লোকই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তার নির্দিষ্ট সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকেই জাহান্নামে দাখিল করবেন, তথায় সে চিরদিনই থাকবে এবং তার জন্য স্থায়ী থাকবে অপমানকর আযাব।

—সূরা নিসা ঃ ১৪

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَا هُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِى وَ الْاَقْدَامِ.

অপরাধীরা চিহ্নিত ও পরিচিত হবে তাদের মুখাবয়বের লক্ষণ দ্বারা। অতঃপর তাদের মাথা ও পা সহ পাকড়াও করা হবে। —সূরা আর-রহমান ঃ ৪১

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُرٍ ٥ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ

www.pathagar.com

এই অপরাধী লোকেরা মূলত মারাত্মক রকমের ভুল ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে এবং তাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যে দিন তাদের উল্টাভাবে জাহান্নামে টেনে নেওয়া হবে, সে দিন তাদের বলা হবে ! এখন আস্বাদন কর জাহান্নামের লেলিহান শিখার স্বাদ। —সূরা কামার ঃ ৪৭-৪৮

রাসূলে করীম (সা)-এর উপস্থাপিত বিধানে অপরাধসমূহের শুধু পরকালীন শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়নি, বহু অপরাধের বৈষয়িক ও বাহিক্যক শাস্তির বিধানও দেওয়া হয়েছে পরকালীন শাস্তির পাশে পাশে ও সাথে সাথে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেসব অপরাধের পরকালীন শাস্তি জাহান্নাম, সেই অপরাধ থেকে মানুষ যাতে এই দুনিয়ায়ই বিরত থাকে, সেজন্য বৈষয়িক শাস্তিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলাম যুগপৎভাবে শাস্তি ও পরকালীন শাস্তির ব্যবস্থা করেছে সেসব অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে। কেননা—

إِنَّ اللهَ لَيَزَعُ بِالسُّلطَانِ مَا لاَ يَزَعُ بِالْقُرْآنِ

আল্লাহ্ তা'আলা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন দ্বারা এমন প্রতিরোধ গড়েন, যা কুরআনের নসীহত দ্বারা সম্ভব হয় না।

ফলে যার হৃদয়-মন পরকালীন ভয়-ভীতি অধিক তীব্র হবে সে তার ভয়ে এবং যার মনে ইহকালীন শাস্তির ভয় অধিক অনুভূত হবে, যে তার ভয়ে অপরাধ থেকে দূরে সরে থাকবে। অপরাধ দমনে ইসলামের এই অবদান দৃষ্টান্তহীন।

শাস্তিই অপরাধ প্রতিরোধের একমাত্র হাতিয়ার নয়

সমাজ সমষ্টিকে অপরাধমুক্ত করার জন্য ইসলাম নিছক বৈষয়িক বা পরকালীন শাস্তিরই ব্যবস্থা করেনি। ইসলামী শরীয়ত ও তার শিক্ষা যে লোকই অনুধাবন করবে, সে-ই উপরোক্ত কথার যথার্থতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তাকে অংকুরে বিনষ্ট করতে ইচ্ছুক। এ কারণে ইসলাম মুসলিম ব্যক্তির চতুর্দিকে এক সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দিয়েছে, যা তাকে পাপের দিকে আকর্ষণ ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করবে। নিম্নোদ্ধৃত দিকগুলো অনুধাবনীয় ঃ

প্রথমত, ইসলামী শরীয়ত ব্যক্তি সংশোধন, ব্যক্তির মন পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ এবং তাকে সুন্দর ও নির্মল লালন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামের উন্নত মহান চরিত্রে বিভূষিত কতে সচেষ্ট। তার হৃদয়ে ঈমানের বীজ বপন করে তাকে কল্যাণমুখী বানিয়ে তার মধ্যে অপরাধ ও বিপর্যয় বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে দিতে চায়। আর প্রকৃত সঠিক ঈমান ও একনিষ্ঠ দৃঢ় প্রত্যয়-ই হচ্ছে সুদৃঢ় দুভেদ্য দুর্গ, নির্লজ্জতা ও হারাম কাজ অবলম্বনের বিরুদ্ধে এক শক্ত প্রতিরোধ। কেননা সে সিঃসন্দেহে জানে ও বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছুই করে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পুরাপুরি অবহিত। কারুর কোন অপরাধ লোকদের নিকট অজানা থাকলেও আল্লাহ্র নিকট তো কিছুই গোপন থাকে না এবং কেউ যদি

www.pathagar.com

অপরাধ করে দুনিয়ার আযাব থেকে নিস্তার পেয়েও যায়, তবু পরকালীন আযাব থেকে সে কিছুতেই নিষ্কৃতি পেতে পারে না। ঈমান-ই যে বড় বড় অপরাধ প্রতিরোধক, তা রাসূলে করীমের এই হাদীসটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি বলেছেন ঃ

لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ بِيْنَ يَزْنِىْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرِبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَنْتَهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهَ اَبْصَارَهُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ (بخارى بشرح : فتح البارى ج ١٢ ام ٥٩)

যিনাকারী যখন যিনা করে তখন সে ঈমানদার থাকে না, শরাব পান কালেও পানকারী ঈমানদার থাকে না এবং যে লুটপাট লোকেরা নীরবে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে তা যখন করে তখন সে ঈমানদার নয়।[১]

স্পষ্ট বোঝা গেল, এ হাদীস অনুযায়ী কোন ঈমানদার ব্যক্তিই ব্যভিচার করতে পারে না, মদ্যপান করতে পারে না এবং লুটপাটও করতে পারে না। করলে সে আর ঈমানদার থাকে না। কাজেই যার নিকট ঈমান জীবনের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ সে এসব অপরাধের কাছ থেকে অবশ্যই দূরে সরে থাকবে।

দ্বিতীয়ত, হারাম কাজ করা থেকে লোকদের দূরে রাখার জন্য অত্যন্ত খারাপ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। সে খারাপ পরিণতি মানুষের সম্মুখে ভয়াবহরূপে চিত্রিত করে পেশ করা হয়েছে। সে ভয়াবহ পরিণতি স্বভাবতই মানব মনে এমন তীব্র ভীতির সঞ্চার করে যে, সে কিছুতেই সেই খারাপ কাজের দিকে পা বাড়াতে সাহস পেতে পারে না।

যেসব লোক মুর্তাদ হয়ে দীনের সীমালংঘন করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الاٰخِرَةِ وَ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ٥

তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক মুর্তাদ হবে এবং কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, এই জাতীয় লোকদের যাবতীয় নেক আমল ইহ ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তারা হবে জাহান্নামী। সেখানেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে। —সূরা বাকারা ঃ ২১৭

মানুষ হত্যার বীভৎসতা ও জঘন্য অপরাধ হওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُه جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَه وَ اَعَدَّلَه عَذَابًا عَظِيْمًا

১. লুটপাট সংঘটিত হতে নীরবে দেখার কারণ, তা বন্ধ করার দায়িত্ব সচেতনতার অভাব কিংবা লুটপাটকারী লোকদের আক্রমণের ভয়।

www.pathagar.com

যে লোক কোন মু'মিন ব্যক্তিকে সংকল্প করে হত্যা করবে, তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম। চিরকাল থাকবে তথায়। আল্লাহ্ তার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন, অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তার জন্য খুব সাংঘাতিক আযাব নির্দিষ্ট ও প্রস্তুত করে রেখেছেন। —সূরা নিসা ঃ ৯৩

ব্যভিচার পর্যায়ে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَ مَا سَبِيْلاً

তোমরা যিনার নিকটেও যাবে না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও (যৌন লালসা পূরণের) খুবই খারাপ পথ। —সূরা ইসরা ঃ ৩২

وَ الَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلهًا اخَرَ وَ لاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَزْنُوْنَ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُّضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا اِلاَّ مَنْ تَابَ

যেসব লোক আল্লাহ্র সহিত অপর কোন ইলাহকে শরীক করে না, মানুষকে কিসাসের জন্য ছাড়া হত্যা করাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তা সে হত্যা করে না, ব্যভিচার করে না, (তারাই রহমানের বান্দা।) যে লোক তা করবে, সে বড় পাপের সম্মুখীন হবে, কিয়ামতের দিন তার আযাব দ্বিগুণ করা হবে, তাতে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরদিন থাকবে—তবে যে তওবা করবে (সে তা থেকে রক্ষা পাবে)।

—সূরা ফুরকান ঃ ৬৮-৭০

যিনার মিথ্যা দোষারোপ পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَ الاٰخِرَةِ

যেসব লোক ঈমানদার লোকদের সমাজে নির্লজ্জতাকে ব্যাপক প্রচার করতে ভালোবাসে ও পছন্দ করে তাদের জন্য তীব্র পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই। —সূরা নূর ঃ ১৯

আরও বহু ধরনের অপরাধকে হারাম ঘোষণাসহ বহু আয়াত কুরআন মজীদে উদ্ধৃত হয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে উপরোদ্ধৃত আয়াত কয়টি থেকেই মুর্তাদ বা মুসলমানের ইসলামের প্রতি ঈমান হারিয়ে ফেলা ও সেই অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, ইচ্ছা ও সংকল্প করে মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা, যিনা করা বা যিনার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা—তার কারণ উদ্ভাবন, শিরক করা এবং কারোর উপর যিনার মিথ্যা দোষারোপ করাও মুসলিম সমাজে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও জঘন্য চরিত্রের কাজ

www.pathagar.com

কর্মের ব্যাপক বিস্তার করা যে কোন ঈমানদার লোকদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নয়—তা করলে আর সে ঈমানদার থাকে না, তা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়তঃ ইসলামী শরীয়ত সকল ভালো পূণ্যময় আল্লাহ্‌ভীরুতামূলক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, পারস্পরিক কল্যাণ কামনা, সত্যের উপদেশ, ধৈর্য অবলম্বনের নসীহত এবং সকল পাপ, সীমালংঘনমূলক কাজ, অন্যায়, যুলুম ও বিপর্যয় প্রতিরোধে পারস্পরিক সহযোগিতা করার জন্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দিয়েছে।

বলা হয়েছে ঃ

وَ الْعَصْرِ ه اِنَّ الاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ه اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَا صَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَا صَوْا بِالصَّبْرِ ه

কালের শপথ ! নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত। শুধু তারা নয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং পারস্পরিক সত্য কাজের ওসিয়ত করেছে এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্য ধারণের। —সূরা আস্‌র

বলেছেন ঃ

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى وَ لاَ تَعوَانُوْا عَلَى الاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ

তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর সকল প্রকার কল্যাণময় ও তাক্‌ওয়াপূর্ণ কাজে এবং কোনরূপ সহযোগিতা করবে না পাপ গুনাহ্‌ ও সীমালংঘনমূলক কাজে।

—সূরা মায়িদা ঃ ২

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ بِقَلْبِهِ وَ ذٰلِكَ اَضْعَفُ الاِيْمَانِ ه

তোমাদের মধ্যে যে লোকই কোন অন্যায় ও পাপ-ঘৃণ্য কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা নিজ হস্তে ও শক্তির বলে ক্রমশ পরিবর্তন করে দেয়। যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে যেন মুখে তার প্রতিবাদ করে এবং তাও করতে সমর্থ না হলে অন্তর দিয়ে তাকে খারাপ জানবে। আর এই শেষোক্ত অবস্থা দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا

তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর সে যালিম হোক কি মযলুম।—মুসলিম, বুখারী

www.pathagar.com

আমি বললাম, যে রাসূল ! মযলুম ভাইর সাহায্য করার নির্দেশের তাৎপর্য তো বুঝতে পারলাম, কিন্তু যালিমের সাহায্য কিভাবে করব, তা বুঝতে পারলাম না। বললেন ঃ তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখবে, তা হলেই তাকে সাহায্য করা হবে।

বলেছেন ঃ

لَعَنَ اللهُ مَنْ اوى مُحْدِثًا

যে লোক বিদ'আত ও অন্যায়কারীকে আশ্রয় দেবে, আল্লাহ্ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। —মুসলিম

বলেছেন ঃ

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

দীন হচ্ছে সম্পূর্ণত কল্যাণ কামনা।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এই কল্যাণ কামনা কার জন্য ? বললেন ঃ

لِلّٰهِ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ –

এই কল্যাণ কামনা হচ্ছে আল্লাহ্র জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং সমস্ত মুসলিম জন-নেতাদের জন্য।

কুরআন ও হাদীসের এসব আদেশ ও বিধানের কারণে ইসলামী সমাজে অন্যায় বিরোধী চেষ্টা সাধনায় পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করে। সকলেই তার প্রতিরোধে উঠে পড়ে লেগে যায়। ফলে অন্যায় অপরাধকারী কোথাও একবিন্দু আশ্রয় পায় না। কেউ তাকে বিন্দু মাত্র সাহায্য বা সহযোগিতা করে না। ফলে ইসলামী সমাজে অন্যায়, যুলুম বা পাপ বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে না, দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে থাকে, প্রচ্ছন্ন ও নির্মূল হয়ে যায় এবং ন্যায়, কল্যাণময় ও ভালো-ভালো কাজ ব্যাপকতা লাভ করে।

এই দৃষ্টিতে যে লোক চোরকে, হত্যাকারীকে, ব্যভিচারীকে এবং এই ধরনের অপরাধীকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দিবে—যার উপর কোন হদ্দ্ বা আল্লাহ্ কিংবা বান্দার হক্ ধার্য হয়েছে—বুঝতে হবে সে লোকও অপরাধীর সহিত সম্যকভাবে শরীক রয়েছে।

চতুর্থতঃ ইসলামী শরীয়ত যখন কোন কাজকে হারাম ঘোষণা করে, তখন সেই কাজের সুযোগ করে দেয় বা অনিবার্য করে তোলে যে সব পথ, তা-ও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয়, সেই উপায় পথ ও পন্থাকেও হারাম ঘোষণা করে। যেসব প্রাথমিক অবস্থা ও কার্যাবলী সেসব হারাম কাজকে সহজ করে দেয়, সেগুলিও সাথে সাথে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন ইসলামে ব্যভিচার হারাম ঘোষিত হয়েছে। ফলে যেসব কাজ মানুষের মধ্যে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, নারী-পুরুষের যৌন মিলন ঘটায় বা ঘটানোকে সহজ করে দেয়, তা-ও হারাম ঘোষিত হয়েছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে,

www.pathagar.com

একজন যুবক একজন যুবতীর নিভৃত নির্জনে একত্রিত হওয়াকে হারাম করা হয়েছে। কেননা এ কাজের পরিণামে ব্যভিচার সংঘটিত হওয়া এক অনিবার্য ও অবধারিত ব্যাপার। কুরআন মজীদে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায় ও স্বভাব-প্রকৃতিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, সেসব কাজ বা অনুষ্ঠান, তা বন্ধ করার একটা স্থায়ী নিয়ম ঘোষিত হয়েছে।

ঠিক এ কারণেই মুহারিম সঙ্গী ব্যতীত কোন মহিলার পক্ষে একদিন এক রাত্রির দূরত্বের পথে সফরে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। কেননা তা করা হলে তথায় ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার আশংকা স্বাভাবিকভাবেই তীব্র হয়ে দেখা দেয়। এজন্যেই নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরস্পর থেকে দৃষ্টি বিরত ও নত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা দৃষ্টি বিনিময়ই অবৈধ যৌন মিলনের পথ উন্মুক্ত করে, যৌন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

মু'মিনদের বল, তারা যেন তাদের (কোন কোন) দৃষ্টি নিচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে। এই নীতি তাদের জন্য অতীব পবিত্র। তারা যা কিছু করে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে পূর্ণ অবহিত। —সূরা নূর ঃ ৩০

অপর এক আয়াতে মহিলাদেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে দৃষ্টি নিচু রাখার জন্য। তারও উদ্দেশ্য তা-ই, যা উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে। সেই সাথে মেয়েদের নিষেধ করা হয়েছে ভিন্ পুরুষদের সহিত কথোপকথন করতে, কথায় মিষ্ট, বিনম্র ও লালিত্যময় সুর মিশ্রিত করতে। কেননা তা করা হলে অসুস্থ মনোভাব সম্পন্ন লোকদের মনে কামনা জেগে উঠে ও তার বাস্তবায়ন সহজ ও সম্ভব বলে মনে করতে শুরু করে।

ইসলাম মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছে। সেই সাথে নিষিদ্ধ করেছে তার ব্যবসায়, তা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করাকেও। কেননা তাতে মদের সাথে একটা নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। মনে জাগে তার প্রতি একটা প্রীতি ও আপনত্বের ভাব। তাই তার উৎপাদনকারী, ক্রয়-বিক্রয়কারী ও তার বহনকারী, আমদানীকারীর উপরও অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে ইসলামী শরীয়তে। কেননা এসব কাজের মাধ্যমে মদ্যপানের মত একটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম কাজের সহিত সহযোগিতাই করা হয়।

পঞ্চমতঃ আল্লাহ্ যখন কোন জিনিস বা কাজ হারাম করে দেন, তখন তদস্থলে একটা হালাল কাজের পন্থা বৈধ করে দেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ হারাম কাজটি পরিহার করে হালাল কাজটির দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ করবে। যেমন ইসলামে যিনা হারাম করে দেয়া হয়েছে কিন্তু বিয়ে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেজন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَأَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَجْرِ ج وَ مَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

হে যুব সমাজ ! তোমাদের মধ্যে যে লোকই বিয়ের বোঝা বহনে সক্ষম, সে যেন অবশ্যই বিয়ে করে। কেননা এই বিয়ে দৃষ্টিকে নত রাখবে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত করবে। আর যে তা করতে সক্ষম হবে না, তার উচিত রোযা রাখা। এই রোযা তার জন্য ঢাল হয়ে দেখা দিবে। —মুসলিম

লোকদের মধ্যে এমন যদি কেউ থাকে, যার জন্য একজন মাত্র স্ত্রী যথেষ্ট হয় না, তার জন্য শরীয়তে দুই বা তিন কিংবা চারজন স্ত্রী এক সাথে গ্রহণের ও রাখার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু যিনার পথে যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অনুমতি কখনই দেয়া হয়নি।

ইসলামে চুরি হারাম ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু অভাব-অনটন, দারিদ্র্যই চৌর্য কর্মে উদ্বুদ্ধ হবার প্রধান কারণ বিবেচিত হওয়ায়, তা স্থায়ীভাবে দূর করার লক্ষ্যে ইসলামী সমাজে যাকাত ফরয করে দেয়া হয়েছে। যাকাত হচ্ছে ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সেই সাথে ধনীদের ধন-সম্পদে গরীব-মিসকীনদের ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার রয়েছে বলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

—وَ الَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ

আর সেসব লোক, যাদের ধন-মালে সুনির্দিষ্ট ও জ্ঞাত হক্ রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের। —সূরা মা'আরিজ ঃ ২৪-২৫

এ যাকাত বণ্টনের খাতও স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

—اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِيْنِ

যাকাত কেবলমাত্র ফকীর ও মিসকীনদের জন্য ..... —সূরা তাওবা ঃ ৬০

আর যাকাত বাবদ লব্ধ সম্পদ যদি দরিদ্রদের অভাব মোচনে যথেষ্ট না হয়, তাহলে তাদের অভাব দূর করার জন্য গোটা সমাজই দায়ী হবে। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক স্থানের ধনী লোকদের দায়িত্ব হবে স্থানীয়ভাবে সমস্ত দরিদ্র জনতার অভাব দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকার তা করার জন্য তাদের বাধ্য করবে। সর্বশেষ অবস্থায় যাকাত ও ধনীদের দেয়া দান-সাদকাতেও যদি অভাব পুরাপুরি না মেটে, তাহলে ধনীদের কর্তব্য হবে, নিজেদের সম্পদ দিয়ে দরিদ্রদের প্রাণ বাঁচানোর পরিমাণ খাদ্য, শীত-গ্রীষ্মের প্রয়োজনীয় পোশাক, বৃষ্টি, রৌদ্রের তাপ ও পথ-যাত্রীদের দৃষ্টি থেকে

www.pathagar.com

রক্ষা পাওয়ার মত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। এই কথার দলীল হচ্ছে কুরআন মজীদের এই আয়াত ঃ

—وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّه وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ

এবং দাও নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের হক। —সূরা ইসরা ঃ ২৬

وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتَامٰى وَ الْمَسَاكِيْنِ وَ الْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارَ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ و ابْنِ السَّبِيْلِ وَ مَا مَالَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط

এবং পিতা-মাতার সহিত অতীব উত্তম ব্যবহার করতে হবে, করতে হবে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সঙ্গী, নিঃস্ব পথিক এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন দাস-দাসীর সাথেও।
—সূরা নিসা ঃ ৩৬

এ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, দাস-দাসী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর দারিদ্র্য প্রপীড়িত মানুষের সহিত আন্তরিক ব্যবহার এবং সর্বপ্রকার কষ্টকর অবস্থা থেকে তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করার অবশ্য পালনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرٍ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ٥

কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে, জাহান্নামে তোমাদের নিয়ে গেল কোন্ জিনিস ? বলবে, আমরা তো মুসল্লী ছিলাম না এবং আমরা মিসকীনদের খাবারও খাওয়াতাম না।

এ আয়াতে সালাত রীতিমত আদায় করা ও মিসকীনকে খাবার দেওয়া মুসলিম মাত্রের জন্যই কর্তব্য ঘোষিত হয়েছে। উপরন্তু মিসকীনকে খাবার দেওয়ার গুরুত্ব সালাত আদায় করার সমান বলেও প্রকাশ করা হয়েছে এবং এ দুইটি কাজ না হলে যে জাহান্নামে যেতে হবে, তা-ও স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১]

হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁর খিলাফত আমলের দুর্ভিক্ষকালে চোরের হাতকাটা আইন মুলতবি ঘোষণা করেছিলেন। তার কারণ এই ছিল যে, দুর্ভিক্ষ ও প্রচণ্ড অভাব-অনটনকালে কে অভাবগ্রস্ততার দরুন, আর কে কোনরূপ প্রয়োজন ছাড়াই ছুরির কাজ করেছে তা নিরূপণ করা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। এরূপ সংশয়জনক অবস্থায় হাত কাটার নির্দেশ কার্যকর করা সম্ভব হতে পারে না।

একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত হাতিব ইবনে আবূ বলতায়া (রা)-এর ক্রীতদাসরা মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তির উট চুরি করেছিল। পরে তাদের হযরত উমরের নিকট উপস্থিত করা হয় এবং তারা এই অপরাধ স্বীকার করে। হাতিব পুত্র আবদুর রহমানকে

১. المحلى ج ٦ ص ٤٥٢ – ٤٥٤

www.pathagar.com

ডেকে এনে তাকে বলা হয়, হাতিবের ক্রীতদাসরা মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তির উট চুরি করেছিল, তারা তা স্বীকারও করেছে। অতঃপর হযরত উমর (রা) বললেন, 'হে কাসীর ইবনুস্‌সালত। তুমি এদের হাত কেটে দাও।' কিন্তু পরে যখন তিনি তাদের এই চুরির মূল কারণ জানতে পারলেন, তখন বললেন ঃ

আল্লাহ্‌র কসম ! আমি কেন পূর্বে জানতে পারিনি, তোমরা এই ক্রীতদাসদের দ্বারা কাজ করাতে কিন্তু তাদের খাবার না দিয়ে ক্ষুধায় কষ্ট দিতে। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্‌র হারাম করা জিনিসও যদি তারা খায়, তাহলে তাদের জন্য তা হালাল হয়ে যায়।

পরে তিনি মুযায়নাদের উটের দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে তাদের বিদায় করে দেন।[২]

ষষ্ঠঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব ইবাদত ফরয করেছেন, মানুষের মন পবিত্রকরণ, আত্মা বিশুদ্ধকরণ এবং তাদের পাপ ও নাফরমানীর কাজে জড়িত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য তা বিরাট ও ব্যাপক প্রভাবশালী। যেমন সালাত মু'মিনকে সকল প্রকার নির্লজ্জতা ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, যদি তা গভীর মনোযোগ; ভয়াশংকা মিশ্রিত আনুগত্য ও সজাগ মনে রীতিমত আদায় করা হয়। আর এই সালাত তরক করা হলে তার পরিণতি সুস্পষ্ট গুমরাহী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। রোযাও রোযাদারকে সকল প্রকার লালসা ও ঝগড়া-ফাসাদ থেকে সুষ্ঠুরূপে রক্ষা করে।

সপ্তমঃ ইসলাম অবলম্বিত সংশোধন ও পবিত্রকরণ প্রক্রিয়াপূর্ণ প্রয়োগ ও কার্যকারিতা সত্ত্বেও মানুষ যদি সংশোধিত না হয়, কুরআনের মত উপদেশ নসীহতের তুলনাহীন গ্রন্থের শিক্ষাও যদি এই পর্যায়ে সুফল দিতে ব্যর্থ হয়ে যায়, কারুর আকীদা-বিশ্বাস যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, মনে আল্লাহ্‌র ভয় না থাকে এবং সেই কারণে নির্লজ্জতা ও পাপের কাজে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘন করে–অপরাধ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও, তা'হলে তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে। এরূপ অবস্থায় অপরাধের শাস্তি একান্তই অপরিহার্য।

আল্লামা মাওয়াদী লিখেছেন ঃ নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহ (حدود) অপরাধ প্রতিরোধক (Restraint)। আল্লাহ্‌ তা'আলা তা বিধিবদ্ধ করেছেন আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজ করা ও আদিষ্ট কাজ না করা থেকে মানুষকে বিরত রাখার লক্ষ্যে। কেননা মানুষের প্রকৃতিতে নগদ স্বাদ আস্বাদনের লোভে পরকালীন আযাবের প্রচণ্ড ঘোষণা থেকে গাফিলকারী কামনা-বাসনা ও লালসা নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত এসব শাস্তি অচেতন লোকদিগকেও শাস্তির ভয়ে সন্ত্রস্ত করে তোলে। অপমান-লাঞ্ছনার পীড়নের ভয়ে ভীত ও সতর্ক করে দেয়। ইহারই ফলে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কার্যাবলী নিষিদ্ধই থেকে যায় এবং যেসব ফরয করেছেন, তা ফরয হিসাবেই পালিত ও বাস্তবায়িত হতে পারে। আর তা হলে মানুষের সার্বিক কল্যাণ ব্যাপকভাবে কার্যকর হয় এবং শরীয়ত পুরাপুরিভাবে পালিত হতে পারে।

২. اعلام الموقعين ج ٣ ص ٣٤

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَ مَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ٥

আমরা হে নবী ! আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।

অর্থাৎ নবী করীম (সা) দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন মানুষকে জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত করা, পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে হিদায়তের পথে পরিচালিত করা, সকল প্রকার নাফরমানী ও পাপ কাজ থেকে তাদের বিরত রাখা এবং ইতিবাচকভাবে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য ও বাস্তব অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করার বিরাট দায়িত্ব সহকারে।[১] তাই আল্লাহ্, রাসূল ও পরকালের প্রতি যার ঈমান আছে, তার পক্ষে আল্লাহ্র শরীয়ত ও রাসূলের দেয়া হালাল-হারাম বিধান লংঘন করা কখনই সম্ভব হয় না। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, ইসলামী শরীয়তের বিধানের প্রতি অকৃত্রিম ঈমান ও তার পুরাপুরি অনুসরণ সকল প্রকার পাপ ও অপরাধের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়, তার কারণসমূহ দূর করে এবং যেসব Factor মানব মনে তা করার প্রেরণা জাগায় তা নির্মূল করে দেয়। দুনিয়ার বিভিন্ন সমাজের তুলনায় ইসলামী সমাজে অপরাধের মাত্রা ও পরিমাণ নিতান্তই কম হওয়ার মূলে নিহিত প্রকৃত তত্ত্ব আমাদের সম্মুখে এভাবেই উদ্‌ঘাটিত ও ভাস্বর হয়ে দেখা দেয়।

১. الا مكام السلطانيه ملما وروى ص ٢٢

www.pathagar.com

আইন কার্যকরকরণের পদ্ধতি

অপরাধ প্রমাণ করা এবং শরীয়তের আইন কার্যকর করার পদ্ধতি পর্যায়ে মূল আলোচনা শুরু করার পূর্বে একটি কথা বলে রাখা আবশ্যক মনে করছি। তা এই যে, মানবতার জন্য এমন একটি নেতৃত্ব একান্তই অপরিহার্য, যা হবে সর্বতোভাবে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য। যার অন্তরে থাকবে মানবতার প্রকৃত কল্যাণ কামনা, দয়া-অনুগ্রহ এবং জনগণের অপরাধ প্রবণতার রোগ চিকিৎসার জন্য সাহসিকতা ও নির্ভীকতা। তার এক হাতে যেমন থাকবে রোগের ঔষধ, তেমনি অন্য হাতে থাকবে অপমানকর অপরাধ নির্মূল করার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। এরূপ ব্যবস্থা হতে পারে যদি মুসলমান সমাজ সুসংবদ্ধ ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি একান্ত নিবেদিত হয় এবং তাদের আনুগত্য সম্পূর্ণ-রূপে নিবদ্ধ হয় আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কিতাবে ও রাসূলের সুন্নাতে বিধৃত জীবন বিধানকে পুরাপুরি অনসুরণ করে চলতে শুরু করে। তাতে সামাজিক রোগ নিরাময় ও অপরাধ প্রতিরোধের যে বিধান রয়েছে, নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিদ'আত, নৈতিক অপরাধ, জান-মাল-ধন-সম্পদে অগ্রাসন প্রতিহত করার মত দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতা থাকে।

বস্তুত অপরাধ বিভিন্ন, রূপ তার বিচিত্র, ব্যাপারটি দুরূহ, তার বিপদটা ভয়াবহ। এরূপ অবস্থায় তার প্রতিবিধান আল্লাহ্র দীনের একাংশের প্রতি ঈমান ও অপর অংশের প্রতি কুফরী—এই নীতি দ্বারা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তার ফলে অপরাধ দমন ও মূলোৎপাটন কখনই সম্ভবপর হবে না, তার মাত্রাও কম করা যাবে না। বরং তার পরিণাম হবে অবর্ণনীয় ক্ষতি ও বিপর্যয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাই এই ধরনের মনোবৃত্তিকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ ۚ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْيٌ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ

তোমরা কি আল্লাহ্র কিতাবের বিধানের কিছু অংশের প্রতি ঈমানদার আর কিছু অংশের প্রতি কুফরী কর ?.... জেনে রাখো, এই নীতি অবলম্বনকারীদের দুনিয়ায় চরম লাঞ্ছনা অবমাননা ছাড়া আর কিছু পরিণতি বা শাস্তি হতে পারে না।

www.pathagar.com

ধন-মাল ও জান প্রাণের উপর ব্যক্তিগণের সীমালংঘনমূলক আচরণে যে বিপদ ঘটে, তার চাইতে অনেক বেশি, ভয়াবহ ও ব্যাপক বিপদ ঘটে নাস্তিকতা, আল্লাহ্‌র শরীয়ত বাদ দিয়ে শাসন কার্য পরিচালনা এবং জান-মাল-ধনে মানব রচিত আইন-বিচার প্রয়োগ করায়। কেননা প্রথমোক্ত অপরাধসমূহ ব্যক্তি পর্যায়ের, সমাজ সমষ্টির নিকট থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায় না। কিন্তু এই শেষোক্ত ধরনের কার্যকলাপ তো প্রায় দেশেই বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও প্রশাসনিক আইন বিধান পূর্ণোদ্যমে ও নির্ভীকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মুসলমান সামজ যে ব্যাপক বিপর্যয় ও কঠিন সমস্যাবলীর মধ্যে নিমজ্জিত, তার প্রতিবিধান কি করে সম্ভবপর হতে পারে ?....অথচ আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ কিতাবের প্রতি ঈমান গ্রহণ ও তাকে পুরামাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করতেও তারা রাযি নয়।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সকলেই চান অপরাধ পুরামাত্রায় দমন হোক, যেন জনগণ পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে জীবন যাপন করতে পারে। চান, তাদের সর্বপ্রকারের সমস্যাবলীর সঠিক ও সুষ্ঠু সমাধান হোক। সর্বমুখী বিপদ ও বিপর্যয় থেকে তারা মুক্তি পাক, সে জন্য তারা নিত্য নতুন পন্থা, উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও তথ্য এবং রচিত আইন কানুন তথা প্রশাসনিক পদক্ষেপ প্রক্রিয়ারও আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কিন্তু সর্বত্রই চরম ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য হতাশা ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না। তা সত্ত্বেও এই সবের সার্থক প্রতিবিধানের লক্ষ্যে ইসলামী শরীয়ত যেসব কার্যকর আইন বিধান পেশ করেছে, তাকে পুরাপুরি গ্রহণ ও বাস্তবায়নেও তারা রাযি হচ্ছে না।

বস্তুত বর্তমান দুনিয়ার সাধারণভাবে মুসলিম সামজ দুর্বল অক্ষম, শত্রুদের পদলেহনে অভ্যস্ত—যে শত্রুরা প্রতি মুহূর্তে তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, তারা তাদের নিকট থেকেই তাদের সমস্যাবলীর সমাধান পাবে বলে আশা করছে। ভরসা করে আছে, তাদের উপর নিত্যকার আগ্রাসন থেকে ওরাই তাদের রক্ষা করবে। অথচ তা কোন দিনই সম্ভব নয়, সম্ভব বলে মনে করাও চরম নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়।

বর্তমান দুনিয়ায় মুসলমানদের প্রশাসনে, বিচারে, নৈতিকতায়, অনুসরণে, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে জীবনের সকল দিকে ও বিভাগে ইসলামী জীবন বিধানের অনুপস্থিতিই শুধু নয়, মারাত্মক ধরনের অবহেলাও লংঘন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আসলে এটাই একটা বড় অপরাধ, যার অবিলম্বে চিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সর্বাত্মক আযাব ও মহাবিপর্যয় আসার পূর্বেই। কেননা আল্লাহ্‌র স্পষ্ট অকাট্য নিষিদ্ধ কার্যাবলী যখন পূর্ণ ধৃষ্টতা সহকারে ঘটতে শুরু করে। তাঁর দেয়া জীবন-বিধানের প্রতি উপেক্ষা ও পদদলন ব্যাপক হয়ে উঠে, তখন আল্লাহ্‌রও সত্য-সহনশীলতা একটা চূড়ান্ত পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে, যদিও আযাবটা তিনি

www.pathagar.com

সঙ্গে-সঙ্গেই দিয়ে দেন না। কেননা তিনি তাঁর বান্দাদের 'তওবা' করার ও ভুল-সংশোধনের সুযোগ দেন তাঁর অপার দয়া ও অনুগ্রহরে কারণে। কিন্তু তাদের প্রত্যাবর্তনের সকল সম্ভাবনাই যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, আল্লাহ্‌র সীমালংঘন থেকে তারা বিরত থাকতে প্রস্তুত হয় না—তওবা করে না, তখন এই কঠিন অপরাধের ইহকালীন শাস্তি স্বরূপ ভয়-ত্রাস জীবন-ধন-মানের কঠিন অবক্ষয়, অভাব-অনটন-দুর্ভিক্ষের রাহুগ্রাস তাদের গিলে ফেলে। এ-ই হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র স্থায়ী নিয়ম তাঁর বান্দাদের প্রতি।

এ কথা সকল সংশয়ের ঊর্ধ্বে যে, মহান ইসলামী শরীয়ত মহান সৃষ্টিকর্তারই দেয়া বিধান। তিনি তাঁর নিজের সৃষ্ট বান্দাদের সার্বিক জীবনকে কল্যাণময় করার লক্ষ্যেই এই বিধান নাযিল করেছেন। তাদের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবন কেবলমাত্র এই বিধান গ্রহণ অনুসরণ ও ব্যাপকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ধন্য হতে পারে, সর্ব সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে, সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধ হতে পারে—বলিষ্ঠ হতে পারে আল্লাহ্‌র সহিত বান্দাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। আল্লাহ্‌র কালেমা—দ্বীন এভাবেই সর্বোচ্চ ও বিজয়ী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং কুফর ও গুমরাহী হতে পারে পরাজিত, পরাভূত। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মহান সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোন কল্যাণের একবিন্দু আশা করা যায় না। কেননা এটাই মানুষের সৃষ্টির মূলে নিহিত মহান স্রষ্টার ইচ্ছা ও লক্ষ্য। একথা আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন এ আয়াতে ঃ

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ ٥

আমি মানুষ ও জীনকে সৃষ্টি করেছি কেবল মাত্র এ উদ্দেশ্যে যে, তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেরাই আমার দাসত্ব করবে।

আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রাসূলগণও আবহমানকাল ধরে মানুষের সম্মুখে এই দাওয়াতই পেশ করেছেন ঃ

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتِ ٥

প্রতিটি জনসমষ্টিতেই আমি নবী-রাসূল পাঠিয়েছি এই দাওয়াত নিয়ে যে, তোমরা কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার কর এবং যে সব শক্তি ও ব্যক্তি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র বান্দা হতে দেয় না, নিজেদের বান্দা বানিয়ে রাখতে সচেষ্ট, তাদের বাদ দিয়ে চল।

কিন্তু একান্তভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও সম্পূর্ণ আনুগত্য-অধীনতা-সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না—হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে না, যতক্ষণ না মানুষ এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনে তাঁরই দেয়া বিধান মুতাবিক পূর্ণ শান্তি সমৃদ্ধি ও পারস্পরিক

www.pathagar.com

সহযোগিতার মধ্যে জীবন যাপন করতে শুরু করছে। আর তাও বাস্তব হতে পারে কেবলমাত্র তখনই, যখন অপরাধ প্রবণ লোকদের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী শাস্তি ও দণ্ডসমূহ পুরাপুরি কার্যকর হবে। এই শাস্তি ও দণ্ড অপরাধকারীদের যথার্থ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে পারে, আর যাদের মনে তার প্রবণতা রয়েছে তারাও দমিত হতে পারে অপরাধের শাস্তি যথাযথভাবে কার্যকর হতে দেখতে পেলে। প্রকৃত সুবিচার ও ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠা ইসলামী সমাজের জন্য একান্তই অপরিহার্য এবং এই সুবিচার ও ন্যায়পরতা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর হলেই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। এই কথাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন কুরআন মজীদের এ আয়াতে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ –

আল্লাহ্‌ই তোমাদের আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার প্রাপক বা উপযুক্ত লোকদের নিকট পৌছিয়ে দাও এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে, তখন অবশ্যই সুবিচার ও ন্যায়পরতা সহকারে তা করবে।

এই আদেশ অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে তারাই মুসলমান। যারা করে না তারা প্রকৃত মুসলিম নয়—কাফির ঃ

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ٥

যারাই আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারাই কাফির।

অতএব আল্লাহ্‌র বিধান বাদ দিয়ে বিচার ফয়সালা ও শাসন কার্য পরিচালনা সম্পূর্ণ কুফরি এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের কঠিন বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করা ছাড়া আর কোন পরিণতি নিয়ে আসে না। বিচার-ফয়সালার জন্য প্রথমে অপরাধ প্রমাণ করা আবশ্যক। অপরাধ প্রমাণিত না করে শাস্তি বা দণ্ড কার্যকর করা নিতান্তই যুলুম, অবিচার ও আল্লাহ্‌দ্রোহিতা ছাড়া আর কিছু নয়। আর যুলুম ও অবিচারের যে শাসন তা কখনই স্থিতিশীল হতে পারে না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এই যমীনে।

আল্লাহ্‌র এই মহান শরীয়ত দুনিয়ায় নাযিল হয়েছে আল্লাহ্‌র বান্দাদের সর্ব প্রকারের রোগের একমাত্র চিকিৎসা হয়ে। এই চিকিৎসা প্রয়োগের পর কোন রোগের নাম চিহ্নও থাকেত পারে না, যদি তা যথাযথভাবে প্রয়োগ ও কার্যকর করা হয় এবং তা হয় এমন ব্যক্তি বা জনসমষ্টির হাতে, যার ঐকান্তিক ঈমান রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসা এই পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা-বিধানের প্রতি। শরীয়তকে কায়েম করার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে, থাকতে হবে সার্বিকভাবে সমগ্র মানবতার কল্যাণ কামনা।

www.pathagar.com

সত্যিকথা, জীবনে যে অপরাধই সংঘটিত হোক, তার প্রতিবিধান ও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়ত করেছে। কিভাবে কখন সেই প্রতিবিধান কার্যকর করতে হবে তা-ও স্পষ্ট কর জানিয়ে দিয়েছে। অপরাধ প্রমাণের উপায় ও পন্থা কি হতে পারে, সে বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের বক্তব্য সুস্পষ্ট। এসব ব্যাপার লোকদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং অপরাধ প্রমাণের ব্যাপারটি কয়েকটি ব্যাপার ও আলামতের সাথে যুক্ত করে দিয়েছে। অতএব একজনকে অপরাধী হওয়ার ফয়সালা দেওয়া কেবল তখনই সম্ভব, যখন তার অপরাধ প্রমাণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস আয়ত্ত ও উপস্থাপিত হবে এবং সেসবের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, সে বাস্তবিকই অপরাধ করেছে। কুরআন মজীদে এই সবের মৌলনীতি বিধৃত এবং রাসূলে করীমের সুন্নাত তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে।

এই পর্যায়ের আলোচনায় প্রথম বক্তব্য এই যে, অপরাধ প্রমাণের জন্য প্রয়োজন – اَلْبَيِّنَةُ অকাট্য দলীল ও প্রমাণ। নবী করীম (সা) ঘোষণা করেছেন ঃ

لَوْ يُعْطِىَ النَّاسُ بِدَعْوَا هُمْ لاَدَّعى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَ اَمْوَالَهُمْ اِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ –

লোকেরা যা দাবি করে তা-ই যদি তাদের দেওয়া হতো, তাহলে লোকেরা নিশ্চয়ই অন্য লোকদের রক্ত ও ধন-মালের দাবি করে বসত। তাই যার উপর দাবি করা হয়েছে কিরা করার সুযোগ তাকে দিতে হবে।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বুখারী মুসলিম উভয়ই উদ্ধৃত করেছেন অপর একটি হাদীস। তার ভাষা হচ্ছে ঃ

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَاِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ لَدَى الْمُدَّعِى حَلَّفَ المدعَى عَلَيْهِ وَ خَلَّى سَبِيْلَهُ

বিবাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতেও রাসূলে করীম (সা) ফয়সালা ও বিচার করেছেন। বাদীর নিকট যদি কোন প্রমাণ না থাকে তার দাবির পক্ষে, তা'হলে বিবাদী বা অভিযুক্তকে নির্দোষিতার হলফ করে মুক্তি ও নিষ্কৃতি দিতে হবে।

হাদীসের এই اَلْبَيِّنَةُ-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ঃ

اَلدَّلاَلَةُ الْوَاضِيْحَةُ وَ الْعَلاَمَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمُرَادِ الْمُرْشِدَةِ اِلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَقْلِيَةً اَوْ مَحْسُوْسَةً وَّ سُمِّيَتْ بَيِّنَةً لاَنَّهَا تَكْشِفُ عَنِ الْمَقْصُوْدِ وَ تُظْهِرُ ه

www.pathagar.com

'আল-বায়্যিনাহ' শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং এমন নিদর্শন বা চিহ্ন। যা লক্ষ্যের দিকে পথ নির্দেশ করে ও জানিয়ে দেয় যে, এটাই হচ্ছে লক্ষ্যে পৌছার পথ। তা যেমন বিবেক-বুদ্ধিসম্মত হতে পারে, অথবা হতে পারে অনুভবযোগ্য কিছু। এর নাম 'বায়্যিনাহ্' রাখার কারণ হচ্ছে, তা লক্ষ্য উদ্‌ঘাটিত ও প্রকাশ করে।

ফিকাহ্‌র দার্শনিকদের মতে البينة হচ্ছে ঃ ما ابان الحق و اظهره যা-ই প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ ও প্রকট করবে, তা-ই 'বায়্যিনাহ্'। সত্যের এই প্রকাশ স্বরূপে হোক, লক্ষণাদির দ্বারা হোক, সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা হোক, স্বীকারোক্তির মাধ্যমে হোক, কিংবা হোক কিরা-কসমের সাহায্যে, তাতে কোন পার্থক্য নেই। তা সবই 'বায়্যিনাহ্'।

এই 'বায়্যিনাহ্' বা অকাট্য প্রমাণ কখনও হতে পারে সাক্ষ্য, কখনও অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিও হতে পারে। আবার কখনও বাদী বা অভিযোগকারীর কিরা-কসম এবং কখনও অভিযুক্তের নিজের সাক্ষ্যও হতে পারে'—যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার 'লেয়ান'। অবস্থার লক্ষণাদি এবং পরিস্থিতির রূপ দ্বারাও অপরাধের সহিত অভিযুক্তের সম্পর্ক বোঝা যেতে পারে। 'শাহাদাত' বা 'সাক্ষ্য' বলতে বোঝায়, সাক্ষী যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছে, নিজ চক্ষে দেখতে পেয়েছে অথবা জানতে পেরেছে তার তা জানিয়ে দেয়া। এই সাক্ষ্য বলিষ্ঠ ও যথেষ্ট মাত্রার হলে দাবির বিষয়টি প্রমাণিত হতে পারে। যেমন (দুই পক্ষের কোন একজনের) স্বীকৃতি-স্বীকারোক্তি (Confession)। সে যা করেছে সে বিষয়ে অথবা যে বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত হতে হয়েছে, সেই বিষয়ে জানিয়ে দেয়া—তা সত্য কি অসত্য। স্বীকারোক্তির সময়ের পূর্ববর্তী ব্যাপার প্রকাশ করা, তার অস্তিত্বের ঘোষণা দেয়া।

'আল-য়ামীন' অর্থ হলফ বা শপথ (Oath) করা, কিরা-কসম খাওয়া। 'য়ামীন' নাম রাখা হয়েছে এজন্য যে, দুইজন পরস্পর বিরোধী ব্যক্তির একজন তার ডান হাত অপরজনের ডান হাতের উপর লাগিয়ে তালি দিয়ে থাকে।

লক্ষণ বলতে চিহ্ন বা নিদর্শন বোঝায়, যা অভিযোগকারী বা বাদীর গোটা ব্যাপারের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে, তার দ্বারা বোঝা যায় প্রকৃত ঘটনা কি ছিল। এই লক্ষণের বর্তমানতা মূল ঘটনার বাস্তবতার প্রদর্শক।

মানুষের সমস্যাবলীর পরিপূর্ণ সমাধানের জন্য ইসলামী শরীয়ত যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তা এই যে, শরীয়ত মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে—মানুষের সুস্থ চেতনা অনুভূতি ও সংবেদনশীলতাকে আহ্বান করে, উদ্বুদ্ধ করে। মন-মানসিকতাকে জাগ্রত করে এবং এই দুনিয়ায় অপরাধের নির্ধারিত শাস্তির কথা জানিয়ে দিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত ও সচেতন করে। স্মরণ করিয়ে দেয় অপরাধের পরকালীন হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল দানের নিশ্চিত ব্যবস্থার কথা। ফলে কোন সুস্থ মানুষই পাপ বা অপরাধের দিকে অগ্রসর হতে সাহস পায় না। তেমন কোন ব্যাপার সম্মুখবর্তী হলে তার অন্তরে

www.pathagar.com

কম্পন শুরু হয়ে যায়, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে পরকালীন আযাবের কথা স্মরণ করে। এরূপ অবস্থায় কেউ যদি কারোর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তা'হলে সে সাক্ষ্য দেবে কেবলমাত্র পরকালীন হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফলের ভয়ে। মানুষ তখন নিজের সম্পর্কে এমন কোন স্বীকারোক্তিও করে না, যার ফলে তাকে কঠিন শাস্তি ও ধ্বংসের পরিণতি লাভ করতে বাধ্য হতে হবে। সাক্ষ্যদাতাও কোন মিথ্যা সাক্ষ্য দানে উদ্যত হতে পারে না। পক্ষান্তরে সাক্ষ্যদাতা সত্যকে গোপন করারও সাহস পায় না। কেননা আল্লাহ্‌র ঘোষণানুযায়ী সাক্ষ্য গোপনকারীও মিথ্যাবাদী গণ্য হবে। তাই তাকে সাক্ষ্য দিতে হবে ঠিক ততটুকুর, যতটুকু সে নিজে জানে। না জেনেও কেউ সাক্ষ্য দিলে সে তো নিজেকেই ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সাক্ষীকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, যার সে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কুরআন মজীদে তাই বলা হয়েছে ঃ

اِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ

আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যাদের ডাকে তারা শাফায়াত করার কোন ক্ষমতা রাখে না। —সূরা যুখরুফ ঃ ৮৬

'তবে কেউ যদি জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয় .....'

এ আয়াতাংশ অনুযায়ী সাক্ষ্যদানের প্রথম শর্ত, তা সত্যের সাক্ষ্য এবং সত্যতা সহকারে হতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত, সে সাক্ষ্য হতে হবে জ্ঞানের ভিত্তিতে, জানা-শুনা বিষয়ের জন্য। না-জানা বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার কারুর নেই। আর শুধু জানলেই হবে না, জানা বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে পরম সততা ও যথার্থতা সহকারে।

অপর একটি আয়াতের অংশ হচ্ছে ঃ

وَ مَا شَهِدْنَا اِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا

যা কিছু আমরা জানতে পেরেছি, আমরা শুধু তা-ই বর্ণনা করছি—শুধু তারই সাক্ষ্য দিচ্ছি। —সূরা য়ূসূফ ঃ ৮১

এখানেও সাক্ষ্য দানের ব্যাপারটি জানা-শুনার আওতার মধ্যে সীমিত। শরীয়ত এই বিধানও দিয়েছে যে, যে লোক কোন গুনাহ্ বা অপরাধ করবে সে প্রকাশ্যভাবে তা থেকে তওবা করবে—তওবা করেছে তা প্রকাশ্য ভাবে বলতে হবে।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَه ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

যে লোক কোন খারাপ—পাপ বা অপরাধের কাজ করবে কিংবা নিজের উপর যুলুম করবে, পরে সে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহ্‌কে অতীব ক্ষমাশীল ও নিরতিশয় দয়াবান পাবে। —সূরা নিসা ঃ ১১০

www.pathagar.com

একটি স্ত্রীলোক যিনা করার পর সে তা স্বীকার করলে নবী করীম (সা) তার এই স্বীকারোক্তির জন্য তার প্রশংসা করেছিলেন।[১] অনুরূপভাবে সাক্ষ্যদান ও সত্য গোপন করা থেকে বিরত থাকার জন্য উৎসাহ দান করেছেন তিনি। কেননা সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, সাক্ষ্যদাতাকে অবশ্যই মুসলিম, সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানবান এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে। তাকে হতে হবে বিশ্বাসযোগ্য নিরপেক্ষ ও চারিত্রিক দোষে অ-অভিযুক্ত। তাই মুসলমানের বিরুদ্ধে কাফির ব্যক্তির সাক্ষ্য, অবিবেকসম্পন্ন এবং সাক্ষ্য বিষয়ে না-জানা লোক এবং ফাসিক—সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে নিজের বা নিজের বংশধরদের বা পিতার জন্য ফায়দা পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[২] অবশ্য অমুসলিমদের জন্য অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে—যদি অন্যান্য শর্ত পুরাপুরি পাওয়া যায়।

বালকদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে তা তাদের পারস্পরিক আঘাত যখম ইত্যাদির ব্যাপারে, যতক্ষণ তাদের সাথে তাদের বড়রা মিলিত না হচ্ছে এবং স্বতন্ত্রভাবে থাকা অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব হবে। কেননা বড়রা তাদেরকে আসল ঘটনা থেকে ভিন্নতর কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে পারে।

প্রমাণিত হওয়া ও সাক্ষ্য গ্রহণের দিক দিয়ে অপরাধসমূহ পারস্পরিক বিভিন্ন। কোন কোন অপরাধ প্রমাণের জন্য মাত্র দুইজন সাক্ষী-ই যথেষ্ট হতে পারে। আবার কোন অপরাধে সাক্ষীদের সংখ্যা চার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন যিনা, ব্যভিচার ও লাওয়াতাত (পুংমৈথুন) অপরাধ প্রমাণের জন্য সাক্ষীদের নিম্নতম সংখ্যা চার। তবে শেষোক্ত অপরাধ প্রমাণেও চারজন সাক্ষীর প্রয়োজনের বেলা শরীয়ত-অভিজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো-কারো মতে সেজন্য দু'জন সাক্ষী-ই যথেষ্ট। কেননা সে অপরাধটি ঠিক যিনার মত নয়। কেউ কেউ মনে করেন, সে অপরাধের শাস্তিও ঠিক তাই, যা যিনার শাস্তি। ফলে তাঁরা যিনা প্রমাণের যে শর্ত, লাওয়াতাত প্রমাণেও সেই শর্তই আরোপ করেছেন।

কোন কোন অপরাধের প্রমাণ শুধু কিরা-কসম। যেমন হত্যা।

কোন কোন অপরাধ প্রমাণিত হয় শুধু বাদীর সাক্ষ্যে। 'লেয়ান' হচ্ছে সেই অপরাধ। স্বামী যদি স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত করে এবং সেখানে অন্য সাক্ষী কেউ না

১. এই প্রশংসাটা শুধু স্বীকারোক্তির জন্য ছিল না, সে যে স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করেছে এবং শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি-প্রস্তর নিক্ষেপে প্রাণ সংহার গ্রহণ করে পবিত্র হয়ে খোদার নিকট উপস্থিত হওয়ার সংকল্প করেছিল, প্রশংসা ছিল এই আত্মোৎসর্গী কৃত ঈমানের জন্য।

২. কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য কাফিরের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ

হে ঈমানদারগণ তোমাদের কারুর সত্য উপস্থিত হলে তখন যেন অছীয়ত করা হয়।

www.pathagar.com

থাকে, তবে এই সাক্ষ্যটা উপস্থাপনে বহু কয়টি শর্ত রয়েছে। সাক্ষীকে পূর্ণবয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। তাকে পর পর চারবার সাক্ষ্য দিতে হবে যে, তার স্ত্রী যিনা করেছে এবং পঞ্চমবারে বলতে হবে, সে যদি মিথ্যা বলে থাকে তা'হলে তার উপর যেন খোদার লা'নত বর্ষিত হয়। কুরআন মজীদের আয়াতে এই কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّه لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ

যেসব স্বামী নিজেদের স্ত্রীদের যিনার অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং তাদের নিকট নিজে ছাড়া আর কোন সাক্ষী না থাকে, তাহলে তাদের এক-একজন চার-চারবার আল্লাহ্‌র নামে কসম করে সাক্ষ্য দেবে যে, সে সত্যবাদী। —সূরা নূর ঃ ৬

(এই পর্যায়ের বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়)

কোন কোন অপরাধ স্বতঃই অপরাধীর স্বীকারোক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে এই স্বীকারোক্তির গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হচ্ছে স্বীকারোক্তিকারীর যোগ্যতা। তা থাকলেই সে স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অবশ্য স্বীকারোক্তি অপরাধ প্রমাণের লক্ষ্যে সাক্ষ্যের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। কেননা তাকে কেউ মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে তার কোন আশংকা থাকে না। উপরন্তু কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির লোক কোন মিথ্যা অভিযোগ স্বীকার করে নিজের ক্ষতি সাধন করতে প্রস্তুত হবে—এমন কথাও চিন্তা করা যায় না। তাই সেই সাথে এই শর্তও রয়েছে যে, স্বীকারোক্তিটা মিথ্যা প্রমাণিত হবার আশংকা থেকে মুক্ত হতে হবে।

ঘটনা বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট লক্ষণাদিও যে প্রমাণ হিসাবে বিবেচ্য হতে পারে এবং তা অপরাধের সত্যাসত্য প্রমাণে প্রত্যক্ষ সহায়তা করতে পারে। কুরআন মজীদে উদ্ধৃত ইউসুফ (আ) সংক্রান্ত কিস্‌সা তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। হযরত ইউসুফ যার ঘরে অবস্থান করতেন, সেই মহিলা-ই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি তার ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকার করেন ও তার ঘর থেকে পালিয়ে যেতে চান। এই সময় সেই মহিলা তাঁকে ধরে ফেলে জামার কোণ ধরে টান দেয়। তাতে পিছন দিক থেকে জামা ছিঁড়ে যায়। ঠিক এই সময়ই ঘরের কর্তা দরজার মুখে উপস্থিত হয়, আর অমনি মহিলাটি বলতে শুরু করে, আমার কোন দোষ নেই, ও-ই আমার প্রতি খারাপ ইচ্ছা নিয়ে এসেছিল। হযরত ইউসুফ (আ) তার প্রতিবাদ করে বললেন, ওর কথা সত্য নয়। ও নিজেই আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তখন দুইজনের বক্তব্যের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তা প্রমাণের জন্য মহিলার ঘরেরই একজন লোক লক্ষণাদিকে ভিত্তি করে বিশ্লেষণমূলক সাক্ষ্য দিল। বলল, ইউসুফের জামা সম্মুখের দিক দিয়ে ছেঁড়া হলে বুঝতে হবে মহিলা সত্য বলছে। আর পিছন দিকে থেকে ছেঁড়া হলে ইউসুফ-ই সত্যবাদী হবে। এই

www.pathagar.com

ফর্মুলার ভিত্তিতে যখন তদন্ত করা হলো, তখন ইউসূফেরই সত্যতা প্রমাণিত হলো এবং মহিলাই যে এই অপরাধের জন্য দায়ী তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো।

এই দীর্ঘ কাহিনী জানিয়ে দিচ্ছে যে, অবস্থার লক্ষণাদিও সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং সে লক্ষণাদি থেকেই প্রকৃত সত্য জানা যেতে পারে, প্রমাণিত হতে পারে আসল অপরাধী কে বা কার অপরাধ কতটুকু। কাজেই অবস্থা সংশ্লিষ্ট লক্ষণাদিকে উপেক্ষা করা ঠিক হবেনা এবং সাক্ষী নেই বলে অপরাধের বিচার হবে না, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হবে না—তা হতেই পারে না। বিশেষত এজন্য যে, অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী সর্বক্ষেত্রে থাকতেই হবে, এমন কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। অপরাধীরা যথাসম্ভব লুকিয়ে ও লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেই অপরাধ করে থাকে, কাউকে দেখিয়ে অপরাধ করার ব্যাপারটি চিন্তনীয় নয়।

বহু সংখ্যক অপরাধ প্রমাণে ঘটনার লক্ষণাদির গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে, তা রাসূলের সুন্নাত থেকেও প্রমাণিত। কেননা ঘটনার লক্ষণাদি ও তার আশ-পাশ বা পার্শ্ববর্তী ঘটনাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হলে এবং সে সবের প্রেক্ষিতে প্রকৃত ঘটনার স্বরূপ জানতে চেষ্টা করা না হলে কঠিন ও ব্যাপক বিপর্যয় এবং মারাত্মক ক্ষতি ও বিপদের সৃষ্টি হওয়ার খুব সম্ভাবনা। অথচ মহান সুদৃঢ় শরীয়ত সর্বপ্রকার বিপদ ক্ষতি, অন্যায় ও পির্যয়ের পথ সমূলে রুদ্ধ ও উৎপাটিত করার জন্যই এসেছে। আর শরীয়তের লক্ষ্য হচ্ছে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তার প্রতিবিধান এবং তার সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জনগণকে সাহায্য দান। মুসলিম উম্মতের আবহমানকালীন নেতৃবৃন্দও অবস্থার লক্ষণাদির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন—বিশেষত বিচারের ক্ষেত্রে। তাঁদের কথা যাঁরা জানে না—অতীতে যারা দীন ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং জনগণও তাঁদেরই নেতৃত্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, তাঁরাই তো এই উম্মতের জন্য হিদায়েতের জ্বল-জ্বল করা তারকা-নক্ষত্র এবং মুক্তাদীদের নেতা। তাদের রেখে যাওয়া জ্ঞানেও অবস্থার লক্ষণাদির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপের কথা জানা যায়। হযরত সুলায়মান ও দাউদ (আ)-এর একটি ঘটনা স্বয়ং নবী করীম (সা) বর্ণনা করেছেন। তা এই ঃ দুইজন স্ত্রীলোক একটি বাচ্চাকে নিয়ে দাবি তুলেছে যে, এ আমার সন্তান। চূড়ান্ত বিচারের জন্য তারা হযরত দাউদের নিকট উপস্থিত হলো। তখন তিনি বাচ্চাটিকে বেশি বয়সের স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে দিলেন। এই সময় সুলায়মান (আ) উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন ঃ আপনি এ কি বিচার করলেন ? ব্যাপারটি আমার কাছে ছেড়ে দিন, আমিই সঠিক বিচার করব। তখন সুলায়মান (আ) বললেন, তোমরা একটা ছুরি নিয়ে আস। বেশি বয়সের মেয়েলোকটি জিজ্ঞেস করল, কি জন্য ? বললেন ঃ আমি ছুরি দিয়ে বাচ্চাটিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে তোমাদের দুই জনকে দেব। সেই বেশি বয়সের স্ত্রীলোকটি খুব তাড়াহুড়া করে একটা ছুরি নিয়ে উপস্থিত হলো। এতেই হযরত সুলায়মান বুঝতে পারলেন যে, এ বাচ্চা তার সন্তান নয়। কেননা কোন মা-ই তার সন্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য নিজেই ছুরি এনে

www.pathagar.com

দিতে পারে না। তখন তিনি সন্তানটি ছোট বয়সের মেয়েলোকটিকে দিয়ে দিলেন। এই মেয়েলোকটিই যে বাচ্চাটির মা এবং বাচ্চাটির যে তারই সন্তান, বেশি বয়সের মেয়েলোকটির সন্তান নয়, তা অবস্থার লক্ষণ থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

হযরত আলী (রা)-এর জীবদ্দশার একটি ঘটনা। একজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক হযরত আলী (রা)-এর দিকে এগিকে গেল এবং বলল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! এই মহিলা আমার মা। কিন্তু সে তা অস্বীকার করছে। হযতর আলী (রা) মেয়েলোকটি দেখলেন। সে কৃষ্ণাঙ্গিনী নয়, সে শ্বেতাঙ্গিনী। জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই যুবকের এই দাবি সম্পর্কে তুমি কি বলতে চাও ? বললো, 'না—ও আমার সন্তান নয়, আমি ওকে চিনিও না।' তখন হযরত আলী (রা) মহিলাটির অভিভাবকদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা কি তোমাদের এই মেয়েলোকটির ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে ? তারা বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন হযরত আলী তাঁর খাদেমকে দিয়ে ঘর থেকে কিছু নগদ অর্থ আনিয়ে উক্ত যুবকটিকে বললেন ঃ নাও, এই মেয়েলোকটিকে তোমার দেয় মহরানা। আমি তোমাকে ওর সাথে বিয়ে দেব। আর তুমি ওর হাত ধর, আর কাল যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তোমার শরীরে বিয়ের হলুদ দেখতে চাই'। এই কথা শুনে মেয়েলোকটি চিৎকার করে উঠল। বলল—এ তো জাহান্নামে যাবার ব্যবস্থা। এ হতে পারে না, হে আমীরুল মু'মিনীর ! এ যুবক তো আমারই সন্তান'। তা হলে সে প্রথম তা অস্বীকার করেছিল কেন, জিজ্ঞেসা করা হলে এক দীর্ঘ কাহিনীর অবতারণা করল। বলল, ওর বাবা হাব্‌শা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসেছিল। তাকে দেখে আমার বাবা-মা খুশি হয়ে তার সাথে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। অতঃপর খুব শীগ্‌গীরই ওর বাবা যুদ্ধে চলে গেল, আমাকে বিয়ের কনে হিসাবে রেখে গেল। আর সেই যুদ্ধেই সে শহীদ হয়ে গেল। পরে আমি অনুভব করলাম যে আমি অন্তঃসত্ত্বা ; কিন্তু ব্যাপারটি প্রকাশ হতে দিলাম না। ওকে প্রসব করার পর এক মরুচারীকে দিয়ে দিলাম এবং তাকিদ করে বলে দিলাম যে, আমার সাথে ওর কোন পরিচয় দিতে পারবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি গোপন থাকেনি।

এই ঘটনাও অবস্থার লক্ষণের ভিত্তিতে প্রকৃত ব্যাপার জানার একটা পন্থা উদ্ভাবনে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত, যদিও খুব কম লোকই অবস্থার লক্ষণ থেকে এত বড় দিকদর্শন লাভ করতে পারে। এজন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও অনুধাবন প্রতিভার একান্ত প্রয়োজন। মনস্তত্ত্ববিদ্যা একজনকে এতটা দক্ষ বানাতে পারে যে, সে একজনের প্রতি তাকিয়ে তার ভিতরে—মনে—কি আছে তা বলে দিতে পারবে। আরও অনেক ব্যাপারে তা থেকে অনেক প্রকারের কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। ইসলামী আদালতে বিচারের ক্ষেত্রেও প্রকৃত ব্যাপার জানার পর এবং আসল অপরাধীকে চিহ্নিত বা পাকড়াও করার জন্য এই পন্থা ব্যবহৃত হতে পারে। তবে ব্যাপারটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, সব বিচারকই তা করতে সক্ষম না-ও হতে পারে।

www.pathagar.com

ইসলামের দণ্ড দর্শন

মানব সমাজের অগ্রগতি ও উন্নতির সাথে সাথে প্রয়োজনীয় কিছু কিছু নিয়ম-বিধিও বিরচিত হয়েছে। জনজীবনকে সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য তা অপরিহার্য ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজ জীবন ততটা ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ ছিল না। তখন নিয়ম-বিধি কার্যকর করার শক্তি বা ক্ষমতা ছিল পরিবারের সর্বাধিক কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি-নেতার কুক্ষিগত। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদার জন্য সে-ই ছিল পূর্ণ দায়িত্বশীল। পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সমাজ জীবন গোত্র পরিধিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তখন সমগ্র গোত্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতো গোত্রপতি। গোত্রাধীন প্রত্যেক ব্যক্তি ও পরিবারের অধিকার সংরক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব গোত্রপতির উপর ন্যস্ত ছিল। কালের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থায়ও বিবর্তন সংঘটিত হয়। প্রশাসনিক ও দণ্ড কার্যকরকরণের শক্তি 'রাজা' বা সম্রাটরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তার রাজ্যাধীন সমস্ত প্রজাসাধারণের অধিকার সংরক্ষণ ও বিচার কার্যকরকরণের দায়িত্ব রাজার উপর বর্তায়। ক্রমাগতভাবে রাজার নিরংকুশ প্রশাসনিক ক্ষমতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারের হাতে চলে যায়। এই সরকারই হয় দেশের জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও বিচার কার্যকরকরণের জন্য দায়ী। আজ পর্যন্ত এই সরকারের অনেক ধরন এবং বিভিন্ন রূপ জনসমক্ষে প্রতিভাত হয়েছে। এ হচ্ছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সমাজ বিবর্তন ইতিহাসের ধারাবাহিকতা।

মোটকথা, পৃথিবীবক্ষে মানুষের পদসঞ্চারের সাথে সাথে জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও অধিকার বঞ্চিত মানুষের উপর বিচার কার্যকরকরণে শক্তির প্রয়োগ অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিয়েছে। কেননা শক্তি ও ক্ষমতা (Power and Authority) ছাড়া তা করা কারুর পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এ শক্তি সকল পর্যায়েই ছিল নিরংকুশ (Unchallenged)। এই শক্তির বলেই অপরাধীকে পাকড়াও করে বিধি অনুযায়ী শাস্তি কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে। এ কালেও রাষ্ট্রীয় আইন (National Law, Law of the land-Civil Law) কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োজন সর্বাধিক। এই শক্তি না থাকলে কোন সরকারেরই পক্ষে সম্ভব হতে পারে না নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা এবং অপরাধীকে শাস্তি দেয়া বা তাকে দমন করা। বস্তুত শাস্তি বা দণ্ড এমন একটি অস্ত্র, যা সেই ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হয়, যে ব্যক্তি সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত নীতিসমূহ লংঘন করেছে এবং অন্যদের অধিকার হরণ করে স্বীয় লোভ ও লালসার চরিতার্থতার জন্য কোন কাজ করেছে।

www.pathagar.com

জীবন ও অধিকার

মানুষের জীবন কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত। দৈহিক—বস্তুগত, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক প্রভৃতি বিভাগ তার মধ্যে প্রধান। এর মধ্যে কয়েকটি তো এই দুনিয়ায় মানুষ হিসাবে জীবন-যাপন করার জন্য একান্তই অপরিহার্য। জীবনের এই বিভাগ গুলিতে কাজ করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বাস্তবমুখী কর্মতৎপরতা অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু এই ব্যাপারটিই মানব জীবনে সৃষ্টি করে কঠিন সমস্যা। প্রত্যেকটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে একান্ত নিজস্ব সুবিধা লাভের লক্ষ্যে স্বার্থবাদী তৎপরতা গ্রহণ করে, যার দরুন সাধারণভাবে গোটা সমাজের পক্ষে মারাত্মক এবং খুইব ক্ষতিকর পরিণতি, নেমে আসে। কেননা একজন মানুষ একই সময় একজন ব্যক্তি যেমন, তেমনি একটা সমাজের সদস্য-ও। তার মন-মানসিকতার গঠন সংগঠনও এমনই যে, তার মধ্যে ব্যক্তিক শক্তি ও সামষ্টিক শক্তি নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চালাতে থাকে। তার মূল কারণ হচ্ছে, তার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমাজ স্বার্থ উভয়ই তার উপর একই সময় সমান মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে। এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে ব্যক্তিবাদ বারবার সামষ্টিকতার অধিকার হরণ করে নেয় এবং সামষ্টিকতাও কেড়ে নেয় ব্যক্তির অধিকার। মানুষ সর্বপ্রথম ব্যক্তি, তারপর সে সমাজ সমষ্টির একজন। উপরন্তু ব্যক্তি-প্রবণতা তার মধ্যে অপেক্ষাকৃতভাবে অধিকতর প্রবল। আর অপরাধের মৌল কারণই হচ্ছে তা।

এই প্রেক্ষিতেই রাষ্ট্র ও সরকারের ভূমিকার মূল্যায়ন আবশ্যক। সকল যুগেই সরকার-শক্তি মানব জীবনে সংঘাতের কারণ ও ক্ষেত্রসমূহের বিনাশ ও সংকোচনের চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। কিন্তু মানব প্রকৃতি সব সময়ই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এই বিদ্রোহ-প্রবণতা অবদমিত করার জন্য মানুষের স্কন্ধে কর্তব্যের দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে চিরকাল। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রের সীমা নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করা হলে মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা ও সুসংবদ্ধতা আসতে পারে। তখন কারুর পক্ষেই অপর কারোর কর্মসীমার মধ্যে নাক গলানো সম্ভব থাকে না। ফলে প্রত্যেকেই অপর প্রত্যেকেরই অধিকার রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী হয়ে থাকা স্বীয় কর্তব্য বলে মনে করে। এই কাজে স্বতঃই উদ্যোগী না হলে সংঘাত প্রতিরোধের জন্য সরকারী শক্তি তাকে কর্তব্য পালনে বাধ্য করে। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মসীমা নির্ধারণ চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। অন্য কথায়, অধিকারসমূহ জীবনের বিভাগসমূহের জরুরী অংশ হয়ে দেখা দিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসীমার পরিধির মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে তৎপরতা চালাবার পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। তবে এই নিরাপত্তা সমান কর্তব্য পালনের বাধ্যবাধকতা-ও আরোপ করে। যেমন, এক ব্যক্তির বেঁচে থাকা যদি তার একটা অধিকার হয়, তা হলে সেই বিশেষ ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা দান ও তার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের সমান কর্তব্য সমগ্র মানব সমাজের উপর ধার্য হয়ে যায়।

www.pathagar.com

অধিকারের নিরাপত্তা

মানব প্রকৃতিতে বিদ্রোহের প্রবণতা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। এই কারণে স্বীয় সংকীর্ণ দৃষ্টির শিকারে পরিণত হয়ে মানব প্রকৃতি ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার লক্ষ্যে অন্যদের কর্মসীমাকে লংঘন করে তার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে বসে। তখন অনিবার্যভাবে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং এই সংঘর্ষের ফলে বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর জীবনে চরম বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন সামষ্টিক জীবনের প্রাণ-সম্পদ নিয়মতান্ত্রিকতা চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে। এই কারনে অধিকারসমূহ সংরক্ষণার্থে একটা কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করা একান্তই আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। এই পদ্ধতি যথাযথভাবে ও মাত্রায় কার্যকর হলে মানব প্রকৃতি নিহিত বিদ্রোহ প্রবণতা—যা অন্যদের অধিকারের সহিত সংঘর্ষ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়—স্বতঃই মৃত্যুবরণ করে।

ইসলাম এই উদ্দেশ্যে দ্বৈত পন্থা অবলম্বন করেছে ঃ মানুষের মন-মানসিকতার সংশোধন পরিশুদ্ধিকরণ এবং বাহ্যিক সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণ। প্রথম পন্থার কার্যকরতা বলিষ্ঠ হয়ে উঠে আল্লাহ্, রাসূল ও পরকাল বিশ্বাসের সাহায্যে এবং দ্বিতীয় পন্থা কার্যকর হয় প্রকাশ্য সরকার শক্তির বলে প্রতিরোধমূলক আইন প্রয়োগের মাধ্যমে। ইসলামের এই দ্বৈত পন্থা অবিচ্ছিন্ন। কেবল একটা পন্থা-ই তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছু মাত্র যথেষ্ট হতে পারে না। সর্বক্ষেত্রে মন ও মানসিকতার বিশ্বাসগত ওপরিবর্তন ও সংশোধন ব্যতীত নিছক বাহ্যিক আইন প্রয়োগ দ্বারাই বিদ্রোহ প্রবণতা দমন করা সম্ভব হয় না যেমন, তেমনি বাহ্যিক আইন প্রয়োগ শিকেয় তুলে রেখে শুধু মন-মানসিকতার পরিশুদ্ধি সাধন ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। বস্তুত সমাজকে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলামুক্ত করার জন্য এক সাথে উভয় পন্থার প্রয়োগ একান্তই অপরিহার্য, আর এই দু'টিই দীন ইসলামের এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আইনগত—এই উভয়বিধ সংশোধনী প্রক্রিয়ার ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটেছে দীন-ইসলামে। যেখানে যেখানে পূর্ণ ভারসাম্য সহকারে এই উভয় পন্থার প্রয়োগ হয়েছে, সেখানে-সেখানে ব্যক্তি মানুষ ও সামাজিক মানুষ পূর্ণ ইনসাফ সহকারে জীবন যাপন করার সৌভাগ্যে ধন্য হয়েছে।

وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ ط فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

....এবং আমরা নাযিল করেছি সেই নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে 'আল-কিতাব ও আল-মীযান'—যেন জনগণ সুবিচার ও ইনসাফ সহকারে জীবন যাপন করতে পারে এবং নাযিল করেছি 'লৌহ'—জবরদস্ত (প্রচণ্ড) শক্তি তথা সার্বভৌমত্ব, তাতে নিহিত রয়েছে বিরাট শক্তি, জনগণের জন্য বিপুল কল্যাণ। —সূরা হাদীদ ঃ ৬

www.pathagar.com

বস্তুত মানুষের স্বভাবসম্মত ও ইনসাফভিত্তিক অধিকারসমূহ যথাযথ পৌছিয়ে দেওয়া আল্লাহ্‌র বিধানের লক্ষ্য। আর এই কাজ রাষ্ট্র শক্তি বা সার্বভৌমত্বের সাহায্যেই কার্যত সম্ভবপর। মানুষের অধিকার সুনির্দিষ্টকরণ ও তার পুরাপুরি সংরক্ষণেরই অপর নাম ইনসাফ বা সুবিচার ও ন্যায়পরতা। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি ঈমান মানুষের মন-মানসিকতাকে অপরাধ থেকে বিরত রাখলেও এ উদ্দেশ্যে কেবল তা-ই যথেষ্ট নয় বলে আল্লাহ্ তা'আলা সাথে সাথেই বলেছেন রাষ্ট্রশক্তির কথা। ইসলামে এই দু'টিরই ভারসাম্যপূর্ণ প্রয়োগই কাম্য।

পূর্বোক্ত তিন প্রকারের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রথম দুইটি 'অতীব উচ্চতর সংস্কৃতিসম্পন্ন মানব মগজে' স্বতঃই কার্যকর হওয়া সম্ভব বলে কল্পনা করা যেতে পারে— যদিও কার্যত তা অসম্ভব-ই। কেননা এ দু'টি অবস্থায় ব্যক্তি নিজেই নিজের প্রশাসক, স্বতঃ সমালোচক, হিসাব গ্রাহক। এই ব্যবস্থা ঠিক তখনই কার্যকর হতে পারে, যখন প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষ নিজের মধ্যে এতটা উদারতা ও পরার্থপরতা জাগিয়ে তুলবে, যা সমাজ স্বার্থের জন্য ব্যক্তি স্বার্থকে অকাতরে উৎসর্গ করার জন্য তাকে প্রস্তুত করবে। এ এক অতীব উন্নত আদর্শিক পর্যায়। কিন্তু মানুষের বিদ্রোহ প্রবণ প্রকৃতির নিকট এরূপ আদর্শিক মাসের আশা করা অর্থহীন। এই কারণে এ আদর্শিক উন্নত পর্যায় অর্জনের জন্য প্রথম দুইটি পন্থার সাথে সাথে তৃতীয় পন্থাকটিকেও কার্যকর করে তোলা একান্তই অপরিহার্য। আর তা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক সুবিচার (Administration of Justice) ব্যবস্থা। মানব সমাজের বিদ্রোহ প্রবণ প্রকৃতিকে সংযত করার জন্য এই অতীব কার্যকর পন্থার উপর ইসলাম খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সুবিচার ব্যবস্থার ভিত্তি

প্রত্যেকটি মানুষের ন্যায়সঙ্গত ও স্বভাবসম্মত অধিকার যথাযথভাবে পৌছিয়ে দেওয়াই হচ্ছে বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব। মানুষের এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই হচ্ছে এই ব্যবস্থার ভিত্তি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভিত্তিটিকে কোন্ শক্তিবলে প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভবপর হতে পারে। বিশ্বমানবতার আদ্যোপান্ত ইতিহাস এবং আধুনিক কালের সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা উদাত্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, জনগণের অধিকার যথাযথ সংরক্ষণের অনন্য উপায় হচ্ছে এই অধিকার ক্ষুন্ন করাকে অপরাধ গণ্য করা এবং অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার মাত্রানুযায়ী অপরাধীকে ক্ষমাহীন পন্থায় শাস্তি প্রদান করা। এই শাস্তির কার্যকর ব্যবস্থা ছাড়া জনগণের অধিকার রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ ব্যাপারে কোন সমাজ ব্যবস্থারই ভিন্নতর কোন দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে না। যদিও কোন বিশেষ অপরাধে কোন্ শাস্তিটা কত মাত্রায় প্রয়োগ করা হবে কিংবা শাস্তিসমূহের স্বরূপ কি হবে, তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এই কারণে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ইনসাফ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু শাস্তি কার্যকর করা ছাড়া যে ইনসাফ হতে পারে না, তদ্বিষয়ে কোথাও কোন মতভেদ নেই।

www.pathagar.com

এই পর্যায়ে দু'টি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে, শাস্তিটা কি হবে এবং কেমন শাস্তি দেওয়া হবে। এই প্রশ্ন দুইটিই বিভিন্ন দেশের বিচার বিভাগের পক্ষে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রশ্নদ্বয়ের জওয়াব কোন্ দেশে কি দেয়া হয়েছে, অপরাধের স্বল্পতা বা আধিক্যতারই উপর নির্ভর করে। এই প্রশ্নদ্বয়ের সঠিক জওয়াব কি হতে পারে, সে আলোচনার পূর্বে দণ্ড সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার ব্যাপক পর্যালোচনা একান্তই জরুরী।

শিক্ষামূলক শাস্তি

'শাস্তি সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে—বিদ্রোহী মন-মানসিকতায় যে বিদ্রোহ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তা সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তিটা দেখে যেন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। ইংরেজী পরিভাষায় এই শাস্তিকে Ratterent বলা হয়। ইতিহাস সাক্ষী, এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দৃষ্টান্তমূলক বা শিক্ষা কিংবা উপদেশমূলক শাস্তিসমূহ চিরদিন অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যখনই কঠোর কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, সমাজে অপরাধের সংখ্যা দ্রুততার সহিত শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। আবার যখনই শাস্তির কঠোরতার মাত্রা কম করা হয়েছে, অপরাধের সংখ্যা তখনই হু হু করে বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। এ থেকে এই মূলনীতি পাওয়া যায় যে, শাস্তির কঠোরতা-নমনীয়তার সহিত অপরাধের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এই মৌলনীতিটি সর্বাবস্থায় এবং সকল দেশের অবস্থার প্রেক্ষিতেই অনুধাবনীয়।

মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে মানুষ অপরাধ করার জন্য একটা উদ্বোধন নিজের অভ্যন্তর থেকে লাভ করে। এই উদ্বোধন এবং তার পরবর্তী ফলশ্রুতির মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবেই একটা দ্বন্দ্ব চলে। সে দ্বন্দ্বে উদ্বোধন উত্তীর্ণ হলে এবং পরবর্তী ফলশ্রুতি অর্থাৎ সে অপরাধের অনিবার্য শাস্তি সংক্রান্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সে উদ্বোধনকে দমন বা পরাজিত করতে ব্যর্থ হলে বুঝতে হবে, শাস্তির কঠোরতায় শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণের মাত্রা অত্যন্ত দুর্বল রয়েছে। তখন ব্যক্তি অপরাধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কার্যত অপরাধ করে বসবে। কিন্তু অপরাধের পরবর্তী ফলশ্রুতি বা তৎসংক্রান্ত শাস্তিতে উপদেশ বা শিক্ষার মাত্রা প্রবল থাকলে ব্যক্তি অপরাধ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবে। অন্য কথায়, শাস্তিকে অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনের যোগ্য বানাবার লক্ষ্যে শাস্তিকে শিক্ষামূলক বানানোর মতাদর্শটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। তখন এই শিক্ষামূলক বা অপরাধ প্রতিরোধক শাস্তি সময়ের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে এমনভাবে কার্যকর করতে হবে, যার ফলে শাস্তিটা অপরাধের প্রতি মনস্তাত্ত্বিক উদ্বোধনের চূড়ান্ত মাত্রার প্রতিরোধক হয়ে থাকবে চিরকালের জন্য।

www.pathagar.com

শাস্তির ভয়াবহতা

শাস্তিকে ভয়াবহ করে অপরাধীর মনে একটা তীব্র ভীতির উদ্রেক করা এবং তার সাহায্যে ব্যক্তিকে অপরাধের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত রাখা শাস্তি সংক্রান্ত দ্বিতীয় ধরনের মতাদর্শের লক্ষ্য। এই মতাদর্শ অনুযায়ী ব্যক্তির মধ্যে অপরাধের উদ্বোধন হওয়া মাত্রই তার চোখের সম্মুখে শাস্তির ভয়াবহ রূপ এতই স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে উঠবে যে, তা দেখা মাত্রই উদ্বোধন কম্পিত ও অবদমিত হয়ে যাবে। অন্য কথায়, এই মতাদর্শ অনুযায়ী শাস্তিটাকে অবশ্যই এতটা ভযাবহ হতে হবে যে, খুব প্রচণ্ড ধরনের মনস্তাত্ত্বিক উদ্বোধনও কাউকে অপরাধ করার দিকে অগ্রসর হতে দিবে না। অর্থাৎ অপরাধীর ব্যক্তিগত সংশোধনের জন্য আতংক সৃষ্টিকারী শাস্তির ব্যবস্থা থাকা এবং তার যথাযথ কার্যকর হওয়াটা সুনিশ্চিত হওয়া একান্তই আবশ্যক। শুধু ঘোষিত শাস্তির ভয়াবহতাই অপরাধ প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট হয় না। তার কার্যকর হওয়ার নিশ্চয়তাও অবধারিত ও একান্তই অপরিহার্য। কেননা এটা পরীক্ষিত যে, চোরাচালানের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ 'ফায়ারিং স্কোয়াডে' দাঁড় করানোর ঘোষণা বারবার দেওয়া সত্ত্বেও চোরাচালানের অপরাধ থেকে অপরাধীদের বিরত রাখা কিংবা তার মাত্রা একবিন্দু হ্রাস করা সম্ভব হয়নি শুধু এই কারণে যে, এই অনুযায়ী অপরাধীদের অবশ্যই ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করানোর কোন নিশ্চয়তা ছিল না। ঘোষণাকারীদের প্রতিও আস্থা ছিল না যে, এই ঘোষণাকে তারা অবশ্যই কার্যকর করবে। বস্তুত শাস্তি যতই ভয়াবহ হবে এবং তার কার্যকরতা যতই সুনিশ্চিত ও অবধারিত হবে অপরাধীরা সেই অনুপাতেই অপরাধ থেকে বিরত থাকবে—থাকতে বাধ্য হবে, এটাই স্বাভাবিক।

প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থকরণের দৃষ্টিকোণ

বিশেষ কোন অপরাধে যারাই প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের মনে অতি স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠে। সুপ্রতিষ্ঠিত বিচার ব্যবস্থা অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে মজলুমের মনে জেগে উঠা সেই প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার পরিবেশও বাস্তব কারণে সৃষ্টি করে। কেননা অপরাধের দরুন কোন বিশেষ ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকারের উপর হামলা হওয়ার কারণে তার মনে প্রতিশোধের আগুন গলিত উত্তপ্ত লাভার মত তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে। প্রাচীনতম কালে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্বভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের স্বাধীনতা বা অনুমতি ছিল। বর্তমান কালেও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের ঘটনাবলী নিত্য সংঘটিত হতে যত্রতত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু একটি উন্নয়নশীল ও ক্রমবিকাশমান সমাজের পক্ষে এই পদ্ধতি শত রকমের সমস্যা সৃষ্টিকারী হয়ে দেখা দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা আইনের বিচারের তোয়াক্কা না করে 'আইন'কে নিজ হস্তে গ্রহণ করে। ফলে প্রতিশোধ স্পৃহা চরম প্রতিহিংসার রূপ পরিগ্রহ করে ব্যাপকভাবে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। কোন সুশৃঙ্খল সমাজ ও প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাই এইরূপ

www.pathagar.com

অবস্থাকে মুহূর্তের তরেও চলতে দিতে পারে না। এই কারণে রাষ্ট্র সরকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিভাবক হিসাবে প্রতিশোধ গ্রহণের সুষ্ঠু ও আইনসম্মত পন্থা বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ফলে শাস্তিটাকে অবশ্যই প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য যথেষ্ট ও তার মাধ্যম হওয়া একান্তই আবশ্যক। অন্যথায় ব্যক্তির মধ্যে জ্বলে উঠা প্রতিশোধ স্পৃহার আগুনের লেলিহান শিখা গোটা সমাজকে ভস্মীভূত করে দিবে। একটি প্রতিশোধ আরও অধিক মাত্রার এবং অনেক বেশি সংখ্যার অপরাধ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ফল কথা সমান মাত্রার অবস্থায় শাস্তিটা প্রতিশোধ স্পৃহাকে যত বেশি চরিতার্থ করার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে, ততই তৎপরবর্তী কালে সম্ভাব্য অপরাধের সংখ্যা ও মাত্রা হ্রাস করতে সাহায্য করবে।

সংশোধনমূলক শাস্তির দৃষ্টিকোণ

শাস্তির উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ না হয়ে অপরাধীর সংশোধন হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করে এইরূপ শাস্তির প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে অপরাধীর মন-মানসিকতা থেকে অপরাধ প্রবণতার মূলোৎপাটন করা। এই মতাদর্শ উপস্থাপকদের ধারণা, মূলত অপরাধ একটা রোগ বিশেষ। সেই 'রোগে'র কারণেই ব্যক্তি অপরাধ করতে বাধ্য হয়। অতএব তাকে কোনরূপ শাস্তিদান সুবিচারমূলক পদক্ষেপ নয়। বরং উত্তম ও শোভন পন্থা হচ্ছে, অপরাধীর এই অপরাধ রোগের মূলে নিহিত কারণসমূহের সন্ধান করা এবং তা দূর করে তার মন-মানসিকতাকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করে তোলা।

এই মতের যথার্থতা প্রশ্নাতীত নয়। অপরাধ প্রবণতাকে রোগের মত মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা অপরাধের মূলে ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যোগ ও সংকল্প অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু রোগের পিছনে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসলে কোন 'রোগে'র কারণে মানুষ অপরাধ করে না। সে জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছা সংকল্প ও উদ্যোগ ব্যক্তির ইচছাধীন ও স্বেচছামূলক। অবশ্য এই উদ্বোধনের কারণ বিভিন্ন হতে পারে। ফলে কার্য ও কারণের আলোকে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র অপরাধের কারণ নির্ধারণে বহু কাজ মনস্তত্ত্ববিশারদের প্রয়োজনীয়তার সাথে সাথে সংশোধনী প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য আরও বহু কয়জনের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। আর মনস্তত্ত্ববিশারদরা মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে যতই পারদর্শী বা বিশারদ হোক না কেন, মানব মনের গভীর সূক্ষ্ম জটিলতা ও বৈচিত্র্যের কারণে তার সমস্ত অবস্থা ও স্বরূপ নির্ধারণ এবং এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভুল হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ কিছু মাত্র সহজ কাজ নয়। এই ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ববিদদের সাফল্যের পরিবর্তে ব্যর্থতাই অবধারিত।

উপরন্তু একবারের চিকিৎসার পর রোগী পুনরায় অপরাধ করে বসলে তখন তার সমস্ত দায়িত্ব সেই মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসকদেরই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কোন মনস্তত্ত্ববিদই সেজন্য প্রস্তুত বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত নয়। ফলে অপরাধের

www.pathagar.com

উদ্বোধনের বাস্তব সম্মত চিকিৎসা সম্ভবই হবে না। তার পরিণামে অপরাধের মাত্রাতিরিক্ততা ও সংখ্যাধিক্য সম্পূর্ণ নিশ্চিত বলা যায়। তাই এই সংশোধনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণরূপে গুরুত্বহীন মনে না করেও তা একটি লক্ষ্য বা একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহণ করা কোন রাষ্ট্র সরকারের বিচার বিভাগের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। পূর্বোদ্ধৃত তিনটি দৃষ্টিকোণ অবলম্বনে যে শুভ ফলশ্রুতির আশা করা যায়, মনস্তাত্ত্বিক উদ্বোধন প্রতিরোধের জন্য সংশোধন পদ্ধতি অবলম্বনের অনুরূপ ফলশ্রুতির আশা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা উদ্বোধনের আসল উৎস হচ্ছে মানুষের মধ্যে নিহিত বিদ্রোহী প্রকৃতি। আর তা কোন মনস্তাত্ত্বিক রোগের ব্যাপার নয়। অবশ্য এটা অসম্ভব নয় যে, কোন কোন অবস্থায় কোন মনস্তাত্ত্বিক রোগও অপরাধের উদ্বোধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এই পর্যায়ের অপরাধীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য দণ্ড দর্শনকে পরিবর্তন করা কোনক্রমেই উচিত হতে পারে না। খুব বেশি কিছু করা হলে পাগলদের অপরাধের ন্যায় সেই সব অপরাধেরও স্বরূপ নির্ধারণ করা যাবে, যেসবের জন্য সংশোধনমূলক শাস্তি পদ্ধতি উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন শিশু অপরাধীদের জন্য এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যার ফলে তাদের মনে অপরাধের প্রতি তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে দেয়া সম্ভব হবে এবং তারা স্বতঃই পরিচ্ছন্ন ও অপরাধমুক্ত জীবন যাপনে আগ্রহী হয়ে উঠবে। কেননা সংশোধনমূলক শাস্তি দর্শনের ক্ষেত্র খুবই সীমিত। তাই সাধারণ দণ্ড দর্শন নির্ধারণের লক্ষ্যে তা পরিহার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকতে পারে না।

অতঃপর প্রথমোক্ত তিনটি দৃষ্টিকোণ বা মতাদর্শের ভিত্তিতে 'তাযীর' বা শাস্তির যে ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, তাতে যদি তিনটি লক্ষ্যই পূর্ণমাত্রায় অর্জিত হয় তা হলে তা সমাজকে অপরাধ ও দুষ্কৃতির দরুণ সৃষ্ট অশান্তিকর ও নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির মুকাবিলা করার উপযোগী বানাতে পুরামাত্রায় সফল হতে পারবে বলে আশা করা যায়। আর তন্মধ্যে একটি লক্ষ্যও যদি পুরামাত্রায় পূর্ণ না হয় তা হলে মনে করে নিতে হবে, এই সংকীর্ণ ছিদ্রপথে অপরাধের সমুদ্র প্রবাহ ছুটে চলবে। গোটা সমাজকে রসাতলে ভাসিয়ে নেয়ার জন্য তা হবে পূর্বাভাস মাত্র।

এক্ষণে আমরা একটি মতাদর্শের ভালো-মন্দ ও দোষ-গুণ আলোচনা করে একটা উন্নত মানের ও আদর্শস্থানীয় মতাদর্শের সন্ধান করতে সচেষ্ট হব।

শিক্ষামূলক শাস্তি

উপরে বলে এসেছি, শাস্তিটা শিক্ষামূলক বা দৃষ্টান্তস্থানীয় হলেই অপরাধের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাবে। কেননা, পূর্বে যেমন বলেছি, অপরাধের কারণ হচ্ছে 'উদ্বোধক'। অনুকূল পরিবেশে তা অধিক শক্তিশালী হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং প্রতিকূল পরিবেশে তা দমে যায়। বর্তমানের সভ্যতাগর্বী ও সংস্কৃতি ধন্য জগতে সাধারণত যে ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়, ফাঁসি, জেলে আটক বা জরিমানা প্রভৃতিই তার রূপ। কিন্তু

www.pathagar.com

এই তিন প্রকারের শাস্তির প্রয়োগ পদ্ধতিতে শিক্ষামূলকতা বা দৃষ্টান্তস্থানীয় হওয়ার কোন গুণই অবশিষ্ট থাকে না। ফাঁসির কথাই ধরা যাক। তা একটি শিক্ষামূলক শাস্তিহলেও যেহেতু তা কারাগারের গোপন কুঠরিতে এত গোপনীয়তা সহকারে কার্যকর করা হয় যে, সেই কারাগারের অন্যান্য কয়েদীরাও তা দেখা তো দূরের কথা, টেরও পায় না। এক-একদিন বা এক-এক সময় হয়ত বহু কয়জনকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে মারা হয়; কিন্তু সাধারণ কয়েদী বা জনজীবনে তার একবিন্দু প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। তার অর্থ, আধুনিক কালের কঠিন-কঠোর শাস্তিসমূহ মানব-মনে প্রতিক্রিয়ার এতটুকু তরঙ্গও জাগাতে পারে না। তা কখনই শিক্ষামূলক বা দৃষ্টান্তস্থানীয়—যা দেখে অন্যরা অনুরূপ শাস্তির অপরাধ এড়িয়ে চলার সংকল্প গ্রহণ করবে—হতে পারে না। কারাগারের পাশ দিয়ে যাতায়াত কালে হয়ত মনে জাগবে যে, এর মধ্যে শত শত লোক তিল তিল করে বন্দী জীবন যাপন করছে। কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তে তার সমস্ত প্রভাব মনের কল্পলোক থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। ফলে এই মৃত্যুদণ্ড বা বন্দীদশা জনগণের মধ্যে অনুরূপ পরিণতির অপরাধ থেকে বিরত থাকার প্রবণতা জাগাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ জন্যে এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনার যে খুব বেশি প্রয়োজন, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

এই দৃষ্টিতে বলা যায়, এই ফাঁসির দণ্ড যদি কারাগারের অভ্যন্তরে নয়—প্রকাশ্যভাবে ও বিপুল জনতার উপস্থিতিতে কার্যকর করা হয়, তা'হলে তা নিঃসন্দেহে শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তস্থানীয় হতে পারে। সাধারণ মানুষের মধ্যে হত্যা অপরাধের কোন কোন উদ্বোধন থেকে থাকলে তা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলন্ত অপরাধীর কল্পনায় স্বতঃই মৃত্যুবরণ করবে।

অনুরূপভাবে কোন অপরাধের শাস্তি স্বরূপ কাউকে দ্বীপান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত করা হলেও তা জনগণের জন্য তেমন শিক্ষামূলক হয় না। কোন অপরাধী সেখান থেকে দীর্ঘদিনের শাস্তি ভোগ করে প্রত্যাবর্তন করলেও কেউ জানতেই পারবে না যে, সে একজন অপরাধী এবং দীর্ঘমেয়াদী দ্বীপান্তরের শাস্তি ভোগ করে ফিরে এসেছে। তার জীবন কোন অপরাধের কালিমায় কলুষিত হয়ে আছে, তা কারুর পক্ষে আঁচ করাও সম্ভব হবে না। কিন্তু এর বদলে যদি তার জন্য এমন কোন শাস্তি সাব্যস্ত করা হতো, যা তাকে অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করে দিত, তা'হলে তা অবশ্যই সকলের জন্য শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তস্থানীয় হতো এবং তার ফলে জনমনে অনুরূপ অপরাধ থেকে দূরে সরে থাকার একটা প্রবল ইচ্ছা ও চেষ্টা সক্রিয় হয়ে উঠত। এ থেকে স্পষ্ট মনে হয়, পাশ্চাত্য আইনের প্রস্তাবিত শাস্তিসমূহ জনগণকে অপরাধবিমুখ বানাক, প্রস্তাবকরা তা আদৌ চায়নি। ফলে তা এই দিক দিয়ে জনজীবনে কোন রেখাপাত করেনি, সমাজকে পারেনি অপরাধমুক্ত করতে। তাই একথা স্বীকার না করে কোন উপায়ই নেই যে, অপরাধের জন্য সেই শাস্তিই যথার্থ ও উপযোগী, যা জনগণকে অনুরূপ অপরাধ থেকে সযত্নে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে।

www.pathagar.com

জোরপূর্বক অপরাধ পরিহারের শাস্তি

বর্তমানকালে প্রচলিত কতিপয় শাস্তিতে নিবর্তনমূলক ভাবধারা কিছুটা রয়েছে বলে মনে হয়। এ উদ্দেশ্যে অপরাধীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক কারাগারে আটকে রাখার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই 'আটক' অপরাধীকে ভীত করে অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত করার কোন ক্ষমতারই অধিকারী নয়। বলতে গেলে এ কালের কারাগারসমূহ অপরাধ বিজ্ঞানের সুদৃঢ় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের কোন অপরাধী কিছুকাল কারাজীবন লাভ করতে পারলে সে একজন অতীব দক্ষ ও পাকাপোক্ত এবং দুঃসাহসী অপরাধী হয়ে বের হয়ে আসে। এহেন অপরাধী যখন কারামুক্তি লাভ করে, তখন সে আর কোন দিন অপরাধ করবে না এই সংকল্প লয়ে বাইরে আসে না। বরং অধিকতর দক্ষতার সহিত অপেক্ষাকৃত বড় বড় অপরাধের সংকল্প নিয়েই কারাগারের দ্বারদেশ অতিক্রম করে এবং মুক্ত হাওয়ার স্পর্শে সে সংকল্প আরও দৃঢ় রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে এ কথায় কোনই সন্দেহ থাকে না যে, জেলে আটকে রাখা—তার মেয়াদ যা-ই হোক—অপরাধীকে অপরাধবিমুখ এবং সমাজকে অপরাধমুক্ত বানাতে কিছুমাত্র সহায়ক নয়। এ বিষয়ে গভীরভাবে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থকরণ

কারুর অপরাধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনে স্বাভাবিক-ভাবেই যে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠে, তা প্রশমিত করার ব্যাপারে আধুনিক শাস্তি ও শাস্তিদান পদ্ধতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। কোন চোর বা ডাকাতকে কিছুদিনের জন্য কারাগারে আটকে রাখলে সেই চুরি বা ডাকাতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কি লাভ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে তো এ শাস্তিটা এতই হাস্যকর পর্যায়ে হয়, যার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনে প্রতিশোধ স্পৃহা প্রশমিত হওয়ার বদলে আরও অধিক তীব্র হয়ে জেগে উঠে এবং সেই স্পৃহার চরিতার্থতার জন্য তারা নিজেরাই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে অপরাধের মাত্রা ও সংখ্যা অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। তাই অপরাধীকে দেয় শাস্তিতে এই ভাবধারাটির পূর্ণ অবস্থিতি যে একান্তই জরুরী, অন্যথায় শাস্তিটাই অর্থহীন হয়ে যায়, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

সফল ও সার্থক শাস্তি

উপরোদ্ধৃত বিশ্লেষণে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বর্তমান কালের শাস্তি-সংহিতার মৌলিক পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় অপরাধমুক্ত সমাজ গঠন কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না। অপরাধের মাত্রা ও সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধিই পেয়ে যাবে—পেতে থাকবে, তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

www.pathagar.com

তাই শাস্তিতে পূর্বোক্ত তিন প্রকারের ভাবধারার এক সাথে ও পুরোমাত্রায়ই উপস্থিতি একান্তই জরুরী। এজন্য নবতর শাস্তি-সংহিতা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। সমাজকে অপরাধমুক্ত করা তো দূরের কথা, অপরাধের মাত্রা ও সংখ্যা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে অপরাধের অপরাধত্ব, তার জন্য প্রদত্ত শাস্তির যথার্থতা এবং অপরাধ চিহ্নিতকরণ ও শাস্তি বিধান কর্তৃপক্ষের প্রতি ব্যক্তির একটা অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আস্থা থাকার আবশ্যকতা ও আলোচনা থেকে প্রকট হয়ে উঠে। কেননা যে কাজটিকে অপরাধ বলা হচ্ছে তা যে বাস্তবিকই অপরাধ, সেই বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় না থাকলে তা পরিহার করে চলার প্রবণতা জেগে উঠতে পারে না। আর তা-ই যদি না জেগে উঠল, তাহলে তা কেউ পরিহার করে চলবে বলে কোনই আশা করা যেতে পারে না। দ্বিতীয়, কোন অপরাধের জন্য যে শাস্তি নির্দিষ্ট ও ঘোষিত, তা-ই যে উক্ত কাজের (অপরাধের) যথার্থ শাস্তি, তা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না—হওয়া উচিত নয়, এই বিষয়েও একটা অবিচল বিশ্বাস থাকা একান্তই জরুরী। নতুবা অপরাধী শাস্তিকে শুধু ভয় করবে না তা-ই নয়, তার প্রতি জাগবে একটা বিদ্রুপের ভাবধারা। সে শাস্তিকে যথার্থ বলে মেনে নিতে কোনক্রমেই রাযি হবে না। সেই সাথে তৃতীয় যে ভাবধারাটি সর্বোপরি ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রূপে স্বীকৃত, তা হচ্ছে, কোন কাজকে অপরাধ বলে ঘোষণাকারী এবং তার জন্য শাস্তি বিধানকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি মনের গভীরতর প্রদেশে একটি বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এই বিশ্বাস না থাকলে কোন কাজকে অপরাধ বলে এবং তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তিকে শাস্তি বলে মেনে নেওয়াই সম্ভবপর হবে না কারুর পক্ষে। আধুনিক কালে প্রচলিত আইনের শাসন এই কারণেই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গেছে। সাধারণভাবে নাগরিকদের মনে এবং বিশেষভাবে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের মনে—তার যত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদেই নিযুক্ত থাক না কেন—প্রচলিত আইনের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধও নেই বলেই আইনের শাসনের এই মর্মান্তিক ব্যর্থতা।

সাধারণভাবে অপরাধ বিমুখতা সৃষ্টি এবং সমাজকে অপরাধমুক্ত করার পথে আর একটি বাধা বর্তমানে ব্যাপক ও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। তা হচ্ছে, অপরাধের শাস্তি অধিকতর নমনীয় করার চেষ্টা। তথাকথিত 'উন্নত' ও 'সুসভ্য' সমাজে কঠিন ও কঠোর শাস্তিসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষিত হয়েছে। এসব দেশের জনমত কঠিন ও কঠোর শাস্তিসমূহকে 'বর্বরতা' ও 'অসভ্যতা' নামে অভিহিত করেছে এবং তা খতম করার জন্য সেখানকার জনগণ অত্যন্ত বেশি সোচ্চার ও সচেষ্ট। কিন্তু এর মূলে নিহিত কারণটি কি ?

আসলে পাশ্চাত্য ধর্মহীন দর্শনের মৌল দৃষ্টিকোণই ভুল। এর প্রথম মৌল ধারণা হচ্ছে, এই খোদাহীন বস্তু জগতে মানুষ পশু পরিবারে কতিপয় দুর্ঘটনার সাযুজ্যের ফলে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সে কোন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ও সুবিজ্ঞানী স্রষ্টার সৃষ্ট নয়।

www.pathagar.com

সে নয় কোন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্তা। তার উপর 'খিলাফত' নামের কোন আদর্শ বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত নয়, সে তার কার্যকলাপের ব্যাপারে কোন উচ্চতর সত্তার নিকট জবাবদিহি করতেও বাধ্য নয়।

মানবেতিহাস সম্পর্কিত এই মৌল বস্তুবাদী দর্শনের বিশেষ দৃষ্টিকোণ হচ্ছে— মানুষ ইতিহাস-পূর্ব কালে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ এবং তখন মানুষ বন্য জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় জীবন যাপন করতো আর এভাবেই হয়েছে তাদের জীবনের সূচনা। উত্তরকালে বহু মানুষের একত্রিত জীবন যাপনের কারণে তাদের মধ্যে সভ্যতার সূচনা হয়। এই সময় এমন কিছু কষ্টদায়ক ও অবাঞ্ছিত কার্যকলাপকে 'অপরাধ' বলে চিহ্নিত করা হয়, যা সামষ্টিকভাবে কোন 'সভ্য সমাজ অংশের' সব অংশীদাররা বন্ধ করতে চেয়েছিল। সে সব অপরাধের জন্য তারা নিজেদের 'অর্ধসভ্য' ও 'অর্ধ-অসভ্য যুগের' চাহিদা অনুযায়ী সভ্যতা পরিপন্থী শাস্তিসমূহ নির্ধারণ করে। এ যুগের অপরাধ ও শাস্তি নির্ধারণের উপর সাধারণত ধর্ম বা দেবতাদের প্রচ্ছায়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সেই সাথে পূর্বপুরুষের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে তাতে 'পবিত্রতা'র ভাবধারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন সে বিষয়ে স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধির আলোকে চিন্তা বিবেচনা করার কোন ক্ষমতা বা যোগ্যতাই কারুর মধ্যে ছিল না। এক্ষণে 'সুসভ্য পাশ্চাত্যে'র নেতৃত্বাধীন যে নবতর সভ্যতার উজ্জ্বলতর যুগের আবির্ভাব ঘটেছে, তাতে 'অপরাধ' ও 'শাস্তি' সংক্রান্ত মতাদর্শসমূহকে বিবেক-বুদ্ধির ভিত্তিতে নতুন করে সভ্যতার মানে নিয়ে আসতে হবে। তবেই তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে।

একালে নবতর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নীতিগতভাবে জনগণের এবং কার্যত প্রতিনিধিত্বশীল পার্লামেন্টের সংখ্যাগুরু শাসক দলের হাতে অপরাধ নির্ধারণ ও শাস্তি সাব্যস্তকরণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কোন কাজ অপরাধ কিনা, অপরাধ হলে তা কতটা এবং তার জন্য শাস্তি কি হতে পারে, জনমতের আলোকে সেই শাসক দল-ই তা নির্ধারণ করে পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদের মধ্যে দাঁড়িয়ে। নতুন যুগের এই 'বিধানদাতা শক্তি' যখন ইচ্ছা যে কোন 'অপরাধ'কে 'শুভ কাজ' এবং যে কোন 'শাস্তি'কে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করতে পারে। তা ঠেকানো কারুর পক্ষেই সম্ভব হয় না।

আর ঠিক এই কারণেই দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা কঠিন-কঠোর শাস্তিগুলিকে বাতিল করে দিয়ে খুব-ই হাল্কা ধরনের নাম-কা-ওয়াস্তের শাস্তি নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু সমাজ-জীবনে এর প্রতিক্রিয়া যে কি হতে পারে, তা পরবর্তী দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাই সঠিকভাবে বলতে পারবে। তবে যুক্তির ভিত্তিতে বলতে পারি, অপরাধের শাস্তি যতই নমনীয় হবে, অপরাধের ব্যাপকতা ও প্রসারতা ততবেশি মারাত্মক হয়ে দেখা দিবে। এ তো অতি স্বাভাবিক কথা, কেননা হালকা-শাস্তি অপরাধের উদ্বোধনকে নির্মূল করতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার পদলেহনকারী একালের লোকদের চোখে হত্যাকাণ্ড, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ও মদ্যপানজনিত

www.pathagar.com

মাত্লামীতে কোনরূপ 'বর্বরতা' পরিলক্ষিত হয় না। বরং সমাজ যদি এসব মারাত্মক ধরনের অপরাধ রোধ এবং জনজীবনকে নিরাপত্তাপূর্ণ করার লক্ষ্যে অপরাধের অপরাধীদের কোন শাস্তি দিতে চায়, তা'হলে তাতেই তারা 'বর্বরতা' ও 'অসভ্যতা' দেখতে পায় এবং সাথে সাথে তা বন্ধ করার জন্য চিৎকার করে উঠে। অপরাধীদের জন্য তাদের মনে সীমাহীন প্রীতি ও সহমর্মিতার অমিয় প্রস্রবণ সদা প্রবহমান ; কিন্তু সেসব অপরাধে যারা নির্মূল হলো, যথা—সর্বস্ব হারালো এবং ভীষণভাবে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তাদের প্রতি এদের মনে এক বিন্দু দয়ারও উদ্রেক হয় না। আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার এ একটা বিশেষ অবদান বলে মনে করতে হবে।

আসলে প্রকৃত মানবতার সাথেই এদের চিরন্তন শত্রুতা। আর মানবতার মৌল আদর্শের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও অনীহাই উপরোক্ত মনোবৃত্তির মূলে নিহিত কারণ। অমানবিকতাকেই তারা সভ্যতা এবং পাশবিকতাকেই তারা আধুনিক সংস্কৃতি বলে মর্যাদা দিচ্ছে। মানবিক মর্যাদা রক্ষার সকল চেষ্টা প্রচেষ্টাকেই তারা বানচাল করে দিতে বদ্ধ পরিকর।

এ কালের আইন দর্শনে যে দ্বন্দ্ব, মূলত তা এই ভ্রান্ত চিন্তাধারারই ফল। অথচ মানবতার মর্যাদাহানিকর কার্যাবলী প্রতিরোধ করার জন্য কঠিন ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও প্রয়োগ করা যে একান্তই অপরিহার্য তাতে কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির মানুষের একবিন্দু মতবিরোধ থাকতে পারে না। অপরাধের শাস্তি যদি 'ভয়াবহ' ও 'আতংক সৃষ্টিকারী' না হয়, তাহলে মানুষ যে অপরাধ থেকে বিরত থাকবে না, তা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন পড়ে না। 'যেমন কর্ম তেমন ফল'—'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন' কথাটি তো সাধারণ সত্যরূপেই প্রচলিত। কিন্তু এক্ষণে তার বিপরীতটাই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।

এ দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হচ্ছে, শাস্তি যত কঠিন ও কঠোর হবে, যত শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তস্থানীয় এবং ভয়াবহ ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী হবে এবং যত নিবর্তনমূলক হবে, জনসমাজ ততই অপরাধমুক্ত হবে। পক্ষান্তরে শাস্তি যতই নমনীয় বা হালকা হবে, সমাজে অপরাধের উদ্বোধন ততই তীব্র হয়ে উঠবে। আর অ-যথেষ্ট শাস্তি এবং কঠোর শাস্তির কার্যকরতার অনিশ্চয়তাও অপরাধ দমনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফলে অপরাধের মাত্রা ও সংখ্যা অনেক-অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। আধুনিক ইউরোপীয় দেশসমূহের আদালতের 'রেকর্ড'ই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, সর্বত্র অপরাধের মাত্রা কত ব্যাপক। এরপরও যদি শাস্তি হাল্কা করে দেয়া হয়— কঠিন-কঠোর শাস্তি সমূহ বাতিল করা হয় বা তার কার্যকরতা সুনিশ্চিত না হয়, তাহলে সে সব দেশে সভ্য শান্তিকামী মানুষের জীবন যে সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে, তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। এমন সময় দূরে নয়, যখন অতি সাধারণ ও নগণ্য ব্যাপারেও মানুষ কঠিন-কঠোর মাত্রায় প্রতিশোধ গ্রহণে মেতে উঠবে। বিচারের দণ্ড নিজ হাতে তুলে নেবে। সভ্য সমাজ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে যে বিচার বিভাগের উদ্ভাবন করেছে, তা নস্যাৎ

www.pathagar.com

করে 'স্বহস্তে প্রতিশোধ গ্রহণের' দৈত্য (Evils of voilant self help) নগ্ন নৃত্যে মেতে উঠবে, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর তার ফলে মানব সমাজ ধীরে ধীরে সেই ইতিহাস পূর্বকালীন বর্বরতা ও অসভ্যতার শিকার হবে, অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে ফিরে যাবে, যা এর অবধারিত পরিণতি। সে যুগে জৈবশক্তিই ছিল সুবিচারের মানদণ্ড (Might is right)।

কিন্তু আজকের দিনে তার কল্পনা করাও সভ্য মানুষের পক্ষে চরম অবমাননাকর। অপরাধ ও শাস্তি পর্যায়ে এ ধরনের 'দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা' মানুষের জন্য আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা প্রকৃতি মানবতার ধ্বংস চায় না, চায় বিকাশ, অগ্রগতি ও ধাপে ধাপে উন্নতি। কিন্তু শাস্তির ক্ষেত্রে নমনীয়তা অপরাধ বৃদ্ধির কারণ ঘটাবে, মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। তাই এই নমনীয়তার মতাদর্শ অগ্রাহ্য করে শাস্তি কে গ্রহণ করতে হবে। যা যা অপরাধ রূপে চিহ্নিত, তাকে অপরাধ মনে করতে হবে এবং তার জন্য যে, শাস্তি নির্ধারিত তার প্রতিও শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে হবে। আর এই অপরাধ ও তার জন্য শাস্তি নির্ধারণকারী হতে হবে এমন এক সত্তাকে, যার প্রতি একটা সাধারণ শ্রদ্ধাবোধ ও সমীহ ভাব সকল মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান। অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে এর বিকল্প কিছু নেই।

আদর্শ শাস্তির শিক্ষামূলক হওয়াটাও একান্তই প্রয়োজনীয়। কেননা সমান অবস্থায় শাস্তি যতই শিক্ষামূলক হবে, অপরাধের উদ্বোধন ততই বাধাগ্রস্ত হবে। এই কারণে শাস্তিসমূহ গোপনে নয়, প্রকাশ্যভাবে ও জনগণের উপস্থিতিতে কার্যকর করার ব্যবস্থা করতে হবে। শাস্তির শিক্ষামূলক হওয়ার বাস্তবতা এটাই। আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এটাই দেখা গেছে যে, জনগণকে যে কাজ থেকে বিরত রাখা কাম্য, তা করার অপরাধের শাস্তি সাধারণত প্রকাশ্যেই কার্যকর করা হয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড দান প্রকাশ্যভাবে করাই সাধারণ নিয়ম। অপরাধীর উপর কার্যকর শাস্তি যদি জনগণই প্রত্যক্ষ করতে না পাললো, তাহলে সেই অপরাধ থেকে জনগণের বিরত থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অতএব শাস্তি শুধু কঠোর-কঠিনই নয়, প্রকাশ্যভাবে কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়াও একান্তই কর্তব্য।

শাস্তিকে নিবর্তনমূলকও হতে হবে অর্থাৎ প্রয়োজনে অপরাধীকে জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কয়েদী জীবন যাপনে বাধ্য করতে হবে। কেননা পরিস্থিতি এরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে যে, অপরাধীকে আটকে না রাখলে তা অপরাধমূলক কার্যকলাপে সাধারণ মানুষের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠতে পারে, তারা কঠিনভাবে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। এ ধরনের অপরাধীকে কারাগারে আটকে রাখা হলে অপরাধজনক কার্যকলাপ থেকে তাকে বিরত রাখা সম্ভবপর হতে পারে। সেই সাথে আশা করা যেতে পারে যে, কারাগার থেকে মুক্তির পর সে কারাজীবনের দুঃসহ কষ্টের কথা স্মরণ করে অনুরূপ অপরাধজনক কাজের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।

www.pathagar.com

কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমানকালের কারাগারগুলির অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। এখানে কেবলমাত্র রাজবন্দী ছাড়া অন্যান্য সকল অপরাধের কয়েদীরা পরস্পরের সহিত একত্রিত হওয়ার ও কথাবার্তা বলার বিরাট সুযোগ পায় বলে তথায় অভ্যস্ত কয়েদীরা অন্যান্য সরল বা নতুন অপরাধী কয়েদীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের পাক্কা অপরাধী বানিয়ে দেয়। ঘটনাবশত (Accidentally) অপরাধকারী কয়েদীরা ঘাগু অপরাধী হয়ে গড়ে উঠবার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে। তাছাড়া সাধারণ কয়েদীরা যেরূপ কষ্টের জীবন কাটাতে বাধ্য হয়, তাতে তাদের মনে গোটা সমাজ ব্যবস্থার প্রতি একটা বীতশ্রদ্ধা একটা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের আক্রোশ জেগে উঠাও অসম্ভব নয়। এই কারণে অপরাধীরা অপরাধ করার পর কারারুদ্ধ হয়েও কারাগারের চার প্রাচীরের অভ্যন্তরে অপরিচিতির অস্বস্তি ভোগ করে না। ফলে কারাগারের শাস্তি তাদের জন্য শাস্তিরূপে প্রতিভাতই হয় না। তা হয়ে উঠে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভের মনোরম কেন্দ্র বিশেষ।

এই কারণে শাস্তিটা অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক হতে হবে। অপরাধী যখন অপরাধের কারণে এক অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে থাকবে, তখন পরবর্তী জীবনে এই পরিবেশগত অপরিচিতির ভয়ে অন্তরের উদ্বোধনকে অপরাধের কারণ হতে দেবে না। এ উদ্দেশ্য লাভের জন্য দৈহিক কষ্টদান বা নির্যাতন সর্বাধিক কার্যকর শাস্তি মনে করা যেতে পারে। তার কথা স্মরণ করে মানুষ সব সময়ই এমন ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকতে বাধ্য হবে যে, অনুরূপ অপরাধ করতে সে আর কখনই মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে না। অপরাধের শাস্তিস্বরূপ দৈহিক নির্যাতন এ কালের আইনেও সমর্থিত এবং কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কারাগারের অভ্যন্তরেও যেসব অপরাধী অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে না, আজও তাদের বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হয়। আর এটা যখন 'বর্বরতা' বিবেচিত হচ্ছে না, তখন এ ধরনের শাস্তি প্রথম কৃত অপরাধের দরুন দেয়া হলে তা অবশ্য প্রতিবাদমূলক ভাবধারা সম্পন্ন শাস্তিরূপে সফল হতে পারে এবং অনেক ঝঞ্ঝাট থেকে বেঁচে যাওয়াও সম্ভব।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন উঠে। তা হচ্ছে, যেসব সরল অপরাধীদের জন্য শুধু কারাগারে আটকই সংশোধনের কারণ হতে পারে, তাদের এই কঠিন শাস্তি দেয়া হবে কেন ? ....এই প্রশ্নের জওয়াবে আমাকে আবার বলতে হবে অপরাধীদের প্রতি এতটা দয়া ও সহানুভূতি জেগে উঠার কারণ কি ? অথচ এই অপরাধীরা সমাজের লোকদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক ক্ষতিকর। তাদের প্রতি এহেন দয়া ও সহানুভূতি পরিণামে তো অপরাধের সংখ্যা ও মাত্রা বৃদ্ধির কারণ হবে এবং মানব জাতিকে কঠিন বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করার সমতুল্য হবে। এমতাবস্থায় অপরাধীদের জন্য–অপরাধ দমনের লক্ষ্যে কঠিন-কঠোর শাস্তির মতাদর্শ কেন গ্রহণ করা হবে না ? ....শাস্তি তো শুধু

www.pathagar.com

তাকেই দেয়া হবে, যে অপরাধ করেছে। কোন নিরপরাধ বা শান্তিপ্রিয় সুনাগরিকের পক্ষে কঠিন-কঠোর শাস্তি ভয়ের কারণ হয়ে দেখা দেবে কেন ? মন রাখা আবশ্যক, শাস্তির প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে অপরাধীর ব্যক্তিগত সংশোধন। তা তো শাস্তির প্রতিবাদমূলক ভাবধারার দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। অন্য কোন প্রক্রিয়ায় অপরাধীকে তো সংশোধন করা যাবে না।

আদর্শ শাস্তির প্রতিশোধমূলক হওয়ার গুরুত্বও কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। কেউ যখন অপর কারুর অধিকার হরণ করে, তখন এই নির্দয়তার বিরুদ্ধে মযলুমের হৃদয়-মনে একটা তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব সঞ্চারিত হয়। তা-ই অধিকার হরণকারী যালিমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের একটা বিশেষ উদ্বোধন সৃষ্টির কারণ হয়ে দেখা দেয়। এই বিশেষ ঘৃণা ও বিদ্বেষভাবের তীব্রতায় মযলুম যালিমের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপই গ্রহণ করে, তা-ই প্রতিশোধ নামে অভিহিত। দুনিয়ার অপরাধের রেকর্ডসমূহ প্রমাণ করবে, এই প্রতিশোধ স্পৃহার চরিতার্থতার কারণেই সাধারণত অপরাধীরা বড় বড় অপরাধ করে বসেছে। এই কারণে শাস্তিটাকে অবশ্যই এই প্রতিশোধ স্পৃহার আগুন নির্বাপনক্ষম হতে হবে। তবে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়ের অধিকার হরণকারী অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে অপরাধের শাস্তি নিরূপণে সেই ব্যক্তি ও পরিবারেরও কিছুটা ইখতিয়ার থাকা আবশ্যক। শাস্তির চূড়ান্ত ফয়সালা আদালতের ইখতিয়ারভুক্ত থাকলেও তার মধ্য থেকে কোন একটা গ্রহণ করার স্বাধীনতা সেই ব্যক্তি বা পরিবারকে দেয়া হলে তাতে প্রতিশোধ স্পৃহার চরিতার্থতা ভিন্নতর একটি রূপে সম্ভব হতে পারে। যেমন হত্যা অপরাধজনিত প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহার আগুন নির্বাপনের জন্য তিনটি উপায় বা পন্থার মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বন করা যেতে পারে। তা হচ্ছে, ক্ষমা, কিসাস ও দীয়াত। এই তিনটির মধ্য থেকেই যে কোন একটি গ্রহণ করে মজলুম বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহা চরিতার্থ করতে ও তদানুযায়ী অভিযুক্তের সহিত মানবিক আচরণ গ্রহণ করতে পারে। ক্ষমার পন্থা গ্রহণ করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিষ্কৃতি পেতে পারে। দীয়াত গ্রহণ করতে রাযি হলে সেজন্য সুবিচারের মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। আর 'কিসাস' চাইলে আদালত 'কিসাসে'র আইন অনুযায়ী কাজ করবে। মোটকথা, প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করার একটা উপায় আদালতী কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই পাওয়া যাবে।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, একটা আর্দশ দণ্ডবিধানের অধীন ব্যক্তিগত অধিকারের সহিত সাংঘর্ষিক অবস্থায় ব্যক্তির এই অধিকার থাক বাঞ্ছনীয় যে, স্বীয় প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে আদালতি কার্যক্রমের অধীন সে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। আর উপরোক্ত তিনটি অবস্থায়ই আদালত মামলার অবস্থা অনুযায়ী শাস্তির মান নির্ধারণে আইনের পরিধির মধ্যে স্বাধীন হবে।

www.pathagar.com

শাস্তি কিরূপ হওয়া উচিত

অপরাধের স্বরূপের উপর শাস্তির মান নির্ভরশীল। আদালতি কার্যবিধি বা নিয়মতন্ত্র (Procedure) প্রত্যেকটি দেশে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। কিন্তু একটি জিনিস সব দেশের নিয়মতন্ত্রে সমানভাবে লক্ষণীয়। তা হচ্ছে, অপরাধসমূহ সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে সেসব অপরাধ গণ্য, যা ব্যক্তির অধিকারের সহিত সাংঘর্ষিক হওয়ার দরুন করা হয় এবং যেসব অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছে। আর দ্বিতীয় ভাগে সেসব অপরাধ গণ্য, যা স্বয়ং সরকারেরই বিরুদ্ধে করা হয়। ব্যক্তি হিসাবে ও ব্যক্তিগতভাবে যে কোন জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হরণ করার দরুন যেসব অপরাধ সংঘটিত হয়, তা তৃতীয় এক পর্যায়ে গণ্য। প্রথম ভাগের অপরাধের বেলা দণ্ড-বিধানের জন্য সরকার যন্ত্রস্বতই সক্রিয় ও তৎপর হয়ে উঠে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের অপরাধের বেলা সরকার শক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সক্রিয় হয় না– কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মজলুম ব্যক্তি নিজে ফরিয়াদ না করবে। একালে বিভিন্ন দেশে এই উভয় প্রকারের অপরাধের বিভক্তি বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। যেমন, কোন কোন দেশে একটি বিশেষ অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। অন্য একটি দেশের ব্যবস্থানুযায়ী সেই অধিকারটি ব্যক্তির তহবিলে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু অপরাধের এই বিভক্তির ব্যাপারে ও প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহা চরিতার্থতার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্তই জরুরী। অপরাধের প্রকৃতি সংক্রামক কি অন্তর্মুখি, এই ব্যাপারটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন যে অপরাধের প্রতিক্রিয়া সমাজের উপর যত গভীর হয়ে দেখা দেবে, সেই অনুপাতে অপরাধের বিভক্তিতে একটা মান স্থির করা আবশ্যক। কোন অপরাধের খারাপ প্রতিক্রিয়া গোটা সমাজের জন্য দেখা গেলে তার শাস্তি বিধানের জন্য রাষ্ট্র, সরকারের স্বতঃই এগিয়ে আসা ও সক্রিয় হয়ে উঠা জরুরী মনে হবে। অপর দিকে যে অপরাধের প্রতিক্রিয়া বেশির ভাগ মজলুম ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, অপরাধীকে তার শাস্তি প্রদানের জন্য সরকার যন্ত্র সক্রিয় হবে তখন, যখন মজলুম ব্যক্তি নিজে চিৎকার করবে ও প্রশাসনের বদ্ধ দুয়ারে করাঘাত হানবে।

আমরাও মনে কি, অপরাধসমূহকে উপরোক্ত দুইটি ভাগে বিভক্ত করা আবশ্যক। অবশ্য আমাদের দৃষ্টিতে বিভক্তির মানদণ্ড ভিন্নতর। আমাদের বিবেচনায় ব্যক্তিগত ধরনের অপরাধে ব্যক্তি একটা সিদ্ধান্তকারী মর্যাদার অধিকারী। সে সরকার যন্ত্রকে নিজের সাহায্যের জন্য ডাকবে, কি ডাকবে না, তার সিদ্ধান্ত সে নিজেই গ্রহণ করবে। আর ডাকলেও 'কিসাস' মতাদর্শের ভিত্তিতে ডাকবে, না দীয়াত-এর মতাদর্শের ভিত্তিতে সাহায্য প্রার্থনা করবে, এ বিষয়েও সে-ই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী। কিন্তু সামষ্টিক পর্যায়ের অপরাধে রাষ্ট্র-যন্ত্রকে অনতিবিলম্বে সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে এবং এই ধরনের অপরাধে 'কিসাস' মতাদর্শ-ই চূড়ান্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা সরকার

www.pathagar.com

'দীয়াত' গ্রহণ করে অপরাধের ব্যবসায়ে নামতে পারে না। তবে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে অপরাধীকে কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে—এ অধিকার তার আছে।

অপরাধসমূহের বিভক্তিতে ভাবতে হবে, কোন্ কোন্ অপরাধ সমাজসমষ্টির বিরুদ্ধে এবং কোন্ কোন্‌টি ব্যক্তির বিরুদ্ধে পড়ে। আধুনিক আইন ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় মানের (Standard) বিভক্তি উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এই কারণে উচ্ছৃঙ্খলতা ও নির্লজ্জতাজনক কার্যাবলী সমাজ থেকে বিলীন হয়ে যায়নি। তাই প্রস্তাবিত বিভক্তিতে সমাজ থেকে নির্লজ্জতাজনক ও উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ কার্যাবলী সম্পূর্ণ নির্মূল করার লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখতে হবে গুরুত্ব সহকারে। আমাদের মতে নির্লজ্জতাজনক ও উচ্ছৃঙ্খলতার অপরাধসমূহ—যা গোটা সমাজকে বিপর্যস্ত ও কলুষিত করে দেয়—সরকারী তহবিলে সমর্পিত হওয়া আবশ্যক। সরকার এসব অপরাধের জন্য কঠিন ও কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করে এসব মারাত্মক ব্যাধির মাত্রা বা সংখ্যা হ্রাস করে আনবে। আর অবশিষ্ট অপরাধসমূহ ব্যক্তির তহবিলেই গণ্য হতে থাকবে।

বড় বড় অপরাধ

অপরাধসমূহকে আমরা তিনটি বড় বড় অংশে ভাগ করতে পারি ঃ

১. রাষ্ট্র বিরোধী অপরাধ (Offences against the state)। সরকারের দৈনন্দিন নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘন করে যে সব অপরাধ করা হয়, তা সবই এই ভাগে গণ্য। ওজনে কমবেশি করা, ঠকবাজি, মিথ্যা সাক্ষ্যদান বা সত্য সাক্ষ্য গোপন করা, সরকারী কর্মচারীদের আইনসম্মত ক্ষমতার অপমান করা বা তার কার্যকরতার পথে বাধার সৃষ্টি করা এবং চাকুরীজীবীদের সাধারণ আচার-আচরণ সম্পর্কিত অপরাধ প্রভৃতি এই ভাগেই পড়ে।

২. সামাজিক সামষ্টিক জীবনের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ। সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলা (Law and order) ভঙ্গ করা, ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা, সন্তান হত্যা, আত্মহত্যা, নারী বা শিশু হরণ, ব্যভিচার, প্রকৃতি পরিপন্থী কার্যাবলী (সমমৈথুন), চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, বিশ্বাসঘাতকতা—আমানতে খিয়ানত, প্রতারণা, দুষ্কৃতি, অনধিকার চর্চা, অপরাধজনক কাজে সাহায্য-সহায়তা করা প্রভৃতি বড় বড় অপরাধ এই অংশের অন্তর্ভুক্ত।

৩. ব্যক্তির জীবনের বিরুদ্ধে করা কার্যাবলী। ইচ্ছামূলক হত্যা, হত্যা, হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা (Attempt to murder), দৈহিক যখম—বড় বা হালকা, 'ট্রেডমার্ক' সংক্রান্ত অপরাধ, অবৈধভাবে চাকুরী ত্যাগ এবং মানহানি পর্যায়ের অপরাধসমূহ এই ভাগে গণ্য।

এই বিভক্তি সর্বসম্মত নয়। এ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ রয়েছে।

এই বিভক্তি অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের অপরাধ সংক্রান্ত শাস্তিসমূহ অত্যন্ত কঠোর এবং দৃষ্টান্তস্থানীয় হওয়াই স্বাভাবিক। তবেই এসব অপরাধজনিত দুষ্কৃতি ও অকল্যাণ সমাজের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে ও কোনরূপ আনুকূল্য লাভে ব্যর্থ হবে।

www.pathagar.com

আর তৃতীয় ভাগে শামিল অপরাধসমূহ যেহেতু ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এই কারণে সেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির আবেদন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সরকারের কর্তব্য। সেই সাথে ফৌজদারী কার্যবিধিতে এতটা সুযোগ থাকা আবশ্যক যে, ব্যক্তি যে পদ্ধতিতে সুবিচার পেতে চাইবে, সে তা অবলম্বন করতে পারবে। তবে বর্তমানে প্রচলিত বিধির ন্যায় দ্বিবিধ কর্মপন্থা গ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত নয়। সেমাত্র একই ধরনের Legal Remedy লাভ করতে পারবে। সে হয় দেওয়ানী পদ্ধতি গ্রহণ করবে, না হয় ফৌজদারী এবং তার মাধ্যমে গৃহীত ব্যবস্থানুযায়ী তাকে তার প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে হবে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ

উপরোল্লিখিত আদর্শমানের দণ্ডবিধি পর্যায়ে আমাদের জানতে হবে, ইসলাম এই প্রয়োজন কতটা পূরণ করছে। বস্তুত ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিতে বিচার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও অনাবিল হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এই কাজ সম্পাদনের পদ্ধতি হতে হবে দ্রুত ও বিলম্বহীন। ইসলামী সমাজে স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা যায় যে, অভিযোগকারী, অভিযুক্ত, সাক্ষী এবং বিচারক সকলেই দীনদার ও আল্লাহ্‌ভীরু হবে। তাই ইসলামী আদর্শানুযায়ী সুবিচার করতে হবে, 'বিচার বিক্রয় করা চলবে না'। তাই যত শীঘ্র সম্ভব, অভিযোগকারীর অভিযোগের প্রতিকার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেননা বিলম্বের বিচার—বিচার অস্বীকার করার শামিল। 'বিলম্বিত বিচার অবিচারের নামান্তর।'

ইসলামী দণ্ডবিধির দৃষ্টিতে অপরাধসমূহ দু'টি ভাগে বিভক্ত হতে পারে। প্রথম ভাগে সেসব অপরাধ গণ্য, যার কুফল বা ক্ষতি ব্যক্তি পর্যন্তই সীমিত থাকে এবং সামষ্টিক জীবনে সেসব অপরাধের কোন ব্যাপক ও গভীর প্রভাব পড়ে না। যেমন, কাউকে মারধোর বা আঘাত করা, গালাগাল করা। এসব অপরাধের বেলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই স্বীয় প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সরকারী প্রশাসনিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করবে এবং তাকে সক্রিয় বানাবে।

এছাড়া অন্যান্য যাবতীয় অপরাধ দ্বিতীয় ভাগে শামিল। সেসব বন্ধ ও তার প্রতিকারের জন্য সরকারকেই সক্রিয় হতে হবে। আর সে জন্য গোটা সরকার যন্ত্র, বিচার বিভাগ এবং বিচার পদ্ধতিকে—সেই সাথে আদালতের কার্যবিধিকেও-কুরআন-সুন্নাহ, খিলাফতে রাশেদার রীতি-নীতি এবং ফিকাহ্‌র ইমামগণের ইজতিহাদের আলোকে সম্পূর্ণ নতুন করে ঢেলে তৈরি করতে হবে। তা'হলেই আশা করা যায়, ইসলামের দণ্ডবিধান যথাযথভাবে কার্যকর হতে পারবে, জনগণ সুবিচার লাভের সুযোগ পাবে এবং সমাজ সমষ্টি সকল প্রকার দুষ্কৃতি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি লাভ করে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার আনন্দ অনুভব করতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী দণ্ড বিধান

কিসাস

'দণ্ড' (Punishment) বলতে বোঝায় এক ব্যক্তির কোন অপরাধ করার পর তার প্রতিফল স্বরূপ যা করা হয় তা।

অপরাধ ঃ ইসলামী শরীয়তে এমন কাজ করাকে অপরাধ বলা হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ বা আপত্তিকর। যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা করা এবং যে কাজের আদেশ করা হয়েছে তা না করাই হলো অপরাধ।

দণ্ড বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ

ইসলামী শরীয়তে কাউকে আযাব বা কষ্টদানের লক্ষ্যে এই দণ্ডদানের ব্যবস্থা করা হয়নি। এ ব্যবস্থা করা হয়েছে সুচরিত্রবান ব্যক্তি গঠন, সঠিক পথে তাকে প্রতিষ্ঠিতকরণ এবং পরিশুদ্ধ নির্দোষ বানানোর লক্ষ্যে। তা কেবল সেই ব্যক্তির জন্য নয় যে অপরাধ করেছে, বরং তা গোটা ইসলামী সমাজের জন্য। কেউ যেন হীনতা, নীচতা-চরিত্রহীনতার নিম্নতম পংকে ডুবে না যায়, বরং উচ্চতর মান ও মর্যাদার দিকে উন্নত হয়ে উঠে শান্তি, নিরাপত্তা, পারস্পরিক মানবীয় সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালবাসা-প্রীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।

শরীয়তের ও তার লক্ষ্যের অনবদ্যতার দৃষ্টান্ত ঃ

এই পর্যায়ে আমরা এ কথার উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি যে, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করার স্বীকারোক্তি করেছে, এই স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে যায়নি, ফলে তার উপর শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি 'হদ্দ' কার্যকর হয়েছে, সেই ব্যক্তির উপর অভিশাপ করতে রাসূলে করীম (সা) নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ

এই ব্যক্তি খালিস ও নির্ভেজাল তওবা করেছে এবং সে তার রূহ্‌কে নিয়ে উত্তমভাবে তার পথে চলে গেছে।

আমরা এদিকেও ইঙ্গিত করা যথেষ্ট মনে করি যে, ইসলামী শরীয়ত আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছে, অপরাধীর উপর নির্দিষ্ট দণ্ড বা তা'যীরী দণ্ড কার্যকর হওয়ার পর তার উপর থেকে অপরাধের কলুষতা দূরীভূত হয়ে যায়। তার কারণ, ইসলামী শরীয়ত মানুষকে তার বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্বসহ পুনর্গঠিত করতে ইচ্ছুক।

আমরা নির্বিশেষে সকল মানুষের কথাই বলছি। কেননা উপরে যে কথাটি বলা হলো তা শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল অমুসলিম

www.pathagar.com

নাগরিকদের বেলায়ও তা সত্য। তারা তথায় ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ণ সংরক্ষণ লাভ করে এবং নির্ভেজাল সুবিচার ও নিরপেক্ষ ন্যায়পরায়ণতা পাওয়ার পূর্ণ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় এদের 'যিম্মী' বলা হয় এই কারণেই যে, তাদের সর্বাঙ্গীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব ইসলামী সরকার গ্রহণ ও পালন করে।

শরীয়ত আত্মার লালন ও মন-মানসিকতা সুদৃঢ় করে

অপরাধীর উপর দণ্ড কার্যকর করার পর তাকে অপরাধের দোষ থেকে মুক্ত মনে করে ইসলামী শরীয়ত তাকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে—যে পরিবেশের মধ্যে পড়ে সে অপরাধ করেছিল সেখান থেকে বের করে সেই পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে সে স্বীয় মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হতে পারবে, মনে করতে পারবে যে, সে মনুষ্যত্বের মান থেকে নীচে নেমে যায়নি, সে সাময়িকভাবে ভুল করেছিল মাত্র এবং সে ভুলটা নিতান্তই মানবিক কারণে। কেননা মানুষ মাত্রই ভুল-ভ্রান্তির অধীন, তা থেকে মুক্ত নয়। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সে এই চেতনার অধিকারী হবে যে, সে তার নিজের সমাজেরই একজন, সেখানে অন্য আরও শত-হাজার-লক্ষ মানুষ রয়েছে। তার উপর যে 'হদ্দ' বা তা'যীর কার্যকর হয়েছে, তাতে বরং সেই সমাজেরই মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার কোন মর্যাদা হানি ঘটেনি। এই সমাজ তার সাময়িক পদস্খলনকে ক্ষমা করে দিয়েছে, যে পতিত হয়েছিল, তাকে হাত ধরে উপরে তোলা হয়েছে। সমাজ থেকে সে দণ্ড হিসেবে যা কিছুই পেয়েছে তা তাকে ভুলমুক্ত করার লক্ষ্যেই দেয়া হয়েছে, তার এবং তার সমাজেরই সার্বিক কল্যাণের জন্য—পিতা যেমন সন্তানের প্রতি করে, ঠিক তেমনি। রোগ হলে যেমন তার চিকিৎসা করা হয়, রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়, গোটা সমাজের জন্য এও ঠিক তেমনি। এতে করে সমাজ এক উচ্চতর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং সমাজ গঠনের উন্নত পদ্ধতিকে সর্বসমক্ষে প্রতিভাত করে তোলে। যে ব্যক্তি বাঁকা পথ ধরেছে তাকে এর দ্বারা সোজা করা হয়। যে চেতনা ও মূল্যবোধ সে হারিয়ে ফেলেছে তা এক সুষ্ঠু, পরিশীলিত ও বাস্তব কর্মব্যবস্থার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হয়।

দণ্ড ইসলামী সমাজ গঠনের একটি উপায়

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্যোগে যখন এভাবে ইসলামী শরীয়তকে বাস্তবায়িত করা হয়, তখন দণ্ড খালিস ও নির্ভেজাল তওবার একটি পন্থা হয়ে দাঁড়ায় এবং তার ফলে সঠিক দৃঢ়তা আসে সমাজ কাঠামোর মধ্যে। কেননা অপরাধীর উপর দণ্ড কার্যকর করার পর মুহূর্তেই সে এমন এক পরিবেশের মধ্যে এসে যায়, যেখানে সে ভয়ে নয়—আত্মতৃপ্তির দরুন এক আদর্শ নীতির অনুসারী হয়ে যায় এবং তাতে তার দীনের প্রকৃত শিক্ষা এবং তার আকীদা-ভিত্তিক আইন-বিধান বাস্তব ও জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে।

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজ গঠনের ইসলামী প্রক্রিয়া

ইসলাম সে সব মতবাদের মত কোন বিধান নয়, যা বাস্তব রূপায়িত (Practical application) করতে চাইলে তা আদৌ সম্ভবপর হয় না, যা বাস্তবায়িত হওয়ার যোগ্যই নয়।

মূলত ইসলামী শরীয়ত ও আইন-বিধান অত্যন্ত সহজসাধ্য, মানব প্রকৃতির সহিত পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্যশীল। তা মানব প্রকৃতি নিহিত স্বাভাবিক প্রবণতা ও ভাবধারার পূর্ণ সংরক্ষণ করে। তাকে এমন সব কাজের দায়িত্ব দেয়, যাতে অন্যদের কোনরূপ ক্ষতি না করেও তার নিজের তৎপরতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার এক উন্মুক্ত পরিবেশ সে লাভ করে। সে যতই শরীয়তকে অনুসরণ করে চলে, ততই তার মনে এই অনুভূতি জেগে উঠে যে, সে এক ইসলামী সমাজ গড়ে তুলছে, যেখানে পারস্পরিক ভালোবাসাই প্রাধান্য পাচ্ছে, আত্মদানের পরিচ্ছন্ন স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং উচ্চতর মান-মর্যাদার সুমিষ্ট ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে।

যে সমাজে ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়িত হয়েছে একটি সমগ্র হিসাবে, আইন বিধানসমূহ একটা স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে, তথায় পারস্পরিক মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব-কলহের কোন স্থান থাকতে পারে না, পরশ্রীকাতরতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সেখান থেকে কর্পূরের মত উড়ে যাবে, শত্রুতা করার কোন সুযোগ তথায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসলে ইসলামের সমগ্র বিধি-বিধানই—তা ইবাদত সংশ্লিষ্ট হোক, কি মুয়ামালাত পর্যায়ের, ইসলামী রীতি-নীতি পর্যায়ের হোক, কি ব্যক্তি পর্যায়ের, প্রশাসনমূলক হোক বা রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক, তা সবই একই উচ্চতর মহত্ত্বর লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং সে লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর ও সুদৃঢ় করে তোলা।

দৈহিক ইবাদতসমূহ মানুষের সাম্য ও পরিপূর্ণ সমতা প্রকট হয়ে উঠে অতি উন্নতমানে। তাতে সকলের মা'বুদ এক, রাসূল এক, কেবলা এক, কুরআন (জীবন-বিধান) এক এবং যে অবস্থার মধ্যে ও ব্যবস্থার মাধ্যমে ইবাদাত অনুষ্ঠিত হয় তা অভিন্ন। যে স্থানে এই ইবাদত অনুষ্ঠিত হয়, তা সকলের জন্য সমান অধিকারের ক্ষেত্র, সকলেরই উপর সমানভাবে তা পালন করা ফরয। এখানে ধনী-দরিদ্র, বড়-ছোট, নারী-পুরুষ ও শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের কোন প্রভেদ নেই।

অর্থনৈতিক ইবাদত হিসাবে ইসলামী বিধানে ফরয করা হয়েছে মুসলিমের ধন-সম্পদের যাকাত। তা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে আটটি খাতে ব্যয় করার জন্য। এছাড়াও রয়েছে অর্থব্যয়ের দায়িত্ব—পিতা, দাদা, চাচা, ভাই, বোন, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি নিকটাত্মীয়দের জন্য। এছাড়া রয়েছে কাফ্ফারা। শরীয়তের কোন কোন বিধান লংঘন করা হলে তা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। আর সবই দরিদ্র মুসলিমের প্রাপ্য।

পারস্পরিক কাজ-কর্মে ইসলামী শরীয়ত মুসলমানের পরস্পরে বিরোধ সৃষ্টিকারী ও অহিতেচ্ছা বা বিদ্বেষ উদ্রেককারী ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

www.pathagar.com

অত্যধিক চড়ামূল্যে ও ধোঁকাবাজিপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় এর মধ্যে গণ্য। পরস্পরের প্রতি নম্রতা, দয়ার্দ্রতা, অপরের দুঃখ ও কষ্ট বিদূরণ এবং প্রয়োজনে বিনা সুদে ঋণদান ও ঠেকার সময় ঋণগ্রস্তকে সময়ের রেয়াত দানের বিধান দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের পরস্পরে সালাম আদান-প্রদান, হাঁচি দিলে আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ বলার পর 'আল্লাহ্ তোমাকে রহমত দিন' বলে প্রত্যুত্তর দানের রেওয়াজ করেছে। রোগাক্রান্তকে দেখার, মৃতের লাশ বহন ও দাফনের জন্য কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়ার, মৃতের সম্পর্কে শুভ উল্লেখের ও তার লাশের মর্যাদা রক্ষার জন্য বলিষ্ঠ ভাষায় উৎসাহ দিয়েছে। তার কবরকে নষ্ট বা অপমান না করার এবং তার সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতিমূলক কথাবর্তা বলার, ভালো কাজের সহযোগিতা, দুর্বলের আনুকূল্য, বড়কে সম্মান, ছোটকে স্নেহ, দরিদ্রের প্রতি আন্তরিকতা, আলেমকে মর্যাদা দান, ছেলায়ে রেহ্‌মী, মজলুমের সাহায্য ও যালেমকে প্রতিরোধ করার জন্য স্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে ইসলামী শরীয়ত নিষেধ করেছে মুসলিম ভাইয়ের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে, তাকে হীন জ্ঞান করতে, তাকে লাঞ্ছিত অবমানিত করতে, তার প্রতি হিংসা পোষণ করতে, তাকে গালাগাল করতে, তাকে মিথ্যা দোষে অভিযুক্ত করতে, তাকে ভর্ৎসনা করতে, তার গীবত করতে।

ব্যক্তি পর্যায়ের আইন হিসাবে মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ্ বন্ধ করতে, মীরাস বণ্টন, ভরণ-পোষণ বহন এবং স্বামী-স্ত্রীর একত্রে থাকা অসম্ভব হলে বিচ্ছেদ গ্রহণ, ওসিয়ত ও ওয়াক্‌ফ ইত্যাদি কাজে যথাসম্ভব নম্রতা বহাল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজনীতি, রাষ্ট্রশাসন ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তিত বিধি-বিধান পালন করে চলার নির্দেশ দিয়েছে এবং জনগণকে নির্দেশ দিয়েছে তা যথাযথভাব পালন ও অনুসরণ করতে।

মোটকথা ইসলাম একটা আদর্শ সমাজ রূপেই ইসলামী সমাজ গড়ে তুলেছে, ফলে তাতে অপরাধ সংঘটনের অবকাশ বা সুযোগ খুব কমই থাকতে পারে। তথায় অপরাধ না করার মানসিকতাই প্রবল হয়ে উঠে, কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিই তথায় পূর্ণ নিরাপত্তা, সুবিচার ও ন্যায়পরতা, প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করে থাকে। লোকেরা পারস্পরিক আন্তরিকতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভালোবাসার বন্ধনে বন্দী হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি মুসলিম হয় অপর প্রত্যেকটি মুসলিমের দরদী ভাই।

এরূপ অবস্থায় কোন মুসলিম যদি অপরাধ করে তাহলে তা গোটা সমাজ পরিবেশের মধ্যে বিস্ময়ের উদ্রেক করে, এক অপ্রত্যাশিত ও অচিন্তনীয় ঘটনারূপে তীব্র ভাষায় সমালোচিত হয়। এটা তার চরিত্রের পতনরূপে চিহ্নিত হয়। মুসলিম জনগণের মনে তার প্রতিক্রিয়া হয় অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

www.pathagar.com

মুসলিম অপরাধ করে কেন ?

মুসলিম ব্যক্তির ঈমান অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে উঠে। আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল, পরকাল ও তাক্দীরের ভালো-মন্দের প্রতি যে ঈমান মুসলিমের হৃদয় মনে সঞ্চারিত থাকে তা যেমন অবিচল হয়, তেমনি অনড়, অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের অর্থ, আল্লাহ্ই গোটা বিশ্বলোককে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিটি বিন্দুর উপর অমোঘ। গোটা সৃষ্টিলোকের স্রষ্টা তিনি-ই, তিনি-ই তার সংরক্ষক।

পরকালের প্রতি ঈমানের অর্থ, জীবনের শেষে যে-মৃত্যু তা চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিলয় নয়, পরে পুনরুজ্জীবিত হতে হবে এবং আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে স্বীয় জীবনের কার্যাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবের পর জান্নাত অথবা জাহান্নাম প্রাপ্তি অনিবার্য ব্যাপার হয়ে আসবে।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَه اَمَدًا بَعِيْدًا

সেইদিন যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃত ভাল কাজসমূহ সম্মুখে উপস্থিত পাবে এবং যা কিছু খারাপ করেছে তা-ও। সে তখন কামনা করবে, তার খারাপ কাজ-সমূহ ও তার মধ্যে যদি সুদীর্ঘ দূরত্ব হতো (তাহলে কতই না ভালো হতো)।

—সূরা আল-ইমরান ঃ ৩০

কিন্তু যে মুসলিম উপরোক্ত আকীদায় বিশ্বাসী তার অন্তরে তার দৃঢ় ও প্রভাবশালী হওয়ার ব্যাপারটি বিভিন্ন রকম হয়ে যাবে। উপরোক্ত ঈমান বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। যদি কারুর অন্তরটিতে উক্তরূপ ঈমান মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় এবং তাতে নিহিত ভাবধারাসমূহ পূর্ণ মাত্রায় তা আয়ত্তাধীন হয়ে গিয়ে থাকে তা'হলে তার সে অন্তর এমনভাবে সুরক্ষিত হয়ে থাকে যে, ফিতনা বিপর্যয়ের বিভ্রান্তির কোন আঘাত তার ভিতরের দিক দিয়ে আসতে পারে না, আসতে পারে না বাইরের দিক থেকে। কিন্তু এই ঈমান যদি কারুর অন্তরে দুর্বল হয়ে পড়ে, তা'হলে তাতে বিভ্রান্তি-ভিতর ও বাইর—উভয় দিক দিয়েই অনুপ্রবেশ করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নানাবিধ ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করে। তখন তার দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের অপরাধ সংঘটিত হওয়া খুবই সহজ বা একান্তই অনিবার্য হয়ে পড়ে।

তা'হলে বোঝা গেল, মুসলিম ব্যক্তির আকীদা ও বিশ্বাসের দুর্বলতা বা ক্ষীণতাই বিভ্রান্তির মৌল কারণ এবং এই বিভ্রান্তিই ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধ সংঘটিত হওয়ার নিমিত্ত। এই কারণেই ইসলামী শরীয়ত সর্বপ্রথম মানুষের অন্তরে এই ঈমানকে গাঢ় সুদৃঢ় করে এবং তাতে কোনরূপ দুর্বলতা দেখা দিক, তা চায় না।

এই প্রেক্ষিতেই বলতে পারি, আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানই ইসলামী সমাজে অপরাধ প্রবণতা দূরীভূত করে এবং দুষ্কৃতি তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কম করে আনে।

www.pathagar.com

আর ইসলামী সমাজ বলতে আমরা বোঝাতে চেয়েছি এমন সমাজ, যেখানে প্রথমে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমূহের সংকীর্ণ বেষ্টনীতে ইসলামী শরীয়ত শক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে এবং তা-ই ক্রমশ সম্প্রসারিত ও বর্ধিত বিকশিত হয়ে বিরাট মহীরূপে পরিণত হয়ে সমগ্র সমাজ পরিবেষ্টনীতে একটা সুদৃঢ় শরীয়তী অনুশাসনের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে বন্দী হয়ে আছে। এইরূপ সমাজেই একদিকে যেমন ইসলামী শরীয়ত তার যাবতীয় ভাবধারা ও বিধি-বিধান সহকারে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে দুষ্কৃতি ও অপরাধ প্রবণতার আনুকূল্য ক্ষীণ ও সংকীর্ণ হতেও সংকীর্ণতর করে আনে।

কিন্তু মানব রচিত আইন-কানুন সেই পরিপক্ক সুফল থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, যা পেয়ে ইসলামী সমাজ সমৃদ্ধ হয় এবং সেখানে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়িত হয়ে মানব জীবনে নিয়ে আসে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা, সুবিচার ও ন্যায়পরতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। আর তারই ফলে পূর্ণ নিশ্চয়তা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা এবং নিঃশংক স্বস্তি ও পরম সৌভাগ্য লাভ ঘটে।

শরীয়ত অবিভাজ্য

ইসলামী শরীয়ত অবিভাজ্য, বিভিন্ন ভাগে তাকে বিভক্ত করা যায় না—তাকে এমনভাবে খণ্ডাকারে গ্রহণ করা যায় না যে, প্রত্যেকটি খণ্ড অন্যান্য খণ্ডসমূহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়াবে। আসলে ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত একটি সমগ্র, একটা সমষ্টি। তাকে এই সমগ্র বা সমষ্টি হিসাবেই অনুধাবন, গ্রহণ ও অনুসরণ করতে হবে। যারা ইসলামী শরীয়তকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে এবং তার ফলে তার কোন কোনটি পালন ও অনুসরণ করে, আর বাকি অংশসমূহকে প্রত্যাখ্যান বা অগ্রাহ্য করে, তাদের এই আচরণটা ঠিক সেই ব্যক্তির মত, যে এক ব্যক্তির একখানি হাত বা একটি পা কেটে বিচ্ছিন্ন করে লোকদের সামনে দাঁড় করে প্রচার ও দাবি করে যে, এই একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। এই কাজটি যে কতটা হাস্যকর—অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক, তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বোঝাবার প্রয়োজন হয়না। বস্তুত ইসলামী শরীয়ত একটি পূর্ণাঙ্গ মানব সত্তার মতই অবিভাজ্য, অবিচ্ছিন্ন। তার মৌলনীতি ভাবধারা থেকে শুরু করে দূরতম নিয়ম ও বিধি-বিধান পর্যন্ত কোন একটিকেও অন্যান্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে বলা যেতে পারে না যে, এটাই হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত। মানব-দেহের দূরবর্তী কোন প্রত্যঙ্গে ব্যথা অনুভূত হলে গোটা দেহ সত্তায়ই যেমন সে ব্যথায় সংক্রমিত হয়ে পড়ে—সে ব্যথায় জর্জরিত হয়ে উঠে দেহের প্রতিটি অঙ্গ ও অনু-পরমাণু, তেমন মানুষের পূর্ণাঙ্গ দেহের কোন একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গ অনুপস্থিত বা বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত হলেও সে দেহকে পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে না কখনও। ইসলামী শরীয়তের এই সামগ্রিকতা এমন একটি বিশেষত্ব; যার দৃষ্টান্ত আদর্শ বা আইন বিধানের জগতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

এই শরীয়তই ইসলামী সমাজ গড়ে তুলে এবং তাকে সুসংগঠিত করে। শরীয়তই প্রথমে ব্যক্তিদের আদর্শবাদী ব্যক্তিরূপে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে। এই আদর্শের প্রেরণা প্রথমে ব্যক্তিগণের মনে-মগজে জেগে উঠে। পর সম আদর্শিক প্রেরণাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরস্পরের সহিত একাত্ম বানিয়ে সংঘটিত ও সুসংবদ্ধ করে একটি অখণ্ড সমাজের ব্যক্তিরূপে। তখন কোন ব্যক্তিই অন্য কোন ব্যক্তি থেকে একটুও বিচ্ছিন্ন নয়, তাদের পরস্পরের মধ্যেও থাকতে পারে না কোন মতদ্বৈততা বা পার্থক্য বিরোধ। চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিকোণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাস্তব আইন-বিধান পর্যন্ত সবই একাকার। এই সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই হয় অভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী, আদর্শের বাস্তব অনুসারী। ফলে সে সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি হয় স্বভাবতই অপরাধবিমুখ, অপরাধ-বিরোধ এবং অপরাধের মুলোৎপাটনকারী। তাদের কেউ-ই অপরাধ করতে প্রস্তুত নয়। ইচ্ছা করে কেউ অপরাধ করবে তা অকল্পনীয়। কেননা ইসলামী সমাজ সংঘঠিত হওয়ার সাথে সাথেই তা একটি আদর্শবাদী জাতির রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। এই জাতি বা জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সে সংগঠনের আত্মিক সম্পর্কের সাথে সাথে দানা বেঁধে উঠে আদর্শিক ও বাস্তব সম্পর্ক। ফলে কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্বের বিচ্ছিন্নতা কিংবা বিভিন্নতার কারণে সেই লোকগুলি কখনই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন হয়ে যেতে পারে না। তখন তা এক বিশ্বজাতি (Universal nation)-তে পরিণত হয়। কিন্তু মানব রচিত আইন বিধান কখনই এইরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে না। এই আইন দ্বারা ব্যক্তিগণের পরস্পরে শুধুমাত্র বাহ্যিক ও স্থূল সম্পর্কই গড়তে পারে, আত্মিক বা আদর্শিক সেতু বন্ধন রচনা করতে পারে না। এইরূপ সমাজে পর্যবেক্ষণ বা সংরক্ষণ প্রক্রিয়া যখনই দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ব্যক্তি মনে করে যে, এখন অপরাধ করলে ধরা পড়ে যাওয়ার কোন আশংকা বা সম্ভাবনা নেই, ঠিক তখনই সে আইন-লংঘন বা সোজা কথায় অপরাধ করতে একটুও দ্বিধা করে না।

শরীয়ত মহান

ইসলামী শরীয়ত সমাজ ও জাতি গঠনে একটা অনন্য অবদান রাখতে পারে। এই শরীয়তের একটা উন্নত ও উচ্চতর লক্ষ্য রয়েছে। সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য তার চেষ্টা ও তৎপরতা চির অব্যাহত। মহান দৃষ্টান্ত, উচ্চতর মূল্যমান ও উন্নত চরিত্র স্থাপনই হচ্ছে তার লক্ষ্য। শরীয়ত সেই লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই সমাজ ও জনসমষ্টি অর্থাৎ জাতিকে ক্রমাগতভাবে গড়ে তুলতে থাকবে।

এ শরীয়ত চিরন্তন ও শাশ্বত। কেননা তা বিশেষ জাতি, শ্রেণী, বর্ণ, বংশ বা কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের সহিত সম্পৃক্ত নয়। এ শরীয়ত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য— বিশেষ একটা সময়ের, দেশের মানুষের সহিত তা সম্পর্কিত নয়, সকল কালের সকল যুগের সকল সময়ের ও সকল দেশের মানুষের সহিতই তার সম্পর্ক এবং তাদেরকে

www.pathagar.com

সেই লক্ষ্যের পানে পরিচালিত করতে সর্বতোভাবে সক্ষম। এই শরীয়ত কাল-বর্ণ-বংশ-ভাষা ও স্থানের সংকীর্ণতার অনেক উর্ধ্বে, সম্পূর্ণভাবে বিশ্বজনীন।

এ শরীয়ত পূর্ণাঙ্গ। কোনরূপ অসম্পূর্ণতা বা কমতি তাকে স্পর্শ করেনি। তা পূর্ণাঙ্গ তার লক্ষ্যে, তার সামগ্রিক নিয়ম-বিধান ও আইনে। তাই তা কখনই কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অথবা সংযোজন গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। কেননা তা মানুষের রচিত নয়, রচিত স্বয়ং বিশ্ব-মালিক মহান আল্লাহ্ কর্তৃক। আর আল্লাহ্ তো শাশ্বত ও চিরন্তন, তাই তাঁর রচিত এই শরীয়তও চিরন্তন এবং শাশ্বত। মানুষ যে বর্ণের, যে বংশের, যে জাতির, যে স্থানের ও দেশের-কালের হোক-না-কেন, যে ভাষা-ভাষীই হোক-না-কেন, তাকেই তা এমন এক উন্নত মানের তুলতে পারে, যেখানে তার ভূমিকা হবে মহান, তার দায়িত্ব-কর্তব্য হবে উচ্চতর। তথায় শান্তি, শৃঙ্খলা, সুবিচার ও ন্যায়পরতা, সাম্য ও অভিন্নতা এবং তারই ফলশ্রুতিতে পারস্পরিক প্রীতি-ভালোবাসা, স্থিতিশীলতা ও পরম সৌভাগ্য প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য সাধারণ লভ্য করে দিতে সক্ষম।

তওবার দরজা সদা উন্মুক্ত

শরীয়ত অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য—অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেছে। সেই সাথে তওবা'র দ্বারও সদা উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে খুব প্রশস্ত করে। তা কখনই বন্ধ হয়ে যায় না। এমনকি জান-কান্দানী শুরু হয়ে যাওয়া বা পশ্চিম থেকে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত উন্মুক্তই থাকবে।

এভাবে শরীয়ত মুসলিমকে আত্ম সংশোধনের সুযোগ দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও যদি কেউ তার ভুল পৌনপুনিকতার সহিত করতেই থাকে, তা'হলে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, সে এই ভুল বা পাপকে হালাল মনে করে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এটাই শির্ক। কেননা হালাল-হারাম নির্ধারণের নিরংকুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র। কিন্তু উপরোক্ত অবস্থায় সে অধিকার সে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখছে বলে মনে হয় এবং তার মাধ্যমে সে আল্লাহ্র কর্তৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব করছে এবং নিজেকে সেই অধিকারের অংশীদার বানিয়ে দিচ্ছে। এ কারণে তার জন্য অপেক্ষা করছে প্রথমে দুনিয়ার শাস্তি এবং পরে পরকালীন চিরকালীন কঠিন শাস্তি।

হত্যার অপরাধ

মানুষের অপরাধের মধ্যে মানুষ হত্যার অপরাধ সবচাইতে বড় ও মারাত্মক। মানুষ যখন এই অপরাধ করে তারই এক মানুষ ভাইয়ের বিরুদ্ধে, তখন সে গোটা মানবতার সহিতই শত্রুতা করে। সে মানুষকে হত্যা করে আল্লাহ্র গঠিত মানব-বংশ প্রাসাদের ভিত্তিকে উৎপাটিত করে এবং আল্লাহ্র আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। ফলে তা ভয়াবহ নাফরমানী ও আল্লাদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে। মনে হয়, সে নিজে মানুষ হয়ে তার ভাই অপর এক মানুষের জীবনের প্রতি চরম হিংসা পোষণ করে।

www.pathagar.com

এই কারণে ইসলামী শরীয়ত এই অপরাধের বীভৎসতা প্রকট করে তোলা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মানব মনে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগাতে চেষ্টা করা হয়েছে আর সেই সাথে ইসলামী সমাজে সেজন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে ন্যায়বিচার ভিত্তিক কঠিন শাস্তি।

এই পৃথিবীর বুকে মানুষ হত্যার প্রথম অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল প্রথম মানুষ আদমের দুই সন্তানের মধ্যে—এক ভাই তারই এক ভাইকে হত্যা করেছিল। কুরআন মজীদে এই ঘটনার বিশদ উল্লেখ হয়েছে। কুরআন মজীদ যে ভঙ্গী ও ভাষায় এই ঘটনার বিবরণ পেশ করেছে তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও করুণ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

আদমের দুই পুত্র-সন্তানের সত্য কাহিনী লোকদের জানিয়ে দাও। তারা দুইজন কুরবানী দিয়েছিল কিন্তু তাদের একজনের কুরবানী গৃহীত হয়েছিল, অপরজনেরটা নয়। সেই অপরজন প্রথম জনকে বলল ঃ আমি তোমাকে হত্যা করব। সে বলল, দেখ, আল্লাহ্ তো মুত্তাকী লোকদের (কুরবানীই) কবুল করে থাকেন। তা সত্ত্বেও তুমি যদি তোমার হস্ত আমার দিকে প্রসারিত কর আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে, আমি কিন্তু তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তোমার পানে আমার হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা আমি তো রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহ্কে ভয় করি। আমি চাচ্ছি, তুমি আমার ও তোমার উভয়ের পাপ বহন করে নাও, ফলে তুমি হবে জাহান্নামী। আর যালিমদের এটাই কর্মফল। অতঃপর তার মানসিকতা উত্তেজিত হয়ে উঠল তার ভাইকে হত্যা করার জন্য। পরে তাকে সে হত্যা করল ও এর ফলে সে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল। পরে আল্লাহ্ একটি কাক পাঠালেন, কাকটি মাটি খুঁড়তে লাগল, তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে লুকাবে তার পন্থা জানিয়ে দেবার জন্য, তখন সে বলে উঠল, হায় ! আমি কি এই কাকটির মত হতেও অক্ষম হয়ে গেছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ লুকোতেও পারছি না। ফলে আমি খুবই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। —আল-মায়িদা ঃ ২৭-৩১

এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন ঃ

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ج كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنَّه مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط

এই কারণেই আমরা বনী ইসরাঈলের উপর এই বিধান বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি যে, যে লোক কোন মানুষকে নিহত ব্যক্তির বদল অথবা সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধে শাস্তিস্বরূপ ব্যতীত হত্যা করবে, সে যেন সমগ্র মানুষকে হত্যা করল। আর যে লোক এই মানুষকে বেঁচে থাকতে দিল সে যেন সমস্ত মানুষের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। —সূরা মায়িদা ঃ ৩২

www.pathagar.com

এই অপরাধের কারণ ও মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া স্বরূপ

মানবেতিহাসের প্রথম হত্যাকাণ্ডটির সূচনা হয়েছিল হিংসা থেকে এবং পরিণতি লাভ করেছিল পরিপূর্ণ আল্লাদ্রোহিতায়। আল্লাহ্‌র নাফরমানী করা হলো, পিতা-মাতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো, ভাইর সহিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক চূর্ণ করা হলো এবং হারামভাবে রক্তপাত করা হলো। আর তা-ই হলো পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষের প্রথম রক্তপাত। অবশ্য তা-ই শেষ রক্তপাত নয়। তারপর মানুষের রক্তপাতের ধারা অব্যাহতভাবে চলতে লাগল। পৃথিবী যদ্দিন আছে এবং তার বুকে মানুষের বসবাস যদ্দিন অব্যাহত থাকবে, তদ্দিন মানুষের এই রক্তপাত বন্ধ হবে না। তাই ইসলামী শরীয়তের এ অপরাধের দণ্ড অকাট্য, স্থায়ী অপরিবর্তিত। এ অপরাধের নতুন কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। অবশ্য এই অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া কি দেখা দিতে পারে, তা অবস্থার প্রেক্ষিতে অবশ্যই বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

আগেই বলেছি, পৃথিবীর বুকে প্রথম অনুষ্ঠিত এই নরহত্যার মূলীভূত কারণ ছিল হিংসা—দুই ভাই-ই কুরবানী করল ; কিন্তু আল্লাহ্ কেন একজনের কুরবানী কবুল করলেন, অপরজনের কুরবানী কুবল করলেন না। হাবীলের কুরবানী কবুল করা হলো বলে তাকে হত্যা করা হলো, আর কাবীলের কুরবানী কবুল করা হলো না বলে সে হলো হত্যাকারী। কাবীলের মনে তীব্রভাবে জেগে উঠা হিংসাই তার মুখে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হলো এই শব্দে لَأَقْتُلَنَّ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। পরে সে এই হিংসার বশবর্তী হয়েই কার্যত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, আর তার ফলে সে হলো প্রথম মানুষ হত্যাকারী বিশ্ব মানবতার চিরন্তন দুশমন।

অবশ্য পরিণতিতে তাকে হতে হলো লজ্জিত, লাঞ্ছিত। আর আপন ভাইয়ের নিষ্প্রাণ লাশটা সম্মুখে দেখে সে সীমাহীন দুঃসহ মর্মপীড়ায় ছট্‌ফট করতে লাগল। অপরাধের তীক্ষ্ম অনুভূতি, ভুলের লাঞ্ছনা ও ক্ষতির ভয়াবহতা তাকে আকুল করে তুললো। সে দিশা পাচ্ছিল না, এই লাশ নিয়ে সে এখন কি করবে ! কেমন করে কোথায় এ লাশকে লুকানো যায়, তা-ই ছিল তার সেই মুহূর্তের একমাত্র চিন্তা।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা একটি কাককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন এবং এই প্রথম হত্যাকারী তার অপরাধের শিকার তারই ভাইয়ের নিষ্প্রাণ দেহটিকে কি করে লুকানো যায়, তার পন্থা ও পদ্ধতির জন্য অপরাধীর শিক্ষা গুরু হলো সেই কাকটি। এই সময় তার কণ্ঠে যে অনুশোচনার বাণী ধ্বনিত ও উচ্চারিত হয়েছিল, তা ছিল ঃ

'হায়, আমি এতই অক্ষম ও অসমর্থ হয়ে গেছি যে, এই কাকটির মত বুদ্ধিও আমার হলো না এবং আমার ভাইর লাশ গোপন করার পন্থাও উদ্ভাবন করতে পারলাম না।'

হত্যাকাণ্ডের পর হত্যাকারীর মনে-মগজে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় অতিদ্রুত এবং খুবই স্বাভাবিকভাবে, এ তারই প্রকাশ। বস্তুত কুরআন তার উন্নত ভাষা, সাহিত্যালংকার এবং তুলনাহীন প্রকাশ ক্ষমতার বলে এই মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার

www.pathagar.com

বর্ণনা উপস্থাপিত করেছে। পরে সে এই মানসিক যন্ত্রণানয়ে তিল তিল করে দগ্ধ হতে থাকে তার সমগ্র জীবনব্যাপী।

বস্তুত কুরআন মজীদ উপরোক্ত কাহিনীর মাধ্যমে যে দুইজন মানুষের প্রকৃত নিদর্শন উপস্থাপিত করেছে, এই পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তারই পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে বারবার অব্যাহতভাবে।

১. উপরে যে দুইটি মানবীয় নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি নিদর্শনের তাৎপর্য হচ্ছে, তার আল্লাহ্‌র সহিত তার স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। ফলে সে আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়ও পোষণ করে না, তাঁর নিকট থেকে ক্ষমা পাওয়ার কোন আশাও পোষণ করে না। ফলে তার অক্ষমতা প্রকট হয়ে পড়ে, তার দুঃখ যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠে। এই কারণে এই লোভী বিদ্রোহী হিংসুটে মানুটির সব সুস্থ সব বুঝ হারিয়ে ফেলে তার মনুষ্যত্ব চরমভাবে পতিত হয়। তখন সে বন্যা রীতি-নীতির আচরণ গ্রহণ করে অন্য লোকদের সাথে। তাতে সব মানবীয় মূল্যমান উপেক্ষিত ও পদদলিত হয়। তখন কোন আদর্শ বা উচ্চতর নৈতিকতা তার হিংসার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কেননা মূলতই সে আল্লাহ্‌র ভয় হারিয়ে ফেলেছে, কোন মানুষকেও সে সমীহ করে চলার প্রয়োজন বোধ করে না।

২. দ্বিতীয় নিদর্শনটি ছিল এমন একজন মানুষের, যার আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক ছিল দৃঢ়তর, তাঁর নাযিল করা দীন-ই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন, সেই দীন থেকেই সে পথ নির্দেশ লাভ করেছিল। হিদায়ত পেতে সচেষ্ট ছিল সেই দীন থেকেই। সেই দীন থেকে যে পথ নির্দেশ সে পাচ্ছিল, তা-ই তার দৃষ্টিকে উজ্জ্বলতর করছিল, তার বিবেক-বুদ্ধিকে চালিত করছিল, তার অনুভূতি শক্তিকে সতেজ ও সক্রিয় বানিয়ে দিচ্ছিল, উন্নততর তাৎপর্যের ধারক বানিয়ে দিচ্ছিল।

বস্তুত মানুষের এই উন্নত আদর্শিক নিদর্শনই ইসলামের লক্ষ্য ও কাম্য এবং এই নিদর্শনের মানুষ তৈরি করার জন্যই দুনিয়ায় ইসলামের আগমন। এই কারণেই ইসলামী সমাজ সংস্থায় শরীয়তী আইন বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত করা ইসলামের প্রবল তাগীদ। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই অপরাধ করবেন। এমন কথা নয়, তবে অপরাধ করলেও তার শাস্তি গ্রহণ করে অপরাধের কুপ্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করাও তার পক্ষে সম্ভব। অথবা এই শাস্তির কথা জানতে পেরে সে হয়ত আর অপরাধ করবেও না, চিরদিনই তা থেকে পূর্ণ সতর্কতার সাথে দূরে সরে থাকবে, এই আশাটাও বিশ্ব মানবতার জন্য খুবই কল্যাণকর।

এই কারণে ইসলামী শরীয়তের উৎস কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ ه جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَه وَ اَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيْمًا –

www.pathagar.com

যে লোক কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ পূর্বক হত্যা করবে, তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম। সে চিরদিনই তথায় থাকবে। আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ, তার উপর অভিশাপ করেছেন এবং তার জন্য কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

—সূরা নিসা ঃ ৯৩

আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

وَ الَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلهًا اخَرَ وَ لاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِـالْحَقِّ وَ لاَ يَزْنُوْنَ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ اثَامًا يُّضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا –

আর যারা আল্লাহ্র সহিত অপর কোন ইলাহ্কে শরীক করে না, আল্লাহ্র হারাম করা জান হত্যা করে না—সুবিচারের হত্যা ছাড়া এবং যিনা করে না, যে লোক তা করবে সে জাহান্নাম পাবে। কিয়ামতের দিন তার আযাব কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা হবে এবং নিতান্ত অপমানকর অবস্থায় সে চিরদিনই সেখানে থাকবে।

—সূরা ফুরকান ঃ ৬৮-৬৯

وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ط ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ –

আর তোমরা সেই মানুষের প্রাণ হত্যা করো না, যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন—নিতান্ত সুবিচারমূলক হত্যা ছাড়া ; আল্লাহ্ তোমাদের এই উপদেশই দিয়েছেন, আশা করা যায় যে, তোমরা এর গুরুত্ব অনুধাবক করবে।

—সূরা আন'আম ঃ ১৫১

বলেছেন ঃ

وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَـنْ قُتِـلَ مَظْلُوْمًـا فَقَـدْ جَعَلْنَـا لِوَلِيِّـه سُلْطنًا فَلاَ يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ط اِنَّه كَانَ مَنْصُوْرًا –

আর তোমরা সেই মানুষের প্রাণ সংহার করো না, যা তিনি হারাম করেছেন—নিতান্ত সুবিচারভিত্তিক হত্যা ব্যতীত। আর যে লোক যুলুম স্বরূপ নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্য আমরা একটি ক্ষমতা বানিয়ে দিলাম, অতএব সে যেন প্রতি হত্যায় সীমালংঘন না করে। সে অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

—সূরা ইসরা ঃ ৩৩

বলেছেন ঃ

وَ لاَ كُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيوةٌ يّاوُلِى الاَلْبَابِ ط لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে বুদ্ধিমান লোকেরা, কিসাসে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত রয়েছে। এর ফলে তোমরা রক্ষা পাবে বলে আশা করা যায়। —সূরা বাকারা ঃ ১৭৯

www.pathagar.com

এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (সা)-এর কয়েকটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلاَّ كَانَ عَلى اِبْنِ اٰدمَ الاَوَّل كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لاَنَّهُ اَوَّلُ مَنَّ الْقَتَلَ –

অকারণ বা বিনা দোষে যে মানুষই নিহত হবে, তার রক্ত থেকে আদমের সেই প্রথম পুত্রের উপর একটা আবরণ বসবে। কেননা মানুষ হত্যার রেওয়াজ সে-ই চালু করেছে। বলেছেন ঃ

لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ فِىْ فَسَحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يَصِبْ دَمًا حَرَامًا

হারাম রক্তপাত না করা পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার দীনের প্রশস্ততার মধ্যে থাকে ।

اِنَّ هذَا الاِنْسَانَ بُنْيَانُ اللهِ مَلْعُوْنٌ مَنْ هُدَمَ بُنْيَانَهُ –

এই মানুষ আল্লাহ্‌রই প্রতিষ্ঠিত। যে এই প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করবে, সে অভিশপ্ত।

لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقّ الْمُؤْمِنِ اَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الْمَلاَئِكَةُ الَّذِيْنَ عِنْدَهُ –

মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট অবস্থানকারী ফেরেশ্‌তাদের চাইতেও অধিক সম্মানার্হ। অপর কোন মু'মিন ব্যক্তির রক্তের বিনিময়ে ছাড়া তাকে হত্যা করা অপেক্ষা দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়াও আল্লাহ্‌র নিকট অনেক সহজ।

مَنْ حَقَ اللهَ لاَ يَشْرِكْ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْتَدِ بِدَمٍ حَرَامٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ –

যে লোক আল্লাহ্‌র সহিত শিরক্ না করে এবং কোন হারাম রক্তপাতে জড়িত না হয়ে আল্লাহ্‌র সম্মুখে যাবে, সে জান্নাতবাসী হবে।

اَوَّلُ مَا يَقْضى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ ه

কিয়ামতের দিন লোকদের পারস্পরিক রক্তপাতের ব্যাপারটিই সর্বাগ্রে বিচার্য গণ্য হবে।

اِنَّ مِنْ وَ رُعَاتِ الاُمُوْرِ الَّتِىْ لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ اَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيْهَا سَفْكُ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حَقَ

যে সব ঝামেলায় নিপতিত হলে তা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হবে না, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে অকারণ হারাম রক্তপাত।

বস্তুত ইচ্ছাপূর্বকভাবে নরহত্যা একটা সীমালংঘনমূলক অত্যন্ত বীভৎস কাজ। জম্‌হুর আলিমগণ মনে করেন, হত্যাকারীর উপর কিসাস কার্যকর হলেও এই কাজের বীভৎসতা কিছুমাত্র বিলুপ্ত হয় না। কেননা তাঁদের বিশ্বাস হচ্ছে, কেউ নিহত হয়ে গেলে

www.pathagar.com

তার হত্যাকারীর উপর তার যতই কিসাস কার্যকর হোক না কেন, তা থেকে নিহত ব্যক্তি তো কোনই উপকার পায় না। তা থেকে উপকৃত যদি কেউ হয়, তা'হলে হতে পারে তার জীবিত থাকা আত্মীয়-স্বজন। তা-ও এতটুকু যে, হত্যাকারী হত্যা কার্যের শাস্তিস্বরূপ নিহত হলে অন্যান্য লোকেরা হত্যাকার্য থেকে বিরত থাকে এই ভয়ে যে, সে-ও যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে তাকেও অনুরূপভাবে নিহত হতে হবে। আর দ্বিতীয় এই হয় যে, প্রথম নিহত ব্যক্তির অভিভাবক-উত্তরাধিকারীরা মনে স্বস্তি লাভ করে যে, তাদের লোককে যে ব্যক্তি অকারণ হত্যা করেছিল, সে তার দণ্ডস্বরূপ প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছে।

নরহত্যার বীভৎসতা ও জঘন্যতা এ থেকেও-ও প্রতিভাত যে, কোন কোন আলিম বিশ্বাস করেন, ইচ্ছামূলকভাবে হত্যাকারীর তওবা কবুল হয় না। কেননা সে শরীয়তের সীমালংঘনকারী এবং তার কাজটা অত্যন্ত ভয়াবহ ও তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। আল্লাহ্‌র হক্ ও নিহতের হক্-এর দিক দিয়েও তা অত্যন্ত বড় অপরাধ। শুধু তা-ই নয়, তাতে ইসলামী সমাজ তথা গোটা মানবতার হক্‌ও বিনষ্ট ও অস্বীকৃত হয়। এইরূপ হত্যাকারী জাহান্নামে চিরদিন থাকবে, তার উপর আল্লাহ্‌র গজব বর্ষিত হবে এবং তার জন্য পীড়াদায়ক কঠিন আযাব সদা প্রস্তুত হয়ে আছে বলে কুরআন ও হাদীসে অকাট্য ঘোষণা উদ্ধৃত হয়েছে। অথচ এই কুরআন-হাদীসেই ঈমানদার ব্যক্তির মর্যাদা আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত উঁচু—ফেরেশ্‌তাদের চাইতেও অধিক বলে ঘোষিত হয়েছে।

এই পর্যায়ে আমাদের অভিমত

আমরা হত্যাকারীর তওবা কবুল না হওয়া সম্পর্কিত মতটি গ্রহণ করতে পারিনি। আমরা মনে করি সকল প্রকার অপরাধীর জন্যই তওবার দুয়ার চির উন্মুক্ত। তা কখনই বন্ধ হয় না জীবনে বেঁচে থাকা পর্যন্ত। তবে যদি কেউ মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করাকে হারাম মনে না করে হালাল মনে করে, তাহলে তার তওবা কবুল না হওয়া সম্পর্কে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। আর আসলে তওবা কবুল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা হলে তিনি তা কবুল করবেন, হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিবেন, নতুবা প্রত্যাখান করবেন ও আযাব দিবেন।

আমাদের দৃষ্টিতে এই মতটিই অকাট্য দলীলসমূহ দ্বারা সমর্থিত এবং শরীয়তের মৌল ভাবধারার সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যশীল।

এই মতের দলীল ঃ

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللهُ قف وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

www.pathagar.com

আর যাদের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বারা যদি কোন অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় কিংবা তারা কোন গুনাহ্ করে নিজেদের উপর যুলুম করে সে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্র কথা তাদের স্মরণ হয় এবং তাঁর নিকট তারা তাদের পাপের ক্ষমা চায়। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া গুনাহ্ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে ? এই লোকেরা শুনিয়া-বুঝিয়া নিজেদের অন্যায় কাজ পৌনপুনিকভাবে করে না। এই ধরনের লোকদের প্রতিফল তাদের আল্লাহ্র নিকট এই রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন বাগিচায় তাদের দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশ থেকে স্রোতধারা সদা প্রবাহিত এবং তথায় তারা চিরদিন থাকবে। বস্তুত আমলকারীদের জন্য কতই না কর্মফল রয়েছে। —সূরা আল-ইমরান ঃ ১৩৫-১৩৬

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَ هُوَ الَّذِیْ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِہٖ وَ یَعْفُوْا عَنِ السَّیِّاٰتِ

সে আল্লাহ্ তিনিই, যিনি তাঁর বান্দাগণের পক্ষ থেকে তওবা কবুল করেন এবং তার খারাপ কার্যসমূহ ক্ষমা করে দেন। —সূরা শূরা ঃ ২৫

اَلَمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِہٖ وَ یَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ۝

এই লোকেরা কি জানে না যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের তওবা কবুল করেন ও তাদের সাদৃশসমূহ গ্রহণ করেন এবং সব চাইতে বড় কথা আল্লাহ্ তো চিরন্তন তওবা কবুলকারী অতিশয় দয়াবান। —সূরা তাওবা ঃ ১০৪

اِنَّ اللّٰهَ لاَ یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهٖ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَّشَاءُ ط

আল্লাহ্র সহিত শিরক্ করা হলে তিনি তা ক্ষমা করেন না। আর তার চাইতে কম মাত্রার গুণাহ্ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। —সূরা নিসা ঃ ১১৬

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰی تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَ لاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتّٰی تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

হিজরত বন্ধ হবে না যতক্ষণ না, তওবা বন্ধ হচ্ছে এবং তওবাও বন্ধ হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হচ্ছে।

تُبَایِعُوْنِیْ عَلٰی اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَیْئًا وَ لاَ تَزْنُوْا وَ لاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ فَمَنْ اَصَابَ شَیْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَعُوْقِبَ بِهٖ فِی الدُّنْیَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهٗ وَ مَنْ اَصَابَ شَیْئًا مِنْ ذٰلِكَ نَسَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ اِلَی اللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَفَا وَ اِنْ شَاءَ عَذَبَهٗ –

www.pathagar.com

তোমরা আমার হাতে এই কথার উপর বায়'আত কর যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত একবিন্দু শিরক্ করবে না, ব্যভিচার করবে না, সুবিচার ভিত্তিক ছাড়া আল্লাহ্‌র হারাম করা মানুষ হত্যার অপরাধ করবে না। কোন লোক যদি এইসব অপরাধের কোন একটা করে বসে এবং সে জন্য সে দুনিয়ায় শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তা তার জন্য কাফ্‌ফারা গণ্য হবে। আর কেউ যদি অনুরূপ কোন অপরাধ করে এবং আল্লাহ্ তা গোপন করেন, তাহলে আল্লাহ্ চাইলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন, আর চাইলে তাকে আযাব দেবেন—এটা সম্পূর্ণ তাঁরই ইখতিয়ার।

হাদীসে আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের এক ব্যক্তির ঘটনা এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, সে নিরানব্বইজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। সে তার সময়কার একজন আলিমকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, তার এই অপরাধের জন্য তার তওবা করার দুয়ার খোলা আছে কি-না ? সে বলেছিল, না তার এ অপরাধের কোন তওবা নেই। এই কথা শুনে সে ক্রুদ্ধ হয়ে সেই আলিমকেও হত্যা করে। এতে তার হত্যার সংখ্যা একশটি পূর্ণ হয়। পরে সে আর একজন আলিমের নিকট গিয়ে ফতোয়া চাইল। তিনি জওয়াবে বলেছিলেন, তার ও তওবা'র মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কিছুই কোথাও নেই এবং তিনি তাকে কয়েকটি দেশের নাম করে সে সব দেশে চলে যেতে বললেন। কেননা এইসব দেশের লোক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং সে যেন তাদের সাথে একত্র হয়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে।

এই পর্যায়ে কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঃ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ه

বল হে আমার সেসব বান্দা। যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণ করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হবে না, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। কেননা তিনিই অতিশয় ক্ষমাশীল ও অশেষ দয়াবান। —সূরা যুমার ঃ ৫৩

এ আয়াতটির শানে নুযূল পর্যায়ে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই ঃ মুশরিকদের কিছু লোক ব্যাপক নরহত্যার অপরাধ করেছিল এবং সেই সাথে যিনার জঘন্য অপরাধেও লিপ্ত হয়েছিল। তারা রাসূলে করীমের নিকট একথা জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছিল যে, আপনি যে দীন গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন, তা খুবই উত্তম ও কল্যাণময় সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের জন্য তওবা করার সুযোগ আছে কিনা, তা-ই আপনার নিকট থেকে জানতে চাই। তখন উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। —বুখারী

www.pathagar.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ মক্কাবাসীরা বলাবলি করত, মুহাম্মদ (সা) মনে করেন, যারা মূর্তি পূজা করেছে ও নরহত্যা করেছে—যা হারাম করেছেন আল্লাহ্—তাদের কখনই ক্ষমা করা হবে না। এরূপ অবস্থায় আমরা যখন এই সব অপরাধই করেছি, তখন কি করে আমরা ইসলাম কবুল করি এবং কি আশায় আমরা হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে যাই ? এই কথার জবাবে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

এই কথাও বলা হয়েছে যে, উক্ত আয়াতটি কিছু সংখ্যক মুসলমানের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তারা জাহিলিয়তের জামানায় শিরক্ করেছিল, অকারণ নরহত্যা করেছিল বলে তাদের মনে এই আশংকা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, তাদের হয়ত ক্ষমা করা হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও আতা তাবেয়ী থেকে প্রাপ্ত অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত আয়াতটি হযরত হামজা'র হত্যাকারী অহশীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। কেননা সে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা পাবে না ও তার ইসলাম কবুল হবে না এই আশংকা করে সে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল। পরে সে রাসূলে করীমের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ আমি আল্লাহ্র সহিত শিরক্ করেছি, আল্লাহ্ হারাম করেছেন এমন নরহত্যা করেছি, ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছি। এরূপ অবস্থায় আমার জন্য কি তওবার অবকাশ আছে ? অতঃপর উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

(الجامع لاحكام القرأن ج ١٠ ص ٢٦٨)

এই সব কয়টি বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতটি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নরহত্যার অপরাধেরও তওবা আছে এবং হত্যাকারীও আল্লাহ্র নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করতে পারে।

প্রথমোক্ত মতের প্রমাণাদির পর্যালোচনা

প্রথমোক্ত মতের বড় দলীল হচ্ছে এই আয়াত (যার অর্থ)

যে লোক কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করবে, তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম। তথায় চিরদিন থাকবে, আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তার জন্য বড় ধরনের আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতটি একটি নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল বলে এই আয়াতের প্রতিপাদ্য সেই নির্দিষ্ট ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তার উপর কিয়াস করে কোন সাধারণ নিয়ম গ্রহণ করা যাবে না এবং তা থেকে সরে গিয়ে অনুরূপ অন্যান্য ঘটনাবলী সম্পর্কে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না।

www.pathagar.com

আর সে ঘটনাটি ছিল এই যে, চারাবা পুত্র মকীম তার ভাই হিশামকে বনী নাজ্জার গোত্রের বসতির নিকট নিহত অবস্থায় পেল। এ দুই ভাই মুসলিম ছিলেন। পরে রাসূলে করীম (সা)-কে এই বিষয়ে খবর পাঠানো হলো। তখন নবী করীম (সা) বনূ ফহরের একটি লোক তার সঙ্গে করে বনূ নাজ্জারের নিকট পাঠালেন। তাদের নির্দেশ দিলেন যে, মকীমের ভাইর হত্যাকারীকে তার হাতে অর্পণ করে দাও। বনূ নাজ্জারের লোকেরা বললো, হত্যাকারী কে, তা আমরা জানি না। তবুও আমরা এই রক্তের বিনিময়ে 'দীয়াত' দিতে প্রস্তুত আছি। তারা একশ'টি উট-ও তাকে দিয়ে দিল। লোকটি তা সঙ্গে নিয়ে মদীনায় রওয়ানা হলো। কিন্তু পরে পথিমধ্যে চারাবা বনূ ফহরের ব্যক্তিটিকে হত্যা করল ও তার নিহত ভাইর রক্তের বিনিময়ে উটগুলি নিয়ে মক্কার দিকে চলে গেল মুরতাদ ও কাফির হয়ে। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। তখন নবী করীম (সা) বলেছিলেন ঃ এই ব্যক্তিকে আমি ইহ্‌রাম বা অ-ইহ্‌রাম যে অবস্থায়ই পাব, তাকে শেষ করে দেব। পরে মক্কা বিজয়কালে যখন সে কা'বার স্তম্ভ ধরে পানাহ চাচ্ছিল, রাসূলে করীম (সা) তাকে ধরে নিয়ে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কুরআনে 'কিসাস' শব্দের প্রয়োগ

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَ لَا كُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ 'কিসাসে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত'। 'হত্যার শাস্তিস্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করাকে' কুরআন বলেছে কিসাস قصاص 'কিসাস' শব্দ ব্যবহারের কারণ হচ্ছে, এই শব্দটি সুবিচার, (Justice) সমান সমান (Sameness) ও অনুরূপতা (Similarity) বোঝায়। বস্তুত এই শব্দটি মূল বিষয়টিকে পুরোপুরি ব্যক্ত করে, তাতে তাকিদ বোঝায় এবং তার সব কয়টি দিককে রক্ষা করতে সক্ষম করে তোলে। বিশেষ করে হত্যাকারীর 'কিসাস' অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হত্যাকারী প্রমাণের জন্য যতগুলি শর্ত রয়েছে এবং তার আনুসঙ্গিক যে জরুরী বিষয়াদি রয়েছে তা সবই পূর্ণমাত্রায় তাতে বর্তমান পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত 'কিসাস' হচ্ছে সমাজ-সমষ্টির বিধি। কুরআন এই কারণে এই শব্দটি ব্যবহার করেছে قصاص। শব্দটির ব্যবহার করা হয়নি। কেননা এই শব্দটি ব্যক্তিগত আইন বোঝায়।

এ ছাড়াও এই পর্যায়ে এ শব্দগুলিও রয়েছে, যেমন ঃ ثار প্রতিশোধ (To revenge), হত্যা (To kill) ও قَوَدٌ নিহতের বদলে হত্যাকারীকে হত্যা করা' কিন্তু কুরআন মজীদ এই শব্দগুলির কোন একটিও তার বক্তব্য বোঝাবার জন্য ব্যবহার করেনি। তার কারণ হচ্ছে, প্রথম শব্দটিতে শত্রুতা, প্রতিহিংসা (ill will), অসংবৃত ক্রোধ, রক্তপাতের অত্যুৎসাহ এবং তাতে অন্যদেরও শরীক হওয়ার জন্য উত্তেজিত করা বোঝায়। জাহিলিয়তের যুগে এই শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার হতো।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় শব্দটি 'হত্যা' বললে প্রথমটাও হত্যা আর তার দণ্ডস্বরূপ যা করা হলো সেটাও 'হত্যা' হয়ে যায়। ইচ্ছাপূর্বক বা সীমালংঘনমূলকভাবে হত্যা ও বিচারস্বরূপ হত্যা–এর মধ্যে কোন পার্থক্য বোঝায় না।

আর তৃতীয় শব্দ قَوَدٌ লাঞ্ছনা ও অপমান বোঝায় ; ঠিক যেমন গরু বা ছাগল-ভেড়া হত্যা করার জন্য টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, এ-ও যেন তেমনি। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত ইচ্ছামূলক হত্যার শাস্তিস্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান দিয়েছে, তাতে উপরোক্ত ধরনের কোন ভাবধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং শরীয়তী ভাবধারা হচ্ছে সুবিচার ও ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বাস্তবায়ন।

কিসাসে নিহিত জীবন এর তাৎপর্য

আল্লাহ্ তা'আলা বিবেক-বুদ্ধিমান লোকদের লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

হে বিবেক-বুদ্ধিমান লোকেরা ! কিসাসে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত রয়েছে, সম্ভবত তোমরা তার দরুন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

'কিসাসে নিহিত জীবন' বলতে আল্লাহ্ তা'আলা কি বোঝাতে চেয়েছেন ? অথচ কিসাসেও তো রক্তপাত ও প্রাণ সংহার সংঘটিত হয়ে থাকে ?

জওয়াবে বলা যায়, ইসলাম হচ্ছে সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠাকারী জীবন বিধান। মুসলিম ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি ও মন-মানসিকতাকে সঠিক ও সুষ্ঠুরূপে লালন করে, ক্রমবৃদ্ধি ও বিকাশ দান করে। মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত স্বাভাবিক ভাবধারা ও প্রবণতার প্রতি ইসলাম কোনরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করেনি বা তা করতে বলেওনি। কেননা তা করা হলে মানুষকে সেই কাজের দায়িত্ব দেয়া হতো, যা তার সাধ্যায়ত্ত নয়। ইসলামী শরীয়তও মানুষের সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়নি মানুষের উপর। বরং শরীয়ত সহজতা ও কষ্ট লাঘবের বিধান নিয়ে এসেছে। অতএব যে কাজ মানুষের প্রতি কেবল সেই কাজ করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা সে করবার সাধ্য রাখে। যদি অসাধ্য সাধনের নির্দেশ দেয়া হতো, তা হলে সে নির্দেশ এবং তার বাস্তবায়নের মাঝে বিরাট প্রতিবন্ধকতা মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। সে নির্দেশ কখনই বাস্তবায়িত হতে পারতো না এবং শরীয়ত কখনই কার্যকর হতো না। ইসলামী শরীয়ত কি করে মানুষকে অসাধ্য সাধনের নির্দেশ দিতে পারে ! এ শরীয়ত তো অসম্পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধির মানুষের রচিত নয়। এ শরীয়ত হচ্ছে মহান দয়াময় ও চূড়ান্ত বিধানদাতা আল্লাহ্ তা'আলা রচিত ও উপস্থাপিত। তিনি তো মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণই কামনা করেন এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন ও সেই দিকে পরিচালিত-ও করেন।

বস্তুত নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও নিকটাত্মীয়দের মনে সে জন্য যে ক্রোধের সঞ্চার হয়, পাষাণ মন-মানসিকতায় যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তারা স্পষ্ট দেখতে পায় ও

www.pathagar.com

অনুভব করে যে, তাদের উপর অকারণ অবর্ণনীয় যুলুম করা হয়েছে, ইসলামী শরীয়ত তার গুরুত্বপূর্ণ মাত্রায় স্বীকার করছে। তাদের হৃদয় মনে যে ক্রোধ আক্রোশ ও প্রতিশোধ স্পৃহার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে, যা অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর রক্তপাত করা ছাড়া কিছুতেই নির্বাপিত হবে না, ইসলাম তার গুরুত্বও অস্বীকার করেনি ; বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই গণ্য করেছে। কেননা জীবনের উপর অকারণ হামলা মূলতই প্রতিকারহীন। প্রাণ সংহারের পর তাকে দেহে পুনরায় ফিরিয়ে আনা তো কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। দেহ ও প্রাণের বিচ্ছেদ চিরন্তন চিরকালের জন্যই। এই দুনিয়ায় এ দুয়ের পুনর্মিলন আর কখনই সম্ভব হতে পারে না। আর প্রাণ ও দেহের মধ্যকার এই বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী হচ্ছে তার হত্যাকারী। সে-ই তো তাকে অকারণ—বরঞ্চ যুলুমস্বরূপ হত্যা করে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

ফলে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ হওয়াই স্বাভাবিক। ইসলাম পূর্বকালে—সর্বকালের সকল দেশের সকল জাহিলী সমাজেই এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। তখন নিহতের পক্ষের লোকেরা এক ব্যক্তির জীবন নাশের প্রতিফলস্বরূপ একাধিক মানুষকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করত না—এখনও করে না। তাতে আসল হত্যাকারীর বদলে নিহত হতো এক বা একাধিক এমন লোক, যারা প্রথম হত্যাকাণ্ড করেনি বা তার সহিত জড়িতও ছিল না। এর পরিণতিতে এমন ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত, যা বংশানুক্রমে চলতে থাকত। কেননা হত্যাকারী নয় এমন লোককে হত্যা করলে সেই নিহতের পক্ষের লোকদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রতিশোধ গ্রহণের এ আক্রোশ খুবই ভয়াবহ হয়ে দেখা দিত। ফলে গোটা সমাজ পরিবেশই মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা পাওয়ার কোন আশাই করা যায় না এইরূপ অবস্থায়। মানব বিধ্বংসী চক্র তখন তীব্র গতিতে আবর্তিত হতে শুরু করে, যার আঘাতে অসংখ্য মানুষের জীবন নাশ হয়। সে চক্র কিছুতেই থাকতে চায় না।

এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্‌র ঘোষণা—'কিসাসে' তোমাদের জন্য জীবন নিহিত' কথাটির গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্য অনুধাবনীয়। অকারণ ও জুলুম স্বরূপ নিহত ব্যক্তির আপনজনের মনে যে ক্রোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন জ্বলে ওঠে, ইসলামের বিধান অনুযায়ী 'কিসাস' কার্যকর হলেই সে আগুন নির্বাপিত হতে পারে এবং যারা হত্যাকারী নয়, তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করাও সম্ভবপর। তখন অকারণ আর কারোর জীবন নাশ হওয়ারও আশংকা থাকে না। কেউ কাউকে হত্যা করতে উদ্যত হবে না। কেননা সে নিঃসন্দেহে জানবে যে, অকারণ কাউকে হত্যা করলে তাকেও প্রাণ দিতে হবে সেই হত্যার শাস্তিস্বরূপ। আর এ-ই হচ্ছে চূড়ান্ত মাত্রার ইনসাফ ও সুবিচার।

www.pathagar.com

হত্যা অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার জরুরী দিক

হত্যাকাণ্ডকে অপরাধরূপে চিহ্নিত ও নির্ণীত করার জন্য নিম্নোক্ত দিকগুলির উপস্থিতি ও বর্তমানতা অপরিহার্য ঃ[১]

১. হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট পাত্র।

২. হত্যাকার্যে ব্যবহৃত হাতিয়ার বা অস্ত্র।

৩. হত্যকাণ্ডের মূল কারণ—উদ্দেশ্য কি ?

হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পাত্র হচ্ছে নিহত ব্যক্তি। একজন জীবন্ত ব্যক্তি সেই জীবন্ত ব্যক্তির প্রাণ সংহার করেছে। হত্যাকাণ্ডের হাতিয়াররূপে গণ্য হবে তা, যদ্বারা একজন জীবন্ত মানুষের প্রাণ সংহার করা কার্যত সম্ভব। আর উদ্দেশ্য বলতে এখানে ধর্তব্য হচ্ছে, হত্যাকারী তাকে হত্যা করতেই চেয়েছিল, হত্যা করার উদ্দেশ্যেই সে অস্ত্র দ্বারা আঘাত হেনেছিল এবং হত্যা করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তার ছিল না—একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

ইচ্ছামূলক হত্যা-অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলী

ইচ্ছামূলকভাবে হত্যা করেছে, অতএব তার কিসাস অনিবার্য—এই কথা প্রমাণের জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। শর্তসমূহ পুরামাত্রায় পাওয়া গেলেই ইচ্ছামূলক হত্যা প্রমাণিত হবে এবং হত্যাকারীকে কিসাসের দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। এই শর্তসমূহের কয়েকটি হত্যাকারীর সহিত সংশ্লিষ্ট, আর কয়েকটিকে পেতে হবে নিহত ব্যক্তির মধ্যে।

হত্যাকারী হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত হচ্ছে, তাকে শরীয়ত পালনে বাধ্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির পিতা নয়—এমন হতে হবে। শরীয়ত পালনে বাধ্য হওয়ার যোগ্যতা হয় তখন যখন কোন লোক পূর্ণ বয়স্ক হয়, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়–পুরুষ-মহিলা যে-ই হোক-না কেন, হত্যাকারী সাব্যস্ত হতে কোন অসুবিধা নেই। আর নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ, সে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈধ নাগরিক হবে, অথবা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করার স্বাধীনতা বা অধিকার প্রাপ্ত হবে ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারে।

আর নিহত ব্যক্তিকে এরূপ রাষ্ট্রের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে হবে।

---

১. আব্দুল কাদের আউদাহ শহীদ লিখেছেন ঃ (১) শরীয়তের অকাট্য দলীলে যা অপরাধরূপে চিহ্নিত, কেবল তা-ই অপরাধ। তাছাড়া অপরাধ বলে কোন কাজকে চিহ্নিত করা যাবে না। (২) যে লোক ব্যক্তিগতভাবে অপরাধ কাজে জড়িত, কেবল সে-ই অপরাধীরূপে চিহ্নিত হবে, অন্য কেউ নয় এবং (৩) কাজটির মূলে নিহিত থাকতে হবে হত্যা করার উদ্দেশ্য। হত্যা প্রমাণের জন্য তাঁর মতে অস্ত্রের কোন গুরুত্ব নেই। কেননা তা কখনো থাকে, কখনো থাকে না।

www.pathagar.com

ভুলবশত অথবা প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যার অপরাধ

ইচ্ছামূলক হত্যার যে কয়টি শর্তের উল্লেখ রয়েছে, তার কোন একটিও যদি যথাযথ উপস্থিত না পাওয়া যায়, তাহলে সে হত্যাকে ইচ্ছামূলক হত্যা বলা যাবে না। বিশেষ করে দ্বিতীয় শর্তটির অনুপস্থিতিতে হত্যাটিকে বলতে হবে 'প্রায় ইচ্ছামূলক' অথবা 'পূর্ণ মাত্রায় ইচ্ছামূলক নয়', 'ইচ্ছামূলক হত্যা সদৃশ'। আর তৃতীয় শর্ত 'হত্যার উদ্দেশ্যে' অস্ত্র চালানো না হলে সে হত্যাকে 'ভুলবশত হত্যা' বলতে হবে।

শরীয়তের বিশেষজ্ঞগণ হত্যাকাণ্ডের এইরূপ শ্রেণীবিন্যাসই করেছেন। তবে কেউ কেউ বলেছেন, হত্যা দু'প্রকার, হয় তা ইচ্ছামূলক হবে, না হয় 'ভুলবশত হত্যা' হবে। তৃতীয় কোন প্রকারের হত্যা অকল্পনীয়।

হত্যার এরূপ শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা শরীয়ত অনুযায়ী কেবলমাত্র ইচ্ছামূলক হত্যার শাস্তি হচ্ছে 'কিসাস'। যে হত্যা পুরাপুরি ইচ্ছামূলক নয়—প্রায় ইচ্ছামূলক বা ইচ্ছামূলক সদৃশ, কিংবা যা ভুলবশত সংঘটিত হয়েছে, তাতে 'কিসাস' হবে না, 'দীয়াত' দিতে হবে। তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা যদি ক্ষমা করে দেয়, তাহলে কিছুই দিতে হবে না।

এই কথার দলীল

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَاءً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلاَّ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط

কোন ঈমানদার ব্যক্তিই অপর কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে কখনই হত্যা করতে পারে না। তবে ভুলবশত হত্যা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। অতএব যে লোক ভুলবশত কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার দণ্ডস্বরূপ একজন ঈমানদার ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে এবং দীয়াত হস্তান্তর করতে হবে নিহতের আপনজনের নিকট। তবে তারাই যদি সাদকা বা দান করে, তা হলে ভিন্ন কথা।

—সূরা নিসা ঃ ৯২

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন ঃ

وَ اِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ وَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ٥

যদি নিহত ব্যক্তিটি এমন জনগোষ্ঠীর লোক হয়, যাদের সহিত তোমাদের অনাক্রমণের চুক্তি সম্পাদিত আছে, তা'হলে নিহতের অভিভাবকদের নিকট দীয়াত হস্তান্তর করতে হবে ও একজন মু'মিন ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে।

—সূরা নিসা ঃ ৯২

www.pathagar.com

হযরত ওর্ওয়া ইবনয্ যুবায়র বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত হুযায়ফা ইবনুল য়ামান (রা) রাসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গে ওহোদ যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। মুসলমানরা তাঁর পিতাকে শত্রু পক্ষের লোক মনে করে তার উপর তরবারির আঘাত হানলেন। হযরত হুযায়ফা বললেন, ইনি তো আমার পিতা। কিন্তু লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে না পেরে তাঁরা তাকে হত্যা করে ফেললেন। তখন তিনি বলে উঠলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন, তিনিই সকল দয়াশীলের চাইতেও অধিক দয়াবান। পরে নবী করীম (সা) এই সংবাদ পেলেন। তাতে তাঁর নিকট হযরত হুযায়ফার মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল।

বালক ও পাগলের হত্যাকাণ্ড

বালক বলতে বোঝায় যার বয়স পনেরোয় পৌছিনি। কেননা এই বয়সের লোকেরাই শরীয়ত পালনে বাধ্য হয়। আর পাগল বলতে বোঝায় যার বুদ্ধি-বিবেক লোপ পেয়েছে এবং কখনই হুঁশ-জ্ঞান ফিরে আসে না।

এই বালক ও পাগল যদি কোন নিরপরাধ মানুষকে রক্তপাত ও প্রাণ সংহারে সক্ষম অস্ত্র দ্বারা কাউকে হত্যা করে, তা হলে এই হত্যাকাণ্ডকে 'ভুলবশত হত্যা' গণ্য করা হবে এবং এর দণ্ড হচ্ছে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের নিকট 'দীয়াত' আদায় করা। কেননা হত্যাকাণ্ড প্রমাণের তৃতীয় শর্ত—হত্যা করার ইচ্ছা ও সংকল্প—এখানে অনুপস্থিত।

কিসাস লওয়ার হাতিয়ার

শরীয়তে কিসাসের হাতিয়ার হচ্ছে তরবারি। কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لاَ قَوَدَ اِلاَّ بِالسَّيْفِ

তরবারি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে প্রতিকার হয় না।

তাছাড়া তরবারি খুবই তীক্ষ্ম শানিত হয়ে থাকে। যার উপর তা চালানো হবে তাকে খুব দ্রুত ঠাণ্ডা করে দেবে। সে অন্যভাবে কষ্ট পাবে না। উপরন্তু লোকেরা তরবারিকে খুব বেশি ভয় পায়। ফলে তা জীবন্ত লোকদের জন্য একটা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের ক্রোধাগ্নিও নির্বাপিত করে।

শরীয়ত হত্যাকারীর উপর 'কিসাস' কার্যকর করার পূর্বে ও পরে তাকে কোনরূপ অপমানিত বা লাঞ্ছিত করার অনুমতি দেয় না। কিসাসের বিধান করা হয়েছে সুবিচার ও ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। তাই বলে কিসাস কার্যকর করার পূর্বে তাকে কোনরূপ মারধর করা, তার উপর নির্যাতন-নিষ্পেষণ চালানো, জেলের মধ্যে কষ্ট দেওয়া বা ক্ষুৎ-পিপাসায় ছটফট করতে বাধ্য করা এবং কিসাস কার্যকর হওয়ার পর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা করা, দেহ বিকলাঙ্গ বা বিকৃত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বরং কিসাস কার্যকর হওয়ার পর তার জানাযা পড়া ও মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি কোন ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা হত্যা করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَ اِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَ لْيَحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَ لْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ –

আল্লাহ্ তা'আলা সব জিনিসের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন লিখে দিয়েছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে (দণ্ডস্বরূপ), তখন এই হত্যাকার্য উত্তমভাবে সম্পন্ন করবে, আবার যখন যবেহ করবে তখনও খুব ভালোভাবে যবেহ কার্য সম্পন্ন করবে। (হত্যা বা যবেহর কাজ) তোমাদের যে-ই করবে, সে যেন তার ছুরি খুব শানিত করে লয় এবং যবেহ করার পর যবেহকৃত প্রাণীটি সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

কোন কোন শরীয়ত বিশেষজ্ঞ এই মত প্রকাশ করেছেন যে, হত্যার দণ্ডস্বরূপ যে হত্যা কার্য হবে, তা ঠিক সেইভাবেই হতে হবে যেভাবে প্রথম হত্যাকাণ্ডটি হয়েছিল। দলীল হিসাবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত দুইটি ঃ

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ –

তোমরা যখন প্রতিশোধস্বরূপ শাস্তি দেবে, তখন তোমরা তা করবে ঠিক সেইভাবে, যেভাবে তোমরা নিজেরা (ইতিপূর্বে) শাস্তি পেয়েছ। —সূরা নাহল ঃ ১২৬

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

অতএব যে লোক তোমাদের উপর সীমালংঘনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করল, তোমরাও ঠিক সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ কর যেমন তোমাদের উপর সীমালংঘন করা হয়েছে। —সূরা বাকারা ঃ ১৯৪

রাসূলে করীম (সা) এসব আয়াতের আলোকেই একজন ইয়াহুদীর মস্তক দুইটি প্রস্তরের মাঝে রেখে ছেঁচে দিয়েছিলেন। কেননা সে দুইটি প্রস্তরের মাঝখানে রেখে একটি মেয়ের মস্তক চূর্ণ করেছিল।

কিসাস সম্পূর্ণ করার শর্ত

কিসাস কার্যকরকরণের জন্য নিম্নোদ্ধৃত শর্ত তিনটির পূর্ণভাবে পাওয়া যাওয়া একান্তই জরুরী।

—কিসাস যোগ্য ব্যক্তিকে অবশ্যই পূর্ণ বয়স্ক—শরীয়ত পালনে বাধ্য হওয়ার যোগ্য হতে হবে। যদি সে বালক বা পাগল হয়, তাহলে তার উপর কিসাস করা যাবে না। বরং তা বিলম্বিত করতে হবে। হত্যাকারীকে আটক করে রাখতে হবে যদ্দিন না বালক পূর্ণ বয়স্ক এবং পাগল পূর্ণরূপে সুস্থ মন-মগজ ও বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী হচ্ছে।

www.pathagar.com

—দণ্ড দেওয়ার যোগ্য সকল অধিকারীই দণ্ড কার্যকরকরণে সম্পূর্ণ একমত হবে। যোগ্য অধিকারী বলতে বোঝানো হয়েছে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সব পুরুষ ও মেয়েলোক—বড় বয়সের ও ছোট বয়সের সব লোক। শরীয়তের জমহুর আলিমগণ এই মত প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ কেবল পুরুষ উত্তরাধিকারীদের কথাই বলেছেন। কেননা দণ্ডিতব্য ব্যক্তি তাদের সম্মুখেই লজ্জা পাবে।

—কিসাস পূর্ণরূপে কার্যকর হওয়ায় হত্যাকারী নয়—এমন ব্যক্তিদের পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। 'কিসাস' যদি গর্ভধারিণীর উপর কার্যকর করতে হয় অথবা কিসাস ফরয হওয়ার পর সে গর্ভধারিণী হয়ে পড়ে, তাহলে গর্ভপ্রসব হওয়ার ও প্রসূতের দুগ্ধ সেবন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা কার্যকর করা যাবে না।

কিসাস কার্যকর করবে কে ?

কিসাস কার্যকর করবে কে, এ একটা আনুসঙ্গিক এবং জরুরী প্রশ্ন। এই পর্যায়ে কুরআন মজীদের এ আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ط اِنَّه كَانَ مَنْصُوْرًا –

আর যে লোক অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে, তার অভিভাবককে আমরা কিসাস দাবি করার অধিকার দিয়েছি। তবে সে যেন প্রতিহত্যা কাজে সীমালংঘন না করে। অবশ্যই তার সাহায্য করা হবে। —সূরা ইসরা ঃ ৩৩

আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির রক্তের 'কিসাস' লওয়ার ও পাওয়ার অধিকার তার অভিভাবকের রয়েছে। এই অধিকার আল্লাহ্‌র দান। কিন্তু এই অধিকার কিভাবে বাস্তবায়িত করা হবে, যেহেতু এই অধিকার ব্যক্তিগতভাবে কাউকেই দেয়া যায় না ? মুসলমানদের রাষ্ট্র-সরকারই এই অধিকার বাস্তবায়নে প্রধান পৃষ্ঠপোষক। অথচ এ আয়াত মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছিল এবং তখন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম হয়নি। তাই নিহতের অভিভাবককে কিসাস বাস্তবায়নে সাহায্য করা হবে বলেই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হয়ে গেল, তখন এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল যে, নিহতের অভিভাবককে কিসাস বাস্তবায়নে সাহায্য করার দায়িত্ব তার গোত্র বা মিত্রদের নয়, সে দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র-সরকার ও তার অধীন কায়েম হওয়া ইসলামী বিচার ব্যবস্থার উপর অর্পিত। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজস্বভাবে হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী নয়। এই কর্তব্য ইসলামী হুকুমাতের। অতএব কিসাস দাবি করার অধিকার অভিভাবকের হলেও তার বাস্তবায়নের জন্য তাকে ইসলামী রাষ্ট্র সরকারের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র-সরকার মহান আল্লাহ্‌র অর্পিত দায়িত্ব হিসাবে নিহতের অভিভাবকের দাবি অনুযায়ী কিসাস কার্যকর করবে। যদিও কেউ কেউ এই মতও দিয়েছেন যে, নিহতের অভিভাবক কিসাস কার্যকর করার

www.pathagar.com

কাজটি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করতে সক্ষম হলে সে নিজ হস্তেই তা সম্পন্ন করবে। অন্যথায় সে অন্য কাউকে—যে তা যথাযথরূপে আঞ্জাম দিতে পারবে বলে মনে হবে, তাকে এজন্য প্রতিনিধিরূপে দায়িত্ব দিবে। তবে এই কাজটি করতে হবে সরকার কর্তৃপক্ষীয় লোকের উপস্থিতিতে।

কিন্তু মূলত এই কাজটি সরকারীভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত বলেই মনে হয়।

হত্যাকাণ্ডের কম মানের অপরাধে কিসাস

ইসলামী শরীয়ত সুবিচার ও ন্যায়পরতা এবং সাম্য ও শান্তি-নিরাপত্তা রক্ষার লক্ষ্যে প্রাণ-সংহারের কম মানের অপরাধেও কিসাস বিধিবদ্ধ করেছে। 'হত্যার কম মানের অপরাধ' বলতে হাত, পা, চক্ষু, কান, নাক, জিহ্বা, চক্ষুর পাতা, ওষ্ঠ ও অঙ্গলি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে অপরাধ হয়, তা-ই বোঝানো হয়েছে। কেউ যদি অন্য কোন ব্যক্তির এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর আঘাত হানে ও তা কেটে ফেলে বা চূর্ণ-বিচূর্ণ কিংবা অকেজো করে দেয়, তাহলে তার অঙ্গের এই ক্ষতির অনুরূপ আক্রমণকারীর অঙ্গের ক্ষতি সাধনের অধিকার লাভ করে শরীয়ত ঘোষিত 'কিসাস' হিসাবে।

কিন্তু এই কিসাস পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নিম্নোদ্ধৃত তিনটি শর্ত জরুরীভাবে উপস্থিত থাকা একান্তই আবশ্যক ঃ

১. কিসাস কার্যকর করার সময় অবিচার ও অসম পদক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ।

২. অপরাধ স্থানের অনুরূপতা অর্থাৎ প্রথমে যদি একজনের ডান হাতের উপর এই অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহলে অপরাধীর ঠিক ডান হাতের উপরই তার কিসাস কার্যকর হতে হবে, অন্যত্র নয়।

৩. উভয়ের সুস্থতা ও পূর্ণাঙ্গতায় সমান হতে হবে অর্থাৎ কারোর অবশ হাতের বিনিময়ে অপরাধীর সুস্থ হাত,কারোর অপূর্ণ অঙ্গুলির বদলে অপরাধীর পূর্ণ অঙ্গুলি, কারোর অস্বচ্ছ দৃষ্টিমান চক্ষুর বিনিময়ে সুস্থ স্পষ্ট দৃষ্টিমান চক্ষু এবং কারোর কথা উচ্চারণে অক্ষম জিহ্বার বিনিময়ে অপরাধীর স্পষ্ট উচ্চারণক্ষম জিহ্বার উপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না।

ইসলামী শরীয়তে 'দীয়াত' ব্যবস্থা

ইসলামী শরীয়তে কিসাসের সাথে সাথে 'দীয়াতে'র বিধান এই উম্মতের প্রতি একটি অন্যতম দয়াপূর্ণ ব্যবস্থা হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মত ইয়াহুদী শরীয়তে হত্যাকারীর উপর শুধু কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছিল। আর খৃস্টানদের শরীয়তে ছিল শুধু 'দীয়াতের' ব্যবস্থা। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত মধ্যমপন্থী দণ্ড বিধান উপস্থাপিত করেছে। আর এই মধ্যম পন্থা অবলম্বনই ইসলামী শরীয়তের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

ইসলাম একদিকে পূর্ণমাত্রার সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিসাসের বিধান দিয়েছে। তা পাওয়ার ও দাবি করার অধিকার দিয়েছে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের। সেই সাথে হত্যা অপরাধের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মনে একটা প্রচণ্ড প্রতিরোধকারী ভীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে। অবশ্য সেই সাথেই অভিভাবকদের এই স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে যে, তারা ইচ্ছা করলে কিসাস বাস্তবায়নের পরিবর্তে হত্যাকারীর নিকট থেকে রক্তমূল্য বাবদ প্রচুর পরিমাণের অর্থ নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিতেও পারে। কোন নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা তা করলে অবশ্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তাকে বিপুল সওয়াব দেয়ারও সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

তার কারণ হচ্ছে, ইসলামের দৃষ্টিতে নিহত ব্যক্তির রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার বাদী বা দাবিদার হচ্ছে তার অভিভাবকরা। আর তাদের জন্যই শরীয়তে এই ইখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে।

কিসাসের বদলে দীয়াত গ্রহণের বৈধতার দলীল

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَ اٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ٥

যার জন্য তার ভাইয়ের নিকট থেকে কিছু ক্ষমা করা হবে, তার কতর্ব্য হবে সুনীতির অনুসরণ করা এবং তা যথাযথভাবে তার নিকট আদায় করে দেয়া। এ হচ্ছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিকট থেকে বোঝা হ্রাসকরণ এবং বিশেষ অনুগ্রহ।
—সূরা বাকারা ঃ ১৭৮

وَ اَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

আর যদি তোমরা ক্ষমা করে দাও, তবে এই ক্ষমা তাকওয়ার নিকটবর্তী কাজ।
—সূরা বাকারা ঃ ২৩৭

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّه

যে লোক তা সাদ্‌কা স্বরূপ দান করে দেবে, তা তার জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে দাঁড়াবে।
—সূরা মায়িদা ঃ ৪৫

وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

এবং ক্রোধ হজমকারী ও লোকদের ক্ষমাদানকারী মুত্তাকী লোক।—সূরা ইমরানঃ ১৩৪

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ اِلاَّ زَادَه اللهُ بِهَا عِزًّا

www.pathagar.com

কোন লোক যদি কারুর যুলুম ক্ষমা করে দেয়, তা'হলে আল্লাহ্ তার ইজ্জত বৃদ্ধি করে দেবেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন ঃ

مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَفِعَ اِلَيْهِ شَيْءٌ فِيْهِ قِصَاصٌ اِلاَّ اَمَرَ بِالْعَفْوِ فِيْهِ –

রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট কিসাসের কোন মামলা উত্থাপিত হলেই আমি দেখেছি, তিনি তা ক্ষমা করে দিয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِيْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَّ حَطَّ بِهِ عَنْهُ خَطِيْئَةً

কেউ যদি তার দেহে কোন আঘাত পায় কারুর দ্বারা এবং সে তা ক্ষমা করে দেয়, তা'হলে আল্লাহ্ তার মর্যাদা উঁচু করে দিবেন এবং তার ভুল খসিয়ে দিবেন।

নিহতের অভিভাবকদের নিকট সুপারিশ

কিসাসে দীয়াতের ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়তের একটা বিশেষ ব্যবস্থা। কাজেই কিসাস ক্ষমা করে দীয়াত গ্রহণে নিহতের অভিভাবকদের নিকট সুপারিশ করাও একটা বড় সওয়াবের কাজ, সন্দেহ নেই।

দীয়াত-এর পরিমাণ

মূলত দীয়াতের পরিমাণ হচ্ছে একশতটি উট। শরীয়তের কোন কোন বিশেষজ্ঞ এই মতও দিয়েছেন যে, আসলে রক্ত মূল্যস্বরূপ দিতে হবে স্বর্ণ–যাদের মুদ্রা স্বর্ণ নির্মিত। আর যাদের মুদ্রা রৌপ্য নির্মিত, তাদের রৌপ্য মুদ্রাই দিতে হবে অর্থাৎ প্রচলিত মুদ্রায় নগদ দেয়। স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ এক হাজার দীনার, আর রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ বারো হাজার দিরহাম। যারা গরু পালে, তাদের জন্য দীয়াত হচ্ছে দুইশত গরু। যারা ছাগল পালে তাদের ছাগল দিতে হবে দুই হাজার।

আসল কথা, মৃতের অভিভাবকদের সাথে যত পরিমাণে মীমাংসায় আসা যায়, তা-ই দিতে হবে।

কাফ্ফারা

'কাফ্ফারা' শব্দটি 'কুফর' থেকে নির্গত। তার অর্থ আবৃত করা, ঢেকে রাখা, কোন অপরাধের শরীয়তসম্মত কাফ্ফারা সেই গুনাহ্কে আবৃত করে রাখে এবং পুনরায় সেই অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে।

www.pathagar.com

এই কাফ্ফারাও ইসলামী শরীয়তের একটি দয়াপূর্ণ ব্যবস্থা, আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত। মুসলিম ব্যক্তি যদি কখনও ভুলবশত এই হত্যাকাণ্ড করে বসে, তখন সে অপরাধের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ স্বাভাবিকভাবে যে জ্বালা ও অনুতাপ হৃদয় মনে জেগে উঠে, তার প্রতিবিধানস্বরূপ এই কাফ্ফারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা আল্লাহ্‌র হক নষ্ট হওয়ার একটা বিশেষ শাস্তিও বটে।

আসলে কাফ্ফারার ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়তের একটা বিশেষ অবদান। তা যেমন প্রশিক্ষণমূলক, তেমনি সাংগঠনিক পদক্ষেপও বটে। শরীয়তে অনেক প্রকারের কাফ্ফারার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে আমরা এখানে শুধু হত্যাকাণ্ডের কাফ্ফারা সম্পর্কেই আলোচনা করব।

হত্যার ক্ষেত্রে কাফ্ফারা

শরীয়তের বহু আলিমের মতে শুধু ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রেই কাফ্ফারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে গুনাহ্ গোপন করা, গুনাহ্‌র প্রতিফল ক্ষমা পাওয়া। ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকাণ্ডের গুনাহ্ অত্যন্ত বড় ও কঠিন। এই কাজের প্রতিফল খুবই ভয়াবহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ইচ্ছামূলক হত্যাকাণ্ডে কাফ্ফারার কোন অবকাশ নেই। অপর বিশেষজ্ঞগণের মতে ইচ্ছামূলক হত্যায়ও কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব। কেননা ভুলবশত হত্যার তুলনায় ইচ্ছামূলক হত্যায় গুনাহ্‌র স্খলন অধিকতর প্রয়োজন, আর যে গুনাহ্ গোপন করার লক্ষ্যে কাফ্ফারার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই গুনাহ্ তো ইচ্ছামূলক হত্যায় অনেক মাত্রায় বেশি। অতএব তাতেও কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

হত্যার কাফ্ফারা[১]

আর হত্যার কাফ্ফারা হচ্ছে একজন মু'মিন ক্রীতদাস মুক্ত করা। তা না পাওয়া গেলে একাধারে দুই মাস ধরে সিয়াম পালন।

---

১. ইসলামী ফিকাহ্‌বিদগণ হক্—হক্‌ককে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হক্ খালিসভাবে আল্লাহ্‌র, একটি হক্, খালিস ও পুরাপুরিভাবে বান্দার আর একটি হক্ আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে মিলিত—যদিও অন্যান্য ফিকাহ্‌বিদগণ ভিন্নমত পোষণ করেন।

আল্লাহ্‌র হক্ হচ্ছে খালিস ইবাদতসমূহ। কাফ্ফারাও এই পর্যায়ে গণ্য—যার আলোচনা এখানে করা হয়েছে। বান্দাদের অর্থনৈতিক হক্, রয়েছে, দীয়াত প্রাপ্তি তার একটি। এই কারণেই দীয়াতের যে কোন পরিমাণ নির্ধারণ বা ক্ষমা করে দেয়ারও অধিকার দেয়া হয়েছে দীয়াতের প্রাপকদের। আল্লাহ্ ও বান্দার মিলিত হক্ হচ্ছে কিসাস। কিন্তু বান্দার হক্ তাতে অগ্রাধিকারী প্রাপ্ত। নিহতের অভিভাবকদের কিসাসও ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে এই কারণেই।

www.pathagar.com

এই কথার দলীল হচ্ছে কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত ঃ

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَاءً ج وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلاَّ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ط وَ اِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ وَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ز تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

মু'মিনের জন্য জায়েয নয় কোন মু'মিনকে হত্যা করা। তবে ভুলবশত হয়ে যেতে পারে। তাই যে লোক কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করবে, তার কাফ্ফারা হচ্ছে একটি মু'মিন ক্রীতদাস মুক্ত করা এবং নিহতের অভিভাবকের নিকট সমর্পিত দীয়াত। তবে তারা যদি সাদ্কা করে দেয়, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। নিহত লোকটি যদি তোমাদের শত্রু গোষ্ঠীর কেউ হয়—অথচ সে নিজে মু'মিন, তাহলেও একটি মু'মিন ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে। আর যদি এমন জনগোষ্ঠীর একজন হয়, যাদের ও তোমাদের মধ্যে অনাক্রমণের চুক্তি বিদ্যমান, তাহলেও নিহতের লোকজনের নিকট সমর্পিত দীয়াত ও একটি মু'মিন ক্রীতদাস মুক্ত করাই হবে তার কাফ্ফারা। যে তা পারে না, তার জন্য ক্রমাগত দুইমাসকালের সওম (রোযা) কাফ্ফারা স্বরূপ বরাদ্দ—আল্লাহ্র নিকট তওবাস্বরূপ, আর আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী। —সূরা নিসা ঃ ৯২

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতিপ্রাপ্ত কোন মুসলিম বা অমুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করলেও হত্যাকারীকে উক্ত কাফ্ফারা-ই আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী দণ্ড বিধানের বিস্তারিত রূপ

ইসলামী শরীয়তে তিন প্রকারের অপরাধ বিভক্তির ভিত্তিতে শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে ঃ

প্রথম প্রকার ঃ সে সব অপরাধ, যার 'হদ্দ' ঘোষিত হয়েছে। শরীয়তদাতা এই 'হদ্দ'কে ফরয রূপে ধার্য করেছেন। শরীয়ত কর্তৃক এই 'হদ্দ' নির্ধারিত হয়েছে। আর সে অপরাধগুলি হচ্ছে ঃ ব্যভিচার বা যিনা, যিনার মিথ্যা দোষারোপ, চুরি, ডাকাতি ও মাদক দ্রব্য বা মদ্যপান।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ হত্যা পর্যায়ের অপরাধ। শরীয়তে সেজন্য 'কিসাস' বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, অথবা দীয়াত ও কাফ্ফারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পর্যায়ের অপরাধের দণ্ডও শরীয়ত দাতা কর্তৃক সুনির্ধারিত। তবে এই কিসাস সুনির্ধারিত শাস্তি থেকে কয়েকটি দিক দিয়ে ভিন্ন প্রকৃতির।

প্রথম ঃ 'হদ্দ' ক্ষমার অযোগ্য শাস্তি যদি অপরাধের জন্য প্রশাসনে মামলা দায়ের হয়ে গিয়ে থাকে। কেননা এই শাস্তিটা আল্লাহ্র হক্রূপে গণ্য।

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

تَعَافُوا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِىْ مِنْ حَدّ فَقَدْ وَجَبَ

(سنن ابن داود ج ٢ ص ٤٤٦)

'হদ্দ' পর্যায়ের শাস্তিসমূহ তোমরা পরস্পরে মিলে মাফ করে দিতে পার। কিন্তু আমার নিকট 'হদ্দ' হতে পারে যে অপরাধে তার মামলা দায়ের হয়ে গেলে তা অবশ্যই কার্যকর হবে।

কিন্তু কিসাস—তা হত্যার অপরাধের দরুন হোক বা তার চাইতে কম মানের অপরাধে, তা যার উপর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার আছে, অথবা তার অভিভাবকও ক্ষমা করেত পারে। কেননা তা মূলত তারই হক্।

দ্বিতীয় ঃ 'হদ্দ'সমূহে সে অপরাধের মামলা দায়ের হওয়ার পর সুপারিশ করা জায়েয নয়। তবে কোন শরীয়ত বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, 'কযফ' বা যিনার মিথ্যা দোষারোপে তা করা যেতে পারে। প্রথম কথাটির দলীল হচ্ছে—নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

يَا اُسَامَةُ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ (نيل الا وطار ج ٧ ص ١٤٣)

www.pathagar.com

হে উসামা ! আল্লাহ্ নির্ধারিত 'হদ্দে' তুমি সুপারিশ করতে এসেছো ? অবশ্য 'কিসাস' পর্যায়ের অপরাধে সুপারিশ জায়েয। কেননা তা মানুষের অধিকারের ব্যাপার।

তৃতীয় ঃ 'হদ্দ' কার্যকর করা রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের দায়িত্ব। মুসলিম ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, সাহাবীদের একজন বললেন, যাকাত, 'হদ্দ'সমূহ, ফাই এবং জুম'আর নামায রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রশাসকের (অর্থাৎ সরকারের) দায়িত্বভুক্ত।' ইমাম তাহাভী এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, কোন সাহাবী এর বিপরীত মত দিয়েছেন বলে আমরা জানি না।

পক্ষান্তরে 'কিসাস' তো যার উপর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তাকে অথবা তার অভিভাবককেই তা কার্যকর করার অধিকার দেওয়া হয়েছে কোন কোন শরীয়ত বিশেষজ্ঞের মতে। অবশ্য শরীয়তের রীতি অনুযায়ী ভালোভাবে তা কার্যকর করার যোগ্যতা থাকলে তবে। যেহেতু তাতেই তার ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত হতে পারে, এই কারণে তা ক্ষমা করার অথবা 'দীয়াত' পেয়ে বিনিময়ে রাযি হওয়ার অধিকার তার রয়েছে। কিন্তু 'হদ্দ' কার্যকর করে প্রতিশোধ গ্রহণ বা ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত করার কোন প্রশ্ন উঠে না। তদ্বারা সংশোধন ও সুবিচার বাস্তবায়নই চরম লক্ষ্য।

চতুর্থ ঃ 'হদ্দ' কারোর মামলা দায়ের করার উপর নির্ভরশীল নয়। কেননা তা তো আল্লাহ্র হক্। তবে 'কযফ' ও চুরির ব্যাপারে শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে তা ভিন্নতর। 'কিসাস' পর্যায়ের অপরাধের ক্ষেত্রে প্রাথমিক জানান দেওয়া ও মামলা দায়ের করার প্রয়োজন।

পঞ্চম ঃ 'হদ্দ'সমূহে বিনিময় গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। কেননা তা আল্লাহ্র হক্। সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ

يَا رَسُوْلَ اللهِ اُقْضِ بِكِتَابِ اللهِ

হে রাসূল ! আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী বিচার করুন।

এই সময় তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল ঃ

হ্যাঁ হে রাসূল ! লোকটি সত্য বলেছে। আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী তার মামলার বিচার করুন। আমার পুত্র এই ব্যক্তির নিকট মজুর হিসাবে কাজে নিযুক্ত ছিল। পরে সে তার স্ত্রীর সহিত যিনা করে। লোকেরা আমাকে জানিয়েছে যে, আমার পুত্রের 'রজম' হবে। আমি তার বদলে ক্ষতিপূরণ বাবদ একশ'টি ছাগল ও একটি বাচ্চা তাকে দিয়েছি। পরে আমি শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের নিকট জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা মত দিয়েছেন যে, আমার পুত্রের শাস্তি হচ্ছে একশ'টি দোর্‌রা ও এক বৎসর কালের জন্য নির্বাসন। এই কথা শুনে নবী করীম (সা) বললেন ঃ

www.pathagar.com

وَ الَّذِيْنَ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ اِمَّا لْغَنَمُ وَ الْوَالِيْدَةُ فَـرَدٌّس عَلَيْـكَ وَ عَلَى اِبْنِكَ جِلْدُ مِائَةٌ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ

যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তার নামে কসম, আমি তোমাদের মামলার বিচার অবশ্যই আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী করব। ছাগল ও বাচ্চা তোমাকে ফেরত দেওয়া গেল। আর তোমার পুত্রের শাস্তি হচ্ছে একশ'টি দোর্‌রা ও এক বৎসর নির্বাসন।

অতপর উনাইসকে লক্ষ্য করে নবী করীম (সা) বললেন ঃ

'হে উনাইস, তুমি কাল সকালেই এই স্ত্রীলোকটির নিকট যাও। সে যদি যিনা করার কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে 'রজম' করবে।

পরের দিন সকালেই উনাইস মেয়েলোকটির নিকট জিজ্ঞাসা করলে সে অপরাধ স্বীকার করে। ফলে রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশ মত তাকে 'রজম' করা হয়।[১] এই ঘটনা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'হদ্দ' কার্যকর করা না-না করার ব্যাপারে পাস্পরিক সম্মতি-অসম্মতির কোন অবকাশই নেই। অর্থ-সম্পদ গ্রহণের বিনিময়ে তা রহিত করারও অধিকার নেই কারোর। উপরোক্ত ঘটনায় দেখা যায় যে, যিনার ব্যাপারে বিনিময় গ্রহণের ভিত্তিতে দাবি পরিহার প্রস্তাব ও উদ্যোগকে রাসূলে করীম (সা) প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং যথাযথভাবে 'হদ্দ' কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তৃতীয় প্রকার হচ্ছে তা'যীর পর্যায়ের অপরাধ। শরীয়ত যেসব অপরাধের শাস্তি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেনি, তা-ই এই পর্যায়ে গণ্য। এক্ষেত্রে ইজতিহাদের মাধ্যমে অপরাধ প্রতিরোধ সক্ষম যে-কোন শাস্তি নির্ধারণের অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানকে দেয়া হয়েছে। কেননা অপরাধের মাত্রা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন হওয়ার কারণে তার শাস্তিও সেই হিসাবে বিভিন্ন হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। তাই এই পর্যায়ের অপরাধের শাস্তি পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করে দেয়া অনুচিত বিবেচিত হয়েছে।

'হদ্দ' ও 'তা'যীর'-এর মধ্যে পার্থক্য

উপরোদ্ধৃত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তা'যীর এক হিসাবে 'হদ্দ'-এর সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন। 'তা'যীর' উপযুক্ত শিক্ষাদান, চরিত্র সংশোধন এবং অপরাধ রোধকারী ব্যবস্থা। অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রার পার্থক্যের কারণে তা অবশ্যই বিভিন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু কয়েকটি দিক দিয়ে তা 'হদ্দ'-এর বিপরীতও। তার কয়েকটি **উল্লেখযোগ্য দিক এই ঃ**

প্রথম ঃ লোকদের পার্থক্যানুপাতে তা'যীরও বিভিন্ন হয়ে থাকে। মানসিক প্রস্তুতিও সতর্কতা সম্পন্ন লোকদের সুশিক্ষাদান কুৎসাকারী ও নির্বোধ লোকদের শিক্ষাদানের তুলনায় অনেক সহজ।

---

১. الاحكام السلطانيه للماوردى ص ١٣٧ سنن ابى داؤد ج ٢ ص ٦٣٧

www.pathagar.com

এই কারণে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ اِلاَّ الْحُدُوْدِ –

প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের পদস্খলনে শাস্তির মাত্রা কম কর। তবে 'হদ্দ' এর ব্যাপারে কোন রিয়াত থাকতে পারে না।

স্পষ্ট যে, 'হদ্দ'-এর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তা সব মানুষের ক্ষেত্রেই পুরাপুরি ও যথাযথ কার্যকর করা কর্তব্য।

দ্বিতীয় ঃ 'তা'যীর' যদি আল্লাহ্‌র হক্‌সমূহের মধ্যে কোন একটি হক্‌ের ব্যাপারে হয়, তা'হলে তা অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু তা ক্ষমা করা যদি সার্বিক দৃষ্টিতে অধিক মঙ্গলজনক বিবেচিত হয়, তা'হলে তা জায়েয হবে এবং সেজন্য সুপারিশও করা যাবে।

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اِشْفَعُوْا اِلَىَّ لِتُؤْجَرُوْا وَ لِيَقْضِ اللهُ عَلى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا يَشَاءُ

(سبل السلام ج ٤ – ص – ٢٨)

তোমরা আমার নিকট সুপারিশ কর, তাতে তোমরা সওয়াব পারে। আর আল্লাহ্ তাঁর নবীর যবানীতে যা ইচ্ছা বিচার করিয়ে নিবেন।

আর তা'যীর যদি কোন ব্যক্তির অধিকারের ব্যাপারে হয়, তা'হলে সেই ব্যক্তির ক্ষমা করে দেয়ারও অধিকার আছে। কিন্তু 'হদ্দ' পর্যায়ের অপরাধে তা প্রত্যাহার করার অধিকার কারোর নেই। তাতে কোনরূপ সুপারিশ করারও অনুমতি দেয়া হয়নি যদি তার মামলা রাষ্ট্রপ্রধানের—অর্থাৎ বিচার বিভাগের নিকট পেশ করা হয়ে থাকে। তবে কোন কোন শরীয়ত অভিজ্ঞের মতে যদি 'যিনার' মিথ্যা অভিযোগের 'হদ্দ' হয়, তা'হলে তাতে সুপারিশ করার অবকাশ থাকে।[১]

তৃতীয় ঃ অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হলে 'হদ্দ'ও মওকুফ হয়ে যাবে। কেননা নবী করীম (সা) তাই বলেছেন। কিন্তু তা'যীরের দণ্ড অপরাধ প্রমাণে সন্দেহ সৃষ্টি হলেও কার্যকর করা যাবে।

চতুর্থ ঃ তা'যীরের দণ্ড অল্প বয়স্ক বালক ও সেই পাগলের উপরও কার্যকর করা যাবে, যর সামান্যও হুঁশ-জ্ঞান আছে অর্থাৎ যে পুরাপুরি পাগল নয়। কেননা তা'যীরের লক্ষ্য হচ্ছে আদব-কায়দা শিক্ষা দান। আর এদের আদব-কায়দা শিক্ষাদানের জন্য যে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কোন নিষেধ নেই। কিন্তু 'হদ্দ' কার্যকর করা যাবে কেবলমাত্র পূর্ণবয়স্ক সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির উপর।

---

১. الاشباه و الظائر للسيوطى ص ١٣٧

www.pathagar.com

শাস্তিদানের চূড়ান্ত লক্ষ্য

আল্লাহ্ তা'আলা অপরাধের শাস্তিদানের চূড়ান্ত বিধান করেছেন অপরাধ প্রবণতা, হীনতা-নীচতা ও দুষ্কৃতি প্রতিরোধ, সমাজকে সকল প্রকার বিপর্যয় গুনাহ্-নাফরমানী থেকে রক্ষা এবং মানুষের মৌলিক কল্যাণে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ সকল কালের সকল শরীয়ত যে পাঁচটি বিষয়ের সংরক্ষণে সম্পূর্ণ একমত, ইসলামী শরীয়তেরও লক্ষ্য সেই পাঁচটি জিনিসের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান। সে পাঁচটি বিষয় হচ্ছে, দীন সংরক্ষণ, বংশ সংরক্ষণ, বিবেক-বুদ্ধি সংরক্ষণ, ধন-মাল সংরক্ষণ ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণ। এই পাঁচটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজনরূপেও চিহ্নিত। কেননা এই কয়টি বিষয়ের যথাযথ বর্তমানতা ছাড়া মানুষের জীবন ও কল্যাণ অচিন্তনীয়। এই কয়টি বিষয় যাতে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকে, এর কোন একটি ক্ষেত্রেও সীমালংঘন না হয়—যে তার সীমালংঘন করতে উদ্যত হবে বা তা স্পর্শও করবে, কাউকে একবিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত করবে তাকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে—যে, ভবিষ্যতে আর এমন কাজ না করে। আল্লাহ্ তা'আলা এই পর্যায়ের অপরাধে শাস্তির বিধান করার লক্ষ্য হিসাবে এই প্রতিরোধক কারণেরই উল্লেখ করেছেন এবং উপযুক্ত ও কার্যকর প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়েছেন। যিনার 'হদ্দ' নির্দিষ্ট করা হয়েছে মানুষের বংশ বিকৃত বা বিনষ্ট করার পদক্ষেপ থেকে মানুষকে বিরত রাখার লক্ষ্যে, চুরি ও ডাকাতি অপরাধের শাস্তি বিধান করা হয়েছে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে। মানুষের মান-সম্মান ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণের জন্য কযফের 'হদ্দ' ঘোষিত হয়েছে এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা রক্ষার লক্ষ্যে মদ্যপান অপরাধেরও শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইমাম গাযালীর ভাষ্য

'কল্যাণ আহরণ ও ক্ষতি প্রতিরোধই গোটা সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য। সৃষ্টিকর্মের কল্যাণ নিহিত রয়েছে তার উদ্দেশ্য পরিপূরণ ও বাস্তবায়নে। কিন্তু আমরা 'কল্যাণ' বলতে বুঝি শরীয়তের উদ্দেশ্য সংরক্ষণ। আর সৃষ্টিকর্মে শরীয়তের লক্ষ্য হচ্ছে পাঁচটি ঃ মানুষের দীন রক্ষা, তাদর জান-প্রাণ রক্ষা, তাদের বিবেক-বুদ্ধি রক্ষা, তাদের বংশ ও ধন-মাল রক্ষা। অতএব এই পাঁচটি বিষয়ের সংরক্ষণে যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হবে, তাই হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণ। আর এই পাঁচটি মৌল জিনিস যে কারণেই বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাই হচ্ছে বিপর্যয়কারী। এই বিপর্যয় রোধ করা কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। এই পাঁচটি মৌল বিষয়ের সংরক্ষণ প্রয়োজন পর্যায়ের বাস্তবতা। কল্যাণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিকতর শক্তিশালী হচ্ছে এই পাঁচটি। তার দৃষ্টান্ত, পথ ভ্রষ্টকারী কাফিরকে হত্যা করা শরীয়তের বিচারের ফয়সালা। 'বিদ'আত' প্রচলনের আহ্বানকারী বিদ'আতপন্থীকে শাস্তি দান-ও অনুরূপ। কেননা কুফরী ও বিদ'আত মানুষের দীন বিনষ্টকারী। এ জন্য কিসাস ফরয করা হয়েছে। এই কিসাস কার্যকর করা হলেই মানুষ ধর্মীয় দিক দিয়ে পুরাপুরি সংরক্ষিত

www.pathagar.com

হতে পারে। মদ্যপান অপরাধের শাস্তিস্বরূপ 'হদ্দ' বিধি-বদ্ধ করা হয়েছে। কেননা যে বিবেক-বুদ্ধি শরীয়ত পালনের বাধ্যবাধকতার ভিত্তি, তা রক্ষার জন্য এই 'হদ্দ' অপরিহার্য, 'যিনার' 'হদ্দ' ফরয করা হয়েছে মানুষের বংশধারা ও জন্মের বৈধতা-পবিত্রতা রক্ষা এছাড়া সম্ভব নয়। অপহরণকারী ডাকাত ও চোরের জন্যও শাস্তি নির্ধারিত। কেননা মানুষের ধন-মাল জীবিকার মৌল উৎস। তার সংরক্ষণের জন্য এই শাস্তি অপরিহার্য। মানুষ জীবনকাল ব্যাপীই ধন-মালের মুখাপেক্ষী, তার উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। এই পাঁচটি বিষয়ের ধ্বংস সাধন হারাম করা হয়েছে। তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা তা অসম্ভব বা কঠিন করে তোলে। যেসব শরীয়তের লক্ষ্য মানবতার সার্বিক কল্যাণ, উপরোক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থায় তার প্রত্যেকটি শরীক ও অভিন্ন। আর এই কারণেই তাতে কুফর, মানুষ হত্যা, ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি ও মাদক দ্রব্য পান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

ইসলামের দণ্ড বিধান রহমত বিশেষ

ইসলামে অপরাধের যে শাস্তি বিধান করা হয়েছে, তা বস্তুতই বিশ্ব মানবতার প্রতি অসীম-অশেষ রহমতের প্রতীক। ইসলামের সিরাতুল মুস্তাকীম বর্জনকারীর জন্য এই শাস্তি একান্তই জরুরীরূপে নির্ধারিত। যদি এই ব্যবস্থা করা না হতো, তাহলে অপরাধীরা শরীয়তের সীমালংঘনকারী ফাসিক-ফাযির লোকেরা ভয়ানকভাবে দঃসাহসী হয়ে উঠত। কেননা এই লোকদের মনে ঈমান স্থান লাভ করেনি। নির্লজ্জতা ও পাপকার্য সম্পাদন ও হারাম করা জিনিসগুলির মর্যাদা বিনষ্টকরণ থেকে তাদের বিরত রাখার মত কোন শক্তিই তাদের ভিতরে বর্তমান নেই। এমতাবস্থায় অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে তারা তো পৃথিবীতে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করত। মানুষ পরস্পরকে ধ্বংস করত, বিশ্ব ব্যবস্থা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দিত। তখন দুনিয়ার পশু ও জন্তু-জানোয়ারের তুলনায়ও অধিক খারাপ হয়ে পড়ত মানুষের অবস্থা। এই কথার সত্যতা স্বাভাবিকভাবেই সর্বজনজ্ঞাত ও স্বীকৃত।

আল্লাহ্ তা'আলা যেসব শাস্তি বিধিবদ্ধ করেছেন এবং বিভিন্ন অপরাধের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, বাহ্যত তাতে যদিও অপরাধীকে কষ্টদান করা হয় ; কিন্তু আসলে কষ্ট বা পীড়াদানই তার প্রকৃত বা চরম লক্ষ্য নয়। আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই শাস্তি কার্যকরকরণের ফলে ইসলামী সমাজে যে সার্বিক কল্যাণ বাস্তবায়িত হয় তা। এই কল্যাণের বড় দিক হচ্ছে অন্যায় যুলুম ও বিপর্যয়ের বিস্তার ও ব্যাপকতা প্রতিরোধ এবং আল্লাহ্র হারাম ঘোষিত জিনিসগুলির মর্যাদা বিনষ্ট করার প্রবণতার নির্মূল সাধন। কারোর প্রতি নির্মমতা প্রদর্শন বা কারোর উপর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কিন্তু তার লক্ষ্য নয় আদৌ। বস্তুত এই শাস্তি হচ্ছে রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ঔষধি। জীবন রক্ষার জন্য যেমন পচে যাওয়া অঙ্গ কেটে ফেলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এ-ও ঠিক তেমনি।

www.pathagar.com

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন ঃ[১]

وَ الْعُقُوْبَةُ اِنَّمَا شَرِعَتْ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ بِعِبَادِهِ فَهِيَ صَادِرَةٌ عَنْ رَحْمَةِ الْخَلْقِ وَ اِرَادَةِ الاِحْسَانِ اِلَيْهِمْ وَ الرَّحْمَةِ لَهُمْ كَمَا يَقْصِدُ الْوَالِدُ تَأْدِيْبَ وَلَدِهِ وَ كَمَا يَقْصِدُ الطَّبِيْبُ مُعَالِجَةَ الْمَرِيْضِ

শাস্তি বিধিবদ্ধ হয়েছে আল্লাহর দিক থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি অসীম রহমত স্বরূপ। তা সৃষ্টিলোক—মানুষের প্রতি দয়া-অনুকম্পা, তাদের কল্যাণ সাধন ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ হিসাবেই উৎসারিত। ঠিক যেমন পিতা তার সন্তানকে সুশিক্ষাদানের লক্ষ্যে কিছুটা শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং ঠিক যেমন চিকিৎসক তার চিকিৎসাধীন রোগীর পূর্ণ নিরাময় চায়, এ-ও ঠিক তেমনি।

আল্লামা ইজ্জ-ইবনে আবদুস সালাম এই পর্যায়ে লিখেছেন ঃ[২]

وَ رُبَّمَا كَانَتْ اَسْبَابُ الْمَصَالِحِ مَفَاسِدُ فَيُؤْمَرُبِهَا اَوْ تُبَاحُ لاَ لِكَوْنِهِ مَفَاسِدَ بَلْ لِكَوْنِهَا مُؤَدِّيَةً اِلَى الْمَصَالِحِ وَ ذَالِكَ كَقَطْعِ الاَيْدِيْ الْمُتَأْكِلَةِ حِفْظًا لِلاَرْوَاحِ وَ كَالْمُخَاطِرَةِ بِالاَرْوَاحِ فِي الْجِهَادِ وَ كَذَالِكَ الْعُقُوْبَاتُ الشَّرْعِيَّةُ كُلُّهَا لَيْسَتْ مَطْلُوْبَةً لِكَوْنِهَا مَفَاسِدَ بَلْ لِكَوْنِ الْمُصْلِحَةِ هِيَ الْمَقْصُوْدِ مِنْ شَرْعِهَا كَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ وَ قَتْلِ الْجِنَاتِ وَ رَجْمِ الزَّنَاةِ وَ جَلْدِهِمْ وَ تَغْرِيْبِهِمْ وَ كَذَالِكَ التَّعْزِيْرَاتِ كُلُّهَا اَوْجَبَهَا الشَّارِعُ لِتَحْصِيْلِ مَا رُتِّبَ عَلَيْهَا مِنَ الْمَصَالِحِ الْحَقِيْقِيَّةِ وَ تَسْمِيَتُهَا بِالْمَصَالِحِ مِنْ قَبِيْلِ الْمَجَازِ بِتَسْمِيَةِ السَّبَبِ بِاسْمِ الْمُسَبَّبِ ه

অনেক সময় কল্যাণের কারণসমূহ বিপর্যয়কারী হয়ে থাকে। তখন তা করারই আদেশ করা হয় ; কিংবা তা করা মুবাহ করে দেয়া হয়—এজন্য নয় যে, তা বিপর্যয়কারী ; বরং এজন্য যে, তা কল্যাণ লাভের উপায় বা মাধ্যম। যেমন জীবন রক্ষার লক্ষ্যে পচে যাওয়া হাত কেটে ফেলতে হয় এবং যেমন জিহাদে জীবনকে কঠিন বিপদের ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করতে হয়। শরীয়ত প্রবর্তিত শাস্তিগুলিও ঠিক এই প্রকৃতির। তার কোনটিই আসল কাম্য নয়—কাম্য নয় এজন্য যে, তা বিপর্যয়কারী ; বরং কল্যাণই হচ্ছে তা বিধিবদ্ধকরণের মূল লক্ষ্য। যেমন চোরের হাত কাটা, সাপকে মেরে ফেলা, ব্যভিচারীকে রজম করা বা দোররা মারা এবং তাদের নির্বাসিত করা। তা'যীরসমূহও এই পর্যায়ের। শরীয়তদাতা তা বিধিবদ্ধ করেছেন তার ভিত্তিতে সম্ভাব্য প্রকৃত কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে। আর তাকে কল্যাণ নামকরণটাও অ-প্রকৃতভাবে, কার্যের নামে কারণের নামকরণের মতই।

১. اختيارات ان تيميه ص ٢٨٨

২. القواعد الكبرى ج ١ ص – ١٢ فلسفة العقوبة الفقه الاسلامى

www.pathagar.com

শাস্তি যার হয়, তার জন্য তা কাফ্ফারা

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধের যে-শাস্তি দেয়া হয়, তা অপরাধীকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করে, তার গুনাহ্ ধুয়ে-মুছে ফেলে এবং তাকে পরকালীন আযাব থেকে রক্ষা করে।

ইমাম বুখারী তাঁর হাদীসগ্রন্থে একটি শিরোনাম দিয়েছেন ঃ

بابُ الْحُدُوْدِ كُفَّارَةٌ لِّمَنْ اُقِيْمَتْ عَلَيْهِ

'হদ্দ' যার উপর কার্যকর হয়, তার জন্য তা কাফ্ফারার কাজ করে—এই সংক্রান্ত হাদীসের অধ্যায়।

এই অধ্যায়েরই একটি হাদীস হযরত ইবাদাহ্ ইবনুস্ সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা একদা রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট এক বৈঠকে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ 'তোমরা আমার নিকট 'বায়'আত কর এই কথায় যে, তোমরা আল্লাহ্র সহিত এক বিন্দু শিরক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, তোমরা ব্যভিচার করবে না—এই আয়াতটি সম্পূর্ণ পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের যে লোকই এই 'বায়'আত পূর্ণ কার্যকর করবে, তার শুভ প্রতিফল দেয়া আল্লাহ্র দায়িত্ব। আর যে লোক এর কোন একটা লংঘন করবে এবং সেজন্য সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, তার জন্য এই শাস্তি কাফ্ফারাস্বরূপ হবে।[১] আর যদি কেউ এর কোন দিক লংঘন করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা গোপন করে রাখেন, তা'হলে তার এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন, আর ইচ্ছা করলে সে জন্য আযাব দিবেন।'[২]

হযরত আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর এই কথাটি বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ اَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوْبَتَهُ فِى الدُّنْيَا فَاللّٰهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ يُّثْنِىَ عَلٰى عَبْدِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الاٰخِرَةِ وَ مَنْ اَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَفَا عَنْهُ فَاللّٰهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَّعُوْدَنِىْ شَىْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ –

যে লোক 'হদ্দ' হওয়ার কোন অপরাধ করল, পরে দুনিয়ায়ই তার শাস্তি কার্যকর হলো, আল্লাহ্ পরকালেও দ্বিতীয়বার তাঁর বান্দাকে আযাব দিবেন—তার চাইতে অনেক বেশি সুবিচারক তিনি। আর যে লোক 'হদ্দ' হওয়ার মত কোন অপরাধ করলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা গোপন করে রাখলেন, তাকে তা ক্ষমা করে দিলেন, ফলে এই ক্ষমা করা অপরাধের শাস্তির পুনরাবৃত্তি করবে—তার চাইতে তিনি অনেক বেশি মেহেরবান।[৩]

---

১. কাফ্ফারা হওয়ার অর্থ, এই শাস্তি ভোগের কারণে আল্লাহ্র নিকট তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। পরকালে সেজন্য কোন আযাব ভোগ করতে হবে না।

২. فتح البارى ج ١٢ ص ٨٤

৩. جامع الاصول ج ٤ ص ٣٤٩ ز ترمذى

www.pathagar.com

মায়েয ও গামেদীয়ার ঘটনার ভিত্তিতে কোন কোন মুসলিম মনীষী উপরোক্ত মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ভয় এবং দুনিয়ার আযাব পরকালীন আযাবের তুলনায় অনেক হাল্‌কা ও সহজ—এই বিবেচনার কারণে যিনার অপরাধ করে নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাদের উপর 'হদ্দ' কার্যকর করা হোক বলে দাবি জানিয়েছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, মায়েয আসলামী রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে যিনা করার অপরাধ চারবার স্বীকার করেন। প্রত্যেকবারই তিনি (নবী করীম) মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নেন। পঞ্চমবারে তিনি তার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ঠিক যেমন কলম কালির দোয়াতে প্রবেশ করেন, বালতির রশি যেমন করে কূপের মধ্যে নেমে যায় ঠিক সেই রকমেরই ঘটনা ঘটেছে কি ? মায়েয বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যিনা কাকে বলে তা তুমি বোঝ কি ? বললেন, হ্যাঁ, আমি তা করেছি হারামভাবে, যেমন অন্য লোকেরা নিজ স্ত্রীর সাথে করে হালালভাবে ! জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি এই খবর দিচ্ছ কেন, কি চাও ? বললেন, আমি চাই, আমাকে এই নাপাকি থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা হোক।' অতঃপর তাকে 'রজম' করা হয়। তখন নবী করীম (সা) নিজে শুনতে পেলেন, তাঁর দুইজন সাহাবী বলাবলি করছেন ; এই লোকটির তামাসা দেখ, আল্লাহ্ তো তার পাপ গোপন রেখেছিলেন ; কিন্তু সে নিজেকে ক্ষমা করল না, রজম করা হলো, যেমন 'রজম' করা হয় কুত্তাকে। তখন রাসূলে করীম (সা) নির্বাক থাকলেন, পরে একটি গাধার পা উঠানো লাশ দেখতে পেয়ে বললেন, সেই লোক দুইজন কোথায় ? তাঁরা বললেন, আমরাই সেই দুইজন লোক। বললেন ; 'তোমরা এই গাধার লাশ ভক্ষণ কর, যাও।' তাঁরা বললেন, 'হে রাসূল ! গাধার লাশ কে খাবে ?' বললেন, 'তা'হলে তোমরা দুইজন কিছুক্ষণ পূর্বে যে তোমাদের ভাইয়ের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করলে, তা তো মরা গাধার গোশ্‌ত খাওয়া থেকেও নিকৃষ্ট। অতঃপর তিনি বললেন ঃ

وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهُ الاٰنَ كَفِىْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيْهَا –

سنن ابى داؤد ج ٢ ص ٤٥٩

আল্লাহ্‌র কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, সে (মায়েয) তখন নিশ্চয়ই জান্নাতের ঝর্ণায় সাঁতার কাটছে।

এই হাদীস স্পষ্ট-অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলাম অপরাধীকে প্রতি হিংসা বা শত্রুতা পোষণ করে না। তাদের প্রতি কল্যাণ কামনার কারণেই শাস্তি কার্যকর করা হয়, কোন প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নয়। অপরাধীদের বরং অত্যন্ত দয়া-অনুগ্রহ ও প্রীতির চক্ষে দেখা হয় তাদের প্রতি শরীয়তসম্মত শাস্তি কার্যকর করার পরও। কেননা যায় উপর শাস্তি কার্যকর করা হয়, সে নিজেও সন্তুষ্ট-আত্মনিবেদিত চিত্ত থাকে। সমাজের প্রতি তার মনেও জাগে না কোন আক্রোশ। কেননা সে নিশ্চিত জানে, এই

www.pathagar.com

শাস্তিটা কারোর মনগড়া নয়, তা রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহ্‌রই শরীয়ত। আর মানব রচিত আইনের বিচার ও ইসলামী শরীয়তের বিচারের মধ্যে এটাই বড় পার্থক্য। মানব রচিত আইনের বিচারে দণ্ডিত ব্যক্তির মনে তীব্র প্রতিহিংসা জাগে সমাজ সমষ্টির প্রতি, যার কারণে সে বিচারের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছে তার প্রতি।

'হদ্দ' কার্যকর হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য

যে অপরাধের 'হদ্দ' রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়ার পর অপরাধীর উপর তা অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। সে শক্তিমান হোক, কি দুর্বল, উঁচু বংশজাত—সম্ভ্রান্ত হোক, কি নীচ জাত অসম্ভ্রান্ত এবং পুরুষ হোক, কি নারী। এই ব্যাপারে কোনরূপ দুর্বলতা দেখানো বা তা বিলম্বিতকরণ অথবা আল্লাহ্‌র আইন কার্যকরকরণে কোনরূপ দয়া নম্রতার কারণে 'হদ্দ' প্রত্যাহার করার অধিকার কারোর নেই। কেননা 'হদ্দ' কার্যকর করা ইবাদতের মধ্যে গণ্য কাজ। আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহও বটে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

حَدٌّ يَعْمَلُ بِهِ فِى الاَرْضِ خَيْرٌ لاَهْلِ الاَرْضِ مِنْ اَنْ يُمْطَرُوْا اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا

(ابن ماجة نساء)

যে দেশে শরীয়তের 'হদ্দ' কার্যকর হয়, সে দেশের জনগণের জন্য তা ক্রমাগত চল্লিশ দিনের সকাল বেলায় বৃষ্টির[১] তুলনায় অনেক কল্যাণকর।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

مَا خَيَّرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اخْتَارَ اَيْسَرَهُمْ مَا لَمْ يَاْثِمْ فَاِذَا كَانَ الاِثْمُ كَانَ اَبْعَدَهُمَا مِنْهُ وَ اللهِ مَانْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِىْ شَىْءٍ يُؤْتَى اِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تَنْتَهِكَ حُرُمَاتِ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ ٥ (بخارى – فتح البارى ج ١٢ ص ٨٦)

নবী করীম (সা)-কে যখনই কোন দুইটি ব্যাপারের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তিনি তন্মধ্যে সহজতম জিনিসটি গ্রহণ করেছেন যদি তাতে গুনাহ্ হওয়ার আশংকা না থাকে। যদি সেটিতে গুনাহ্ হওয়ার আশংকা দেখা দিত, তাহলে তা থেকে অনেক দূরে সরে থাকতেন। আল্লাহ্‌র নামের শপথ, রাসূলে করীম (সা) নিজের জন্য কোন বিষয়েরই প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি, যা তাঁর সম্মুখবর্তী হয়েছে। তবে আল্লাহ্‌র মর্যাদা বিনষ্টকারী কিছু হলে তিনি তার প্রতিশোধ অবশ্যই নিয়েছেন।

---

১. সকাল বেলার বৃষ্টিপাত ফসল উৎপাদন ও শস্য-শ্যামল হওয়ার দিক দিয়ে সাধারণভাবেই কল্যাণকর। তবে শরীয়তের 'হদ্দ' কার্যকর হওয়া তার চাইতেও বেশি ব্যাপক রহমত বিস্তারকারী।

www.pathagar.com

হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) নবী করীম (সা)-এর এই কথাটি বর্ণনা করেছেন ঃ

مَثَلُ الْقَائِمِ فِىْ حُدُوْدِ اللهِ وَ الْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ اَعْلاَهَا وَ بَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِيْنَ فِىْ اَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالُوْا : لَوْ اَنَّا خَرَقْنَا فِىْ نَصِيْبِنَا خَرَقًا وَ لَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَاِنْ تَرَكُوْهُمْ وَ مَا اَرَدُوْا هَلَكُوْا وَ اِنْ اَخَذُوْا عَلَى اَيْدِيْهِمْ نَجُوْا وَ نَجَوْا جَمِيْعًا ه (بخارى ترمذى)

আল্লাহ্‌র চিহ্নিত সীমার মধ্যে স্থিতিশীল এবং সীমালংঘনকারীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন কিছু লোকের মত। যারা একটি নৌকায় আরোহী হয়েছে। তাদের কিছু লোক উপর তলায় এবং অপর কিছু লোক নিচের তলায় অবস্থান নিল। যারা নিচের তলায় অবস্থান নিয়েছিল তারা পানির সন্ধানে উপরে উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে যাতায়াত শুরু করে দিল। তাতে উপরের লোকেরা বিরক্তি বোধ করল। তখন নিচে অবস্থানকারী লোকেরা বলল, আমরা যদি আমাদের অংশে নৌকার তলা দীর্ণ করে প্রয়োজনীয় পানি নেই, তাহলে উপরের লোকদের কষ্ট দেয়ার আর কোনই প্রয়োজন থাকবে না। এইরূপ অবস্থায় যদি তাদেরকে ছেড়ে দেয় ও তারা তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে থাকে, তাহলে তারা সকলেই ধ্বংস হবে আর তাদের যদি পাকড়াও করে তা থেকে বিরত রাখে, তাহলে তারা নিজেরাও বাঁচবে এবং অন্য সকলকেও বাঁচাবে।

এ হাদীসের আলোকে এ নীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শরীয়ত লংঘনকারীদের সীমার মধ্যে ঠেকিয়ে রাখা, তাদের বিদ্রোহ দমন করা ও পাপ-নাফরমানী প্রতিরোধ করা একান্তই আবশ্যক। অবশ্য পাপ-নাফরমানী যদি গোপন থাকে, তাহলে শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তা যদি ব্যাপক প্রকাশ লাভ করে ও তা প্রতিরোধ করা না হয়, তাহলে তা একটা সাধারণ ব্যাধি হয়ে দেখা দেয়। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَ اتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ه

তোমরা সেই বিপদকে অবশ্যই ভয় করবে, যা তোমাদের মধ্যকার শুধু জালিমদেরই বিপন্ন করবে না (বরং সাধারণভাবে সমস্ত মানুষই বিপন্ন হয়ে পড়বে।)

—সূরা আনফাল ঃ ২৫

বস্তুত আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করার ক্ষেত্রে তা মামলারূপে কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হওয়ার পর কোনরূপ শাফা'আত বা সুপারিশ করা এবং সেই সুপারিশ গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম বলে সমস্ত শরীয়ত বিশেষজ্ঞ একমত হয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

تَعَافُوْا الْحُدُ وَدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِىْ مِنْ حَدّ فَقَدْ وَجَبَ

(سنن ابى داؤد ج ٢ ص ٤٤٦)

তোমরা হদ্দ কার্যকর হওয়ার যোগ্য অপরাধ পারস্পরিক পর্যায়ে ক্ষমা করতে পার। কিন্তু এই ধরনের অপরাধের অভিযোগ আমার নিকট পেশ করা হলে তা অবশ্যই কার্যকব হবে।

কিন্তু এই আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) রাসূলে করীম (সা)-এর এই হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَ اللهُ فِىْ اَمْرِه (ابو داؤد)

আল্লাহ্ নির্ধারিত শাস্তিসমূহের মধ্যে কোন একটি শাস্তির পথে যদি কারোর সুপারিশ বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সে আল্লাহ্র বিধান কার্যকর হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।

হযরত উসমান (রা) বলেছেন ঃ

اِذَا بَلَغَتِ الْحُدُوْدُ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَ الْمُشَفَّعَ

'হদ্দ' যোগ্য অপরাধের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হওয়ার পর তাতে সুপারিশকারী ও যার জন্য সুপারিশ করা হয় উভয়ের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ।

মাখযুমীয়ার ব্যাপারে হযরত উসামা সুপারিশ করলে নবী করীম (সা) তা প্রত্যাখান করলেন। হযরত আশেয়া (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ মাখযুমীয়া নারীটি চুরি করে ধরা পড়লে কুয়ায়শরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো। রাসূলের নিকট এই ব্যাপারে কে সুপারিশ করবে তা নিয়ে আলোচনায় স্পষ্ট হলো যে, রাসূলের প্রিয় ব্যক্তি উসামা ছাড়া এই কাজ আর কারোর দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি এই ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা)-এর সাথে কথা বলায় তিনি ধমকের সুরে বললেন ঃ

اَتَشْفَعُ فِىْ حَدّ مِّنْ حُدُوْدِ اللهِ ؟

আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি কার্যকরকণের ব্যাপারে 'তুমি সুপারিশ করছ ?'

পরে তিনি ভাষণ দান প্রসঙ্গে বললেন ঃ

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ اِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَ اِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ اَيْمُ اللهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا (بخارى فتح البارى ج ١٢ ص ٨٧)

হে জনগণ ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এই নীতির অনুসারী ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে কোন ভদ্র ব্যক্তি চুরি করলে এমনিই তাকে নিষ্কৃতি দিত। আর কোন

www.pathagar.com

হীন, দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করত। (এই নীতি ন্যায়বাদ পরিপন্থী) আল্লাহ্‌র কসম ! মুহাম্মদ-তনয়া ফাতিমাও যদি চুরি করে, তাহলে মুহাম্মদ তার হাত অবশ্যই কেটে ফেলবে

হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া চাদরমুড়ি দিয়ে মসজিদে নববীতে ঘুমিয়েছিলেন। চোর এসে তাঁর চাদরখানি চুরি করে নিয়ে যায়। পরে সে ধরা পড়লে রাসূলে করীম (সা)-এর দরবারে নীত হয়। তিনি এই অপরাধে তার হাত কাটার হুকুম দেন। তখন সফওয়ান বললেন, ইয়া রাসূল ! আমি তো তা চাইনি। আমি চাদরখানি চোরকে দান করে দিলাম। তখন রাসূলে করীম (সা) বললেন ঃ

فَهَلاَّ قَبْلَ اَنْ تَأْتِيَنِىْ بِه (جامع الاصول ج ٤ ص ٣٤٤)

অপরাধীকে আমার নিকট পেশ করার পূর্বে তুমি কেন তাকে ক্ষমা করলে না ?

আল্লাহ্‌র বিধিবদ্ধ করা 'হদ্দ' কার্যকর করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে তা করে না, সে তো আল্লাহ্‌ ও রাসূলের সহিত লড়াই করে। কুরআন মজীদের আয়াতে এই কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে ঃ

فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُـمَّ لاَ يَجِـدُوْا فِـىْ اَنْفُسِـهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ٥ (النسأ ٦٥)

না, তোমার প্রভু—প্রতিপালকের কসম ! ওরা কেউই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না ওরা তোমাকে নিজেদের পারস্পরিক ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হিসাবে মেনে নেবে এবং পরে তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা পাবে না ও তোমার ফয়সালাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে মেনে নেবে।

হদ্দ কার্যকর করার জন্য দায়িত্বশীল কে ?

রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তার প্রতিনিধি স্থানীয় প্রশাসক ও বিচারপতিগণই শরীয়তের 'হদ্দ' কার্যকর করার জন্য দায়িত্বশীল। আসলে এই কাজটি আল্লাহ্‌র হক্। আদর্শবাদী সভ্য সমাজের জন্য তা বিধিবদ্ধ। অতএব সমাজের প্রতিনিধিই তা কার্যকর করার জন্য দায়িত্বশীল হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ 'হদ্দ' কার্যকর করার জন্য 'ইজতিহাদ' অপরিহার্য। আর তা কার্যকরকরণে অবিচার বা অসাম্য হয়ে যাওয়ার আশংকাও রয়েছে অনেক। তবে এই কাজটি রাষ্ট্রপ্রধানকে নিজেকেই করতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। রাসূলে করীম (সা) নিজে উনাইসকে জনৈকা বিবাহিতা মহিলাকে যিনার অপরাধে রজম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মায়েযকে 'রজম' করার জন্য অন্য লোককে হুকুম করেছিলেন। একজন চোরকে তাঁর দরবারে হাযির করা হলে তিনি বললেন ঃ

www.pathagar.com

إِذْهَبُوْا بِهِ فَاقْطَعُوْهُ – (الشرح المكبير ج ١٠ ص ١٢١)

তোমরা একে নিয়ে যাও এবং পরে তার হাত কেটে দাও।

তবে এ থেকে একটি মৌলনীতি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়ত সিদ্ধ 'হদ্দ' ও শাস্তিসমূহ কার্যকর করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি একান্তই প্রয়োজন। রাসূলে করীম (সা)-এর যুগে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া কখনই কোন 'হদ্দ' কার্যকর করা হয়নি। এই অনুমতি সাময়িকও হতে পারে যা প্রয়োজনে প্রতিটি ঘটনাকালে দেয়া হবে, অথবা এই অনুমতি স্থায়ী ভাবে দেয়া হবে। প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ সেই অনুমতির বলে স্থায়ীভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন, যার যার উপর তা কার্যকর করার প্রয়োজন হবে, তা যথারীতি কার্যকর করবেন।[১]

ইমাম কাশানী লিখেছেন ঃ

ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান শরীয়তের 'হদ্দ' কার্যকর করার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারবেন। কেননা এসব কাজ তিনি ব্যক্তিগতভাবে ও নিজ হাতে সম্পন্ন করতে পারেন না। যেহেতু তা কার্যকর করার বহু কারণ এবং সে কারণসমূহ দারুল-ইসলামের বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত। সবখানে তার নিজের গমন বা উপস্থিতি সম্ভব নয় বা সকলকে তার নিকট উপস্থিত করাও অসম্ভব। এমতাবস্থায় প্রতিনিধি নিয়োগ বৈধ না হলে শরীয়তের 'হদ্দ'সমূহ কার্যকর হওয়াই সম্ভব হবে না। এই কারণে খোদ নবী করীম (সা)-ও শরীয়তের আইন ও 'হদ্দ'সমূহ কার্যকর করার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন।

এই প্রতিনিধি নিয়োগ দুই ধরনের। একটি, নির্দিষ্টভাবে শুধু 'হদ্দ' কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দান, যার দরুন 'প্রতিনিধি' তা কার্যকর করার ক্ষমতাবান হবে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, দায়িত্বশীল বানানো। তা-ও আবার দু'প্রকারের। একটি সাধারণ এবং অপরটি বিশেষ। সাধারণ হয় এভাবে যে, এক ব্যক্তিকে সাধারণভাবে অধিকার সম্পন্ন বানিয়ে দেয়া হলো, যেমন কোন এলাকার বা বড় শহরের প্রশাসনিক দায়িত্বশীল (গভর্নর বা কমিশনার অথবা জিলা প্রশাসক ইত্যাদি) বানিয়ে দেয়া হলো। সে সেই এলাকায় যাবতীয় 'হদ্দ' কার্যকর করার কাজ সম্পন্ন করবে, যদিও নির্দিষ্টভাবে সেই ঘটনার জন্য কোন আদেশ আসেনি। কেননা তাকে যখন একটা বড় এলাকার প্রশাসনিক দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়া হয়েছে তখন সে এই কাজের জন্যও দায়িত্বশীল মনে করতে হবে। তাকে যখন এই প্রশাসনিক কর্তৃত্ব দেয়া হয় তখন মুসলিম জনগণের কল্যাণে প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ করার তার অধিকার আছে। আর শরীয়তের 'হদ্দ'সমূহ কার্যকর করা তাদের কল্যাণের একটা অতিবড় দিক।

---

১. التشريح الجنائى ٣ ص٤٤٤

www.pathagar.com

আর বিশেষভাবে দায়িত্বশীল বানানোর ব্যাপারটি হচ্ছে এইরূপ, যেমন কাউকে খারাজ সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়া হলো, ইত্যাদি। সে তো নিশ্চয়ই 'হদ্দ' কার্যকর করার অধিকারী হবে না। কেননা সে দায়িত্ব তাকে দেয়াই হয়নি অথবা বলা যায়, তাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, 'হদ্দ' কার্যকর করার কর্তৃত্ব তার অন্তর্ভুক্ত নয়।[১]

'হদ্দ' হওয়ার অপরাধ ও তার শাস্তি

১. যিনার অপরাধ

যিনা বা ব্যভিচার একটি অত্যন্ত জঘন্য, কুৎসিত ও বীভৎস অপরাধ। তা সমাজ সংস্থাকে কুরে কুরে খায়, পরিবারের ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন ভিন্ন করে। সমাজকে নৈতিক বিপর্যয়, পরিবারের ভাঙ্গন এবং চরম লাম্পট্য সৃষ্টি করে। বিবাহ বা পারিবারিক বন্ধনের দিকে নারী-পুরুষের মধ্যে তীব্র অনীহার সঞ্চার করে। তা ব্যাপক হ'লে সমাজের যুবক-যুবতীরা শরীয়তসম্মত বিবাহে জড়িত না হয়ে পশুকুলের ন্যায় চরম পাশবিক যৌনতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। যে লোক এই কাজের অত্যন্ত খারাপ পরিণতির লক্ষণ বুঝতে পারবে, তার মানবীয় মর্যাদা বিধ্বংসী ভূমিকা অনুধাবন করবে, তার দরুণ বংশধারা বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলে ও সন্তান বিনষ্ট হয়ে বলে বুঝতে পারে, সে-ই সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারবে তা আল্লাহ্ কর্তৃক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়ার মূলে নিহিত গভীর তত্ত্ব এবং সেজন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করার অকাট্য যৌক্তিকতা।

আধুনিক ইউরোপের অবস্থা ইসলামী শরীয়তের ভূমিকার যথার্থতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। ইউরোপীয় সমাজ আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সে সমাজের ঐক্য মেরুদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ। সামষ্টিক প্রাণ-শক্তি স্তব্ধ, আর তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, নির্লজ্জতা ও নৈতিক বিপর্যয়ের চরম ব্যাপকতা। সেখানে যৌন স্বাদ আস্বাদনে কোন সীমা বা নৈতিক বিধি-নিষেধের একবিন্দু পরোয়া করা হয় না। আর তারই ফলে যিনা-ব্যভিচার সেখানে অত্যন্ত ব্যাপক। ব্যক্তি এই দিক দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে সেখানে। যিনা-ব্যভিচার সে সমাজে নিতান্ত ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার রূপে গণ্য সমাজ-সমষ্টির পক্ষে এই ব্যাপারে কিছুই বলার থাকতে পারে না, নেই কোন অনুশাসন কার্যকর করার অধিকার।[২]

এই কারণে সমস্ত আসমানী শরীয়তই সম্পূর্ণ অভিন্নভাবে যিনা-ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করেছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এর বীভৎস কদর্যতা ও মারাত্মক রূপকে অত্যন্ত প্রকট করে তুলেছে, তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছে এবং সে পর্যায়ে অতিশয় তীব্র নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছে। তার নিকটে যেতেও কঠিন ভাষায় নিষেধ করেছে, তার আশেপাশে ঘোরাফিরা করা ও তার মধ্যে পড়ে যাওয়ার নিজেদের সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সর্বতোভাবে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছে। তা কার্যত করা তো মু'মিনের জন্য সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।

---

১. بدائع الصنائع ٩ ص ٤٢٠٦

২. التشريع الجنائى ٢ ص ٣٤٧

www.pathagar.com

ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ لاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا ط اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيْلاً ٥

তোমরা যিনার কাছেও যেয়ো না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও খুব বেশি খারাপ উপায়। —সূরা ইসরা ঃ ৩২

'কাছেও যেয়ো না' অর্থ যিনার প্রাক্কালীন কার্যাবলী এবং যিনা সহজ ও সম্ভব করে যে কার্যাবলী, তা-ও হতে দিও না, তোমরা নিজেও তা করো না।

ইসলামে তার ঘৃণ্যতা ও নিষিদ্ধতা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে এ আয়াতে ঃ

وَ الَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلهًا اخَرَ وَ لاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِـالْحَقِّ وَ لاَ يَزْنُوْنَ ٥

(আল্লাহ্‌র নেক বান্দা তারাও) যারা আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন ইলাহ্‌কে শরীক করে না, সেই প্রাণ হত্যা করে না, যা হত্যা করাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন— আইনের সত্যতার জন্য করতে হলে তা ভিন্ন কথা এবং যারা যিনা করে না।

—সূরা ফুরকান ঃ ৬৮

এ আয়াতে শিরক, বিনা কারণে নরহত্যা ও যিনাকে একই পর্যায়ের অত্যন্ত জঘন্য পাপ কাজরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র বান্দারা এই কাজ-গুলির মধ্যে কোন একটিও করতে পারে না। করলে সে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দারূপে গণ্যই হতে পারে না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেছেন ঃ

لاَ اَعْلَمُ بَعْدَ قَتْلِ النَّفْسِ شَيْأً اَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا

নরহত্যার পর যিনার তুলনায় অধিক বড় গুনাহ্‌র কাজ আর কোনটি আছে বলে আমি জানি না।

যিনায় ইসলামী শাস্তি অভিনব নয়

ইসলামে বিবাহিত নর-নারীর যিনা অপরাধের শাস্তি হচ্ছে 'রজম'—প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা। কিন্তু এই শাস্তি ইসলামের নবপ্রবর্তিত কিছু নয় ; বরং 'তওরাত' গ্রন্থেও এই শাস্তিই লিপিবদ্ধ ছিল, যদিও ইয়াহুদীরা আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানের একটা অংশ বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত ঃ কতিপয় ইয়াহুদী রাসূলে করীমের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারীর যিনা করার অপরাধের শাস্তির কথা জানতে চাইল। রাসূলে করীম (সা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের তওরাত কিতাবে 'রজম' শাস্তি পর্যায়ে কিছু দেখতে পাও কি ? জওয়াবে তারা বললো ঃ এরূপ অপরাধে আমরা তো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত করি এবং তাদের দোর্‌রাও মারা হয়।

www.pathagar.com

এই সময় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) বললেন ঃ তোমরা মিথ্যা বলছো। তাওরা কিতাবে তো বিবাহিত নারী-পুরুষের যিনা অপরাধে 'রজম' শাস্তির কথা লিখিত রয়েছে। অতঃপর তওরাত কিতাব আনা হলো ও খুলে ধরা হলো। একজন 'রজম'-এর আয়াতটি হাত দিয়ে ঢেকে রাখল ও তার পূর্বের ও পরের অংশ পাঠ করল। তখন আবুদল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেন ঃ তোমরা হাত তুলে ফেল। হাত তুলে নিতেই আয়াতটি সকলে দেখতে পেলেন। তখন ইয়াহুদীরা স্বীকার করল যে, তওরাত কিতাবে 'রজম'-এর নির্দেশ স্পষ্ট ভাষায়ই লিখিত রয়েছে। অতঃপর তদানুযায়ী 'রজম' করার নির্দেশ জারী করা হলো।[১]

আর ইসলামের আইন-নীতি অনুযায়ী তওরাত কিতাবের আইন-মনসুখ না হলে স্বতঃই তার পরে অবতীর্ণ ইনজীল কিতাবেরও আইনরূপে গণ্য হবে।

আল্লাহ্ তা'আলাই ঘোষণা করেছেন ঃ

وَ قَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّ نُوْرٌ وَّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ

তাদের পিছনে পিছনে আমরা নিয়ে এলাম ঈসা ইবনে মরিয়মকে তার সম্মুখবর্তী তওরাতের সত্যতা ঘোষণকারীরূপে এবং তাকে দিলাম ইনজীল। তাতে হিদায়তের বিধান রয়েছে, আছে নূর। এবং তা তার সম্মুখবর্তী তওরাতের সত্যতা ঘোষণাকারী ও মুত্তাকীদের জন্য হিদায়ত ও উপদেশ। —সূরা মায়িদা ঃ ৪৬

বস্তুত তওরাত, ইনজীল এবং কুরআন—এই তিনখানি আসমানী গ্রন্থ প্রায় পর পর নাযিল হয়েছে এবং প্রত্যেকখানির অপর প্রত্যেকখানির মৌলিকতার সত্যতা ঘোষণা করে। তওরাত কিতাবে অনেক রদ-বদল হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকের তওরাতে সেই 'রজমে'র কথা স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত রয়েছে।

---

১. صحيح البخارى ج ٨ ص ١٤٣ কিন্তু ইমাম কুরতুবী এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন ভিন্নভাবে। তা এই ঃ ইয়াহুদ একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট নিয়ে এল। বলল, এরা দুইজন যিনা করেছে। নবী করীম (সা) বললেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন বড় আলিমকে নিয়ে এসো, তারা ছরিয়ার দুই পুত্রকে নিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দুই জনের ব্যাপারে তওরাতে কি বিধান দেখতে পাও ? তারা দুইজন বলল ঃ তওরাতে আমরা পাচ্ছি যে, চারজন লোক যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা পুরুষটি লিঙ্গ স্ত্রীলোকটি যৌনাঙ্গের ভিতরে দেখতে পেয়েছে যেমন সুর্মাদানীর মধ্যে শলাকা প্রবেশ করে, তাহলে দু'জনকেই 'রজম' করতে হবে। জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে তোমরা এই দুইজনকে 'রজম' করছ না কেন, বাধা কোথায় ? সে দুইজন বলল ঃ আমাদের শাসক চলে গিয়েছিল। তখন হত্যা করাটা আমরা অপছন্দ করলাম। অতঃপর চারজন সাক্ষ্য পেশ করা হলেও উক্ত রূপ সাক্ষ্য দিলে রাসূলে করীম (সা) তাদের 'রজম' করার নির্দেশ দিলেন।

www.pathagar.com

'তওরাত' বাংলা ভাষ্য 'পুরাতন নিয়ম' বা old testament নামে পরিচিত। তার দ্বিতীয় বিবরণ 'নানা বিষয়ে আদেশ' শিরোনামাধীন ক্ষেত্রগুলি আমি এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি ঃ

কিন্তু সেই কথা যদি সত্য হয়, কন্যার কুকার্যের চিহ্ন যদি না পাওয়া যায়, তবে তাহারা সেই কন্যাকে বাহির করিয়া তাহার পিতৃগৃহের দ্বার সমীপে আনিবে এবং সেই কন্যার নগরের পুরুষেরা 'প্রস্তরাঘাতে' তাহাকে 'বধ' করিবে। (২১-২২)

কোন পুরুষ যদি পরস্ত্রীর সহিত শয়নকালে ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে, এইরূপে তুমি এ স্রায়েলের মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।

২৩. যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগদত্তা কোন কুমারীকে নগর মধ্যে পাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তোমরা সেই দুইজনকে বাহির করিয়া নগরদ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরঘাতে বধ করিবে, সেই কন্যাকে বধ করিবে, কেননা নগরের মধ্যে থাকিলেও সে চিৎকার করে নাই এবং সেই পুরুষকে বধ করিবে, কেননা সে আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীকে মন ভ্রষ্টা করিয়াছে।

এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে। (৩০৪ পৃষ্ঠ) কিন্তু ইয়াহুদ ও খৃস্টানরা এই দণ্ড কার্যকর করে না। তাতে অবশ্য এর অস্তিত্ব বা বর্তমানতা বিপুপ্ত হয় না। এখানে এই শরীয়তী দণ্ড যদি ইসলামেও গৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে সে জন্য ইসলামী আইনকে দোষ দেয়া অন্তত এই দুই ধর্মাবম্বী লোকদের শোভা পায় না। বরং তারা তাদের ধর্মগ্রন্থে প্রস্তরাঘাতে 'বধ' করার বিধান থাকা সত্ত্বেও তা প্রত্যাখান করে চলছে বলে তারাই দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট যেমন, দুনিয়ার মানুষের নিকটও তেমনি।

যিনার শাস্তির বিবর্তন

তদানীন্তন আরব সমাজে যখন ইসলাম প্রচারিত হতে শুরু হয়, তখন যিনা-ব্যভিচার ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। সেদিকে লক্ষ্য রেখে হঠাৎ করে তার শাস্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার নীতি অবলম্বিত হয়নি। তা ক্রমশ বিধিবদ্ধ হয়েছে, যেন সমাজকে সংশোধন করার কাজ সফল হতে পারে, জনগণের পক্ষে তা গ্রহণ করা সহজ হয়।

এই কারণে এ পর্যায়ের সর্বপ্রথম যে বিধান নাযিল হয়, তা হচ্ছে সূরা আন-নিসা'র এই আয়াত ঃ

وَ الّٰتِیْ یَاْتِیْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْکُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِکُوْهُنَّ فِی الْبُیُوْتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیْلاً ۝ وَ اللَّذٰنِ یَاْتِیٰنِهَا مِنْکُمْ فَاٰذُوْهُمَا ج فَاِنْ تَابَا وَ اَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ کَانَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا ۝

www.pathagar.com

তোমাদের যেসব স্ত্রীলোক নির্লজ্জতার কাজ (যিনা) করবে, তাদের উপর তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী পেশ কর। তারা সেকাজের পক্ষে সাক্ষ্য দিলে তাদেরকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখ, যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের জীবন সাঙ্গ করে অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন উপায় বার করেন। —সূরা নিসা ঃ ১৫-১৬

আর তোমাদের যে দুইজন পুরুষ-নারী এই নির্লজ্জতার কাজ করে, তাদের কষ্ট দাও। তবে যদি তারা তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তা'হলে তাদের আর কষ্ট দিও না। কেননা আল্লাহ্ তো নিঃসন্দেহে তওবা কবুলকারী অতিশয় দয়াবান।

এ আয়াত অনুযায়ী প্রথম দিকে বিবাহিতের যিনার শাস্তি ছিল কয়েদ। আর অবিবাহিতের ছিল কথা ও ভীতির সাহায্যে কষ্টদান। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, শুরুতে 'তোমাদের যেসব স্ত্রীলোক' বলে বিবাহিতাদেরই বোঝানো হয়েছে। 'স্ত্রীলোক' অর্থ বিবাহিতা স্ত্রী। অন্যথায় এরূপ বলার কোন কারণ নেই। বিশেষত উক্ত আয়াতে দু'ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এক ধরনের শাস্তি অন্য ধরনের শাস্তির তুলনায় অধিকতর কড়া ও তীব্র। আর তা বিবাহিতের জন্য নির্দিষ্ট এবং অন্য ধরনের শাস্তি হচ্ছে হালকা, আর তা অবিবাহিতের জন্য। ঠিক যেমন রজম ও দোর্‌রা প্রথমটি কঠিন, দ্বিতীয়টি তার তুলনায় হালকা।[১]

কোন সন্দেহ নেই, উপরোদ্ধৃত আয়াতে বিবাহিত-অবিবাহিতের জন্য খুবই হালকা ধরনের শাস্তির কথাই বলা হয়েছে। কেননা মানুষ জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত হয়েছে খুবই অল্পদিন হলো। তবে তা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, এ বিষয়ে আর একটি বিধান আসার অপেক্ষা করতে হবে। উক্ত আয়াতে তাদের আটকে রাখতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, পরে সেই ব্যবস্থার ঘোষণা হয়েছে। হযরত উবাদাহ ইবনুস সামেত (রা) নবী করীম (সা)-এর এই কথাটি বর্ণনা করেছেন ঃ

خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً البكر بالبكر جُلْدُ مِائَةٍ وَ لَفِىْ سَنَةٍ وَ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جِلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ

তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, আল্লাহ্ ওদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তা হলো, অবিবাহিতদের একশ দোর্‌রা ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিতদের একশ দোর্‌রা ও 'রজম'।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 'যিনার' দু'টি অবস্থা। যিনাকারীর অবস্থার পার্থক্যের দরুণ তার শাস্তিও দুই ধরনের।

একটি এই যে, যিনাকারী হয় বিবাহিত হবে, না হয় হবে অবিবাহিত—কুমার-কুমারী। বিবাহিতের যিনার শাস্তি অবিবাহিতের তুলনায় অত্যন্ত কঠিন ও অধিকতর মর্মান্তিক। তার মূলে নির্হিত প্রকৃত যৌক্তিকতা তো আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তবে আমাদের বিশ্বাস,

১. الشرح الكبير ج ١٠ ص ١١٩ : العنى

www.pathagar.com

বিবাহিত নারী বা পুরুষ মান-মর্যাদা, আত্মচেতনাবোধ এবং তা লংঘনের বীভৎসতা সম্পর্কে অবহিত। তার বিবাহিত হওয়ার কারণে তার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে তার যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। তা সংরক্ষণের জন্য সে অধিকতর দায়িত্বশীল, তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে তার সচেতন হওয়া খুবই কাম্য ও স্বাভাবিক। তার যৌন বাসনা ও প্রবৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা বর্তমান। সে জন্য বিবাহের পরিধি লংঘন করে বাইরে যাওয়ার বাস্তবিকই কোন প্রয়োজন পড়ে না। হালাল পথেই সে তা যখন ইচ্ছা এবং যেরূপ ইচ্ছা অতি সহজেই পূরণ করতে পারে। এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও তার যিনা করা নিঃসন্দেহে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ গণ্য হবে। তার মনের মধ্যে যে অন্যায় প্রবণতা বাসা বেঁধে রয়েছে তার মূলোৎপাটন একান্তই জরুরী। তাই তার শাস্তি কঠিনতর হওয়াই স্বাভাবিক ও অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু অবিবাহিতের এরূপ অবস্থা নয়। সে যৌনতার মূল্য অতটা গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করতে সক্ষম নয়, যতটা সক্ষম বিবাহিত ব্যক্তি। তার সাময়িকভাবে উত্তেজিত যৌন-স্পৃহা হালাল পথে চরিতার্থ করার কোন ব্যবস্থাও নেই। ফলে তার দ্বারা তা সংঘটিত হয়ে যাওয়াটাকে একটা সম্পূর্ণ অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে করা যায় না। ধনী-সচ্ছল ব্যক্তির চুরি করা ও দরিদ্র ক্ষুধা কাতর ব্যক্তির চুরি করার মধ্যে যে পার্থক্য, এখানেও সেই পার্থক্যই প্রকট। অতএব তার শাস্তিটা প্রথম ব্যক্তির তুলনায় অবশ্যই হালকা হতে হবে। তা-ই স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত।

অবিবাহিতের যিনার শাস্তি

যে নারী বা পুরুষ বিবাহিত নয়, সে যদি যিনার অপরাধ করে, তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে একশ'টি দোর্‌রা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারী নারী—এদের প্রত্যেককে একশ'টি করে দোর্‌রা।[১]

(البحر المحيط ج ٦ ص ٤٢٨)

—এ বিষয়ে শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোনই মতভেদ নেই, এ ব্যাপারে তাঁরা সম্পূর্ণ একমত। অবশ্য এরপরও শাস্তির অংশ হিসাবে অপরাধীকে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করা হবে কিনা, এ বিষয়ে বিরাট মতদ্বৈততা লক্ষ্য করা যায়।

---

১. ইমাম আবূ হায়ান লিখেছেন الزانى و الزانية এই শব্দদ্বয়ের শুরুতে 'আলিফ' ও 'লাম' রয়েছে তা নির্দিষ্টকারী যদিও এই দু'টি অক্ষর সাধারণত অনির্দিষ্টকারী অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তিনি লিখেছেন ঃ

وَ قَالَ اِبْنُ سَلاَمٍ وَ غَيْرُهُ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالْبِكْرَيْنِ

এখান এই আলিফ ও লাম অক্ষর দুইটি নির্দিষ্টকারীরূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ বর্ণিত শাস্তিটা শুধু দুই অবিবাহিতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিবাহিতের ক্ষেত্রে নয়।

www.pathagar.com

এ পর্যায়ে তিনটি মতের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

প্রথম মত ঃ ব্যভিচারী পুরুষ হোক কি নারী, একশ'টি দোর্‌রা মারার পর-ও তাকে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করতে হবে। তা করা ওয়াজিব। জমহুর আলিমগণ এই মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইস্‌হাক ইবনে রাহওয়াইহ্। তাঁরা তাঁদের এই মতের সমর্থনে তিনটি দলীল পেশ করেছেন।

প্রথম হচ্ছে হযরত উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রা) বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَ نَفِىْ سَنَةٍ

(مسلم ابو داؤد ترمذى جامع الاصول)

তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা ওদরে জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অবিবাহিত-অবিবাহিতার যিনার একশ' দোর্‌রা এবং এক বছরের নির্বাসন দণ্ড দিতে হবে।

দ্বিতীয়, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও যায়দ ইবনে খালিদ (রা) বলেছেন, এক বেদুইন রাসূলে করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলল, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনি আমার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। তখন অপর পক্ষ বলে উঠল—সে তার চাইতে অধিক সমঝদার—হ্যা, আপনি আমাদের দুইজনের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ঘটনা বলার অনুমতি দিন। রাসূলে করীম (সা) বললেন ঃ হ্যা, বল। তখন সে বলল ঃ আমার পুত্র এই ব্যক্তির ঘরে মজুর হিসাবে কাজে নিয়োজিত ছিল। পরে সে এই ব্যক্তির স্ত্রীর সহিত যিনা করেছে। আমাকে জানানো হয়েছে যে, এই অপরাধের দরুন আমার পুত্রের শাস্তি হচ্ছে 'রজম'। তখন আমি এই শাস্তির বিনিময়ে এই লোকটিকে একশ'টি ছাগল ও একটি বাচ্চা দিয়েছি। পরে আমি শরীয়ত বিজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার পুত্রের শাস্তির একশ'টি দোর্‌রা ও এক বছরের নির্বাসন। আর এই ব্যক্তির স্ত্রীর উপর 'রজম'-এর শাস্তি। এই কথা শ্রবণের পর নবী করীম (সা) বললেন ঃ

وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الوَلِيْدَةُ وَ الْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَ عَلَى اِبْنِكَ جُلْدُ مِائَةٌ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا اُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ اَسْلَمَ اِلى امْرَاَةِ هذَا فَاِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجِمْهَا

হ্যা, আল্লাহ্‌র কসম—যাঁর মুষ্টিতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই তোমাদের দুই জনের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী বিচার করব। তোমার ছাগল ও বাচ্চা তোমাকে ফেরত দেয়া হলো। তোমার পুত্রের শাস্তি হচ্ছে একশটি দোর্‌রা ও এক বছর কালের জন্য নির্বাসন। আর হে উনাইস, তুমি কাল সকালেই এই ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাবে। সে যিনার অপরাধ স্বীকার করলে তাকে 'রজম' করবে।

www.pathagar.com

স্ত্রীলোকটি অপরাধ স্বীকার করলে রাসূলে করীম (সা) তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলেন। পরে তাকে 'রজম' করা হলো।[১]

এই হাদীসদ্বয় থেকে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দোর্‌রার পরও এক বছর কালের নির্বাসন দেয়া তখনকার সমাজে সর্বজনবিদিত শাস্তি ছিল এবং রাসূলে করীম (সা)-এর নিজের বিচারেও তা ছিল অবিবাহিতের যিনার শাস্তির অংশ।

তৃতীয় ঃ একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, হযরত আবূ বকর (রা) দোর্‌রা মারার সাথে সাথে মদীনা থেকে সিরিয়ায় নির্বাসনের দণ্ডও দিয়েছেন। কখনও কখনও অপরাধীকে দোর্‌রা মেরে ফিদাক-এর দিকেও নির্বাসিত করেছেন।

অতএব, এসব হাদীসের আলোকে বলা যায়, শুধু দোর্‌রাই নয়, সেই সাথে নির্বাসনের দণ্ডও কার্যকর করতে হবে অবিবাহিত যিনাকারীর উপর।[২]

দ্বিতীয় মত ঃ দোর্‌রার সাথে নির্বাসনের দণ্ড দিতে হবে কেবল পুরুষ যিনাকারীকে, স্ত্রীলোককে নয়। ইমাম মালিক ও ইমাম আওযাঈ এই মত দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, স্ত্রীলোককে বিদেশে নির্বাসন দেয়া হলে সে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত হয়ে যাবে। সে কোথায় থাকবে, কিভাবে দিন কাটাবে, তা একটি কঠিন প্রশ্ন বা সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। আর শরীয়তের বিধান মত নির্বাসন দেয়া হলে একজন মুহরিম পুরুষ তার সঙ্গে দিতে হবে। তা না হলে কোন অ-মুহরিম পুরুষের সঙ্গেই তাকে পাঠাতে হবে। তাকে একাকিনী পাঠানোর তো কোন প্রশ্নই উঠে না। কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الاخِرِ اَن تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مُحْرِمٍ (الترغيب ج ٤)

কোন ঈমানদার মহিলার পক্ষে মুহরিম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া একদিন-একরাত্রির দূরত্বের পথ সফর করা জায়েয নয়।

আর অ-মুহরিম পুরুষের সঙ্গে নির্বাসন করা হলে সে স্ত্রীলোকটিকে তো চরম ব্যভিচারের পথে ঠেলে দেয়া হবে, কার্যত তাকে ধ্বংসই করা হবে। আর কোন মুহরিম পুরুষকে তার সাথে নির্বাসিত করা হলে অপরাধী নয় এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু তা আল্লাহ্‌র বিধানের পরিপন্থী ঃ

وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى

কোন বোঝা বহনকারীই অন্যের বোঝা বহন করতে বাধ্য হবে না।[৩]

---

১. হাদীসটি প্রায় সব কয়খানি হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। দেখুন ঃ ৯৭ – ٤ امع الاصول

২. نيل الاوطار ٧ ص ٤٩٥

৩. المغنى ج ١ ص ١٣٣

www.pathagar.com

যদি কাউকে এভাবে অকারণ শাস্তি দান করা হয় মজুরী বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, তা'হলেও তা হবে এমন একটা দায়িত্ব চাপানো, যার সমর্থনে শরীয়তের কোন ভূমিকা নেই। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, বিদেশে নির্বাসনের দণ্ড কেবলমাত্র পুরুষকেই দেয়া যেতে পারে, কোন মেয়েলোককে নয়।

তৃতীয় মত ঃ নির্বাসনের দণ্ড দেয়া ওয়াজিব নয়। না পুরুষকে, না মেয়েলোককে। তবে বিচারক যদি তা প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর মনে করেন, তা'হলে তা দেয়া যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় নির্বাসনটা হবে তা'যীরী শাস্তি, কোন 'হদ্দ' নয়। এর ব্যতিক্রম জায়েয নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) এই মত দিয়েছেন। এ পর্যায়ে তাঁর পেশকৃত দলীল হচ্ছে ঃ

প্রথম ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে শুধু দোর্‌রার বিধান দিয়েছেন, নির্বাসনের নয়। অতএব তা প্রমাণিত নয়। তা সত্ত্বেও নির্বাসনের দণ্ড দেয়া হলে তা হবে শরীয়তের মূল অকাট্য দলীলের উপর অতিরিক্ত চাপানো। কিন্তু তা যায়েয নয়। বিশেষত নির্বাসন দণ্ডের কথা 'খবরে ওয়াহিদ' হাদীসে উদ্ধৃত। তার ভিত্তিতে মূল দলীলের উপর অতিরিক্ত কিছু চাপানো যেতে পারে না।

দ্বিতীয় ঃ বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রবীয়া ইবনে উমাইয়া ইবনে খালফকে মদ্যপানের অপরাধে নির্বাসিত করেছিলেন। পরে সে হিরাক্লিয়াসের সহিত মিলিত হয়ে খৃস্ট ধর্মাবলম্বী হয়ে যায়। এই কথা তিনি জানতে পেরে বললেনঃ

وَ اللهِ لاَ اُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا

আল্লাহ্‌র নামে শপথ, অতঃপর আমি আর কখনই কোন মুসলিম ব্যক্তিকে নির্বাসিত করব না।[১]

বস্তুত নির্বাসন যদি শরীয়তেরই বিধান হতো তাহলে তা না করার জন্য হযরত উমর (রা) এইরূপ শপথ করতেন না।

এ প্রেক্ষিতে ইমাম মালিক ও তাঁর সমমনাদের মতটিই অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয়। কেননা তাঁদের পেশকৃত যুক্তি অকাট্য, সুস্পষ্ট কিসাসের সাহায্যে 'সাধারণ'কে বিশেষ ও নিঃশর্তকে শর্তযুক্ত করার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

যিনার অপরাধ প্রমাণের পদ্ধতি

ইসলামে যিনার অপরাধটি অত্যন্ত কদর্য জঘন্য ও বীভৎসরূপে চিহ্নিত। এই কারণে এ অপরাধের শাস্তিও ভয়াবহ। আর ঠিক এ কারণেই এ অপরাধ প্রমাণের জন্য কঠিনতর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। দুইটির যে কোন একটি ছাড়া এই অপরাধ কোনক্রমেই প্রমাণিত হতে পারে না।

---

১. جامع الاصول ج ٤ ص ٢٧٧

سالمغنى و الشرح الكبير ج ١٠ ص ١٣٤

www.pathagar.com

১. অপরাধী নিজেই স্বীয় অপরাধ স্বীকার করবে এবং এই স্বীকৃতি বা স্বীকারোক্তি হতে হবে স্পষ্ট ভাষায় চারবার। বিপুল সংখ্যক শরীয়ত বিশেষজ্ঞই এই মত প্রকাশ করেছেন। তার এই স্বীকারোক্তি হতে হবে মূল কাজটি করার, যেন এ পর্যায়ে এক বিন্দু শোবাহ-সন্দেহের অবকাশ না থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) মায়েযকে বলেছিলেন, সম্ভবত তুমি শুধু চুম্বন করেছ কিংবা হয়ত ইশারা-ইঙ্গিত করেছ মাত্র অথবা দৃষ্টি বিনিময় করেছ, চেয়ে চেয়ে দেখেছ মাত্র। সে বলল, না, শুধু তা নয়। বললেন, তুমি তাকে ব্যবহার করেছ। বললো, 'হ্যা'। অতপর তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দেয়া হয়।[১]

অপর একটি বর্ণনায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, বাক্যের শেষ অংশ ছিল এই ইঙ্গিতপূর্ণ কথাটি ঃ

তোমার লিঙ্গ তার যৌনাঙ্গের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে কি ? বলল, হ্যা, ঠিক যেমন শলাকা সুর্মাদানীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং যেমন বালতির রশি কূপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। জিজ্ঞসা করলেন, যিনা কাকে বলে, তুমি কি তা জান ? বলল, হ্যা আমি স্ত্রীলোকটির সাথে হারামভাবে সেই কাজই করেছি, যা স্বামী তার স্ত্রীর সাথে করে হালালভাবে।[২]

এই হাদীসের আলোকে জমহুর আলিমগণ যিনার শাস্তি কার্যকর করার জন্য যে স্বীকারোক্তির শর্ত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, এই স্বীকারোক্তি এমন স্পষ্ট ও অকাট্য হতে হবে যে, তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর হওয়া সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সে তা প্রত্যাহার করবে না।

২. যিনার ঘটনার উপর চারজন সাক্ষী প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সাক্ষ্য দেবে এবং সে সাক্ষ্যদাতাদের বিশ্বাসী ও সত্যবাদী হতে হবে।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً

যেসব লোক নির্দোষ-সুরক্ষিত মহিলাদের উপর যিনার (মিথ্যা) দোষারোপ করে, পরে তা প্রমাণ করার জন্য চারজন সাক্ষী পেশ করে না, তাদের আশিটি দোর্‌রা মার। —সূরা নূর ঃ ৪

اللّٰتِىْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ

তোমাদের যেসব মেয়েলোক যিনার অপরাধ করে, তাদের অপরাধ প্রমাণের জন্য তোমদের চারজনকে সাক্ষী বানাও। —সূরা নিসা ঃ ১৫

১. বুখারী।
২. আবূ দাউদ।

www.pathagar.com

সাক্ষীদের স্পষ্ট ভাষায় বলতে হবে যে, আমরা তার পুরুষাঙ্গকে মেয়েলোকটির স্ত্রী-অঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট দেখতে পেয়েছি, ঠিক তেমনিভাবে, যেমন করে শলাকা সুর্মাদানীর অভ্যন্তরে এবং রশি কূপের ভেতরে প্রবিষ্ট হয়।[১] উভয়কে শুধু শৃঙ্গাররত, উলঙ্গ, জড়াজড়ি অবস্থায় দেখতে পাওয়াই 'যিনা' প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। তার অর্থ, শুধু সেই অবস্থায় দেখতে ও পূর্ববর্তী অবস্থায় না দেখার সাক্ষ্য হলে তাতে যিনা প্রমাণিত হবে না এবং সেজন্য নির্দিষ্ট দণ্ডও কার্যকর করা যাবে না।

অন্য কথায়, যিনার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি কার্যকর হতে পারে কেবলমাত্র তখন, যদি নিম্নোক্ত দুইটি ব্যাপারের কোন একটি ঘটে ঃ

প্রথম, যিনাকার ব্যক্তি এতটা নির্লজ্জ, বে-পরোয়া ও অকুণ্ঠ হয়ে এই পাপ কাজে লিপ্ত হবে যে, সে নৈতিকতা ও মানবিকতার নিম্নতম মূল্যমানকেও বিনষ্ট করবে, নিম্নস্তরের নিতান্ত পশুর পর্যায়ে পৌঁছে যাবে এবং জনতার সম্মুখে, পথে-ঘাটে পার্কে এই কাজ করতে শুরু করে দিবে, জনগণ এই যিনার কার্যটি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে— যেমন করে সুর্মাদানীর মধ্যে শলাকা বা কূপের মধ্যে রশি প্রবেশ করতে দেখতে পায়। আর এই অবস্থায় সংঘটিত এই কাজটি যে চরম মাত্রার নির্লজ্জতা, অন্য মানুষকেও সে কাজে উদ্বুদ্ধকরণ এবং চরম মানের পাপ কাজের ব্যাপক প্রসারতা, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়, যিনাকারী ব্যক্তি নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের এই কাজের স্বীকারোক্তি (Confess) করবে ও সেজন্য নির্দিষ্ট শাস্তি গ্রহণে আগ্রহী হবে নিজকে গুনাহ্র কলুষতা থেকে পবিত্র করা এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা পাওয়ার লক্ষ্যে।

যে কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির লোকই স্বীকার করবেন যে, এই দুইটি অবস্থার মধ্যে যে কোনটি হলে সেজন্য কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত এবং সে শাস্তি অবশ্যই কার্যকর হওয়া উচিত, তা যতই কঠোর হোক-না কেন। উপরন্তু এর কোন একটিও না হলে সে শাস্তি কখনই 'নির্মম' বা 'অমানবিক' বলে অভিহিত করা চলে না।

বিবাহিতের যিনার শাস্তি

আমরা কুরআন মজীদে ব্যবহৃত যে শব্দটির অর্থ বলেছি 'বিবাহিত', তা হচ্ছে ঃ المحصنت। বা الا حصان। কুরআন মজীদে এই শব্দটি মূলত চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হচ্ছে ঃ العفائف। —Pure নির্মল, বিশুদ্ধ, পবিত্র, খাঁটি, Chaste পবিত্রা, চরিত্রবর্তী, সতী, সুরুচিসম্পন্ন। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ

যারা পবিত্রা, নির্মল, চরিত্রবর্তী বা সতী মেয়েলোকদের উপর যিনার অভিযোগ আনে....

১. المغنى الشرح الكبير ص ١٧٥

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অর্থ, المتزوجات বিবাহিতা। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ

এবং বিবাহিতা মেয়েলোকগণ .....

مُحْصَنٰتٍ غَيْرُ مُسٰفِحٰتٍ

বিবাহিতা অবস্থায়—অবিবাহিতা যিনাকার হিসাবে নয় .....

তৃতীয় অর্থ, মুক্ত স্বাধীন-ক্রীতদাসী নয়। যেমন ঃ

وَ مَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ

আর যে লোক স্বাধীনা ঈমানদার মহিলা বিয়ে করার সামর্থ্যের অধিকারী নয় ....

আর চতুর্থ অর্থ ঃ ইসলাম গ্রহণ করা। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِذَا اُحْصِنَّ

এ আয়াতের অর্থ ইবনে মসউদ (রা) বলেছেন ঃ ইসলাম গ্রহণ। এখানে সম্পূর্ণ অর্থ হলো, যে লোক এ অবস্থায় যে, সে স্বাধীন, শরীয়ত পালনে যোগ্য-বাধ্য, যথার্থভাবে ও বিশুদ্ধ নিয়মে বিয়ে করল এবং একবার হ'লেও স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করল .....[১]

এরূপ একজন محصن ব্যক্তি—সে পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক—যিনা করলে তার শাস্তি হচ্ছে 'রজম'—প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা। কেননা নবী করীম (সা) থেকে এই শাস্তির বর্ণনা অকাট্য ও সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া গেছে তাঁর কথা ও কাজ—উভয় দিক দিয়েই। তাঁর কথার বর্ণনাটি এই ঃ

১. হযরত উবাদাতা ইবনুস সাবিত (রা) বলেছেন ঃ নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْىُ سَنَةٍ وَ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الْجِلْدُ وَ الرَّجْمُ ه

তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, আল্লাহ্ ওদের সম্পর্কে ব্যবস্থা জানিয়ে দিয়েছেন...অবিবাহিতদের শাস্তি এক'শ দোর্‌রা ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিতদের শাস্তি দোররা ও 'রজম'।

২. শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত ব্যক্তির মনিবের স্ত্রীর সহিত যিনা করার ঘটনায় নবী করীম (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

وَ اغْدُيَا اُنَيْسُ اِلٰى امْرَاَةِ هٰذَا فَاِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجِمْهَا –

পরে মেয়েলোকটি স্বীকার করলে নবী করীম (সা) তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলেন এবং তা কার্যকর করা হলো।[২]

১. السياسة الشرعية ص ١٠

২. বহু কয়খানা হাদীস গ্রন্থেই এই হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। দেখুন ঃ جامع الاصول ج ص ٢٩٧

www.pathagar.com

আর তিনি নিজেই যে 'রজম' দণ্ডে দণ্ডিত করেছেন, তারও প্রমাণ অকাট্যভাবে রয়েছে। বিশেষ করে মায়েয ইবনে মালিক, গামেদীয়া ও দুই ইয়াহুদীর সহীহভাবে বর্ণিত ঘটনা।

বিবাহিত, সংরক্ষিত, চরিত্রবান নারী কিংবা পুরুষ যিনা করলে তার শাস্তি যে 'রজম', এ বিষয়ে ইসলামের সকল কালের সকল দেশের সকল মনীষীই সম্পূর্ণ একমত। কেননা খাওয়ারিজরা ছাড়া এই বিষয়ে আর কেউই ভিন্ন মত প্রকাশ করেনি।

খাওয়ারিজদের বক্তব্য শুধু এতটুকু যে, 'রজম'-এর কথা যেহেতু কুরআনে নেই এবং তা খুবই কঠোর নির্মম শাস্তি, তা যদি বাস্তবিকই শরীয়তের বিধান হতো, তাহলে তার উল্লেখ কুরআনে না হয়ে কিছুতেই পারতো না। আর তা-ই যখন নেই, তখন ধরে নিতে হবে যে, তা শরীয়ত সম্ভবত নয়।

কিন্তু খাওয়ারিজদের এই মত দলীলভিত্তিক নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়। কেননা কুরআনে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ না থাকলেই যে তার শরীয়তের দলীল হতে পারবে না, তা ঠিক নয়। কারণ, কুরআনের সাথে সাথে এবং পরে পরেই সুন্নাহ ও শরীয়তের দলীল। এই সুন্নাতে-ই অকাট্য স্পষ্টভাবে 'রজম'-এর উল্লেখ রয়েছে। তাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। রাসূলে করীম (সা)-এর পর খুলাফায়ে রাশেদিন এই আইন কার্যকর করেছেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) একদা ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে পরম সত্যতা সহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। সেই অবতীর্ণ বিষয়াবলীর মধ্যে 'রজম'-এর আয়াতও ছিল। আমরা তা পড়েছি ও তার সংরক্ষণও করেছি। স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) 'রজম' করিয়েছেন, তাঁর পরে আমরাও তা করিয়েছি। আমি ভয় পাচ্ছি, সময়ের দীর্ঘতায় লোকেরা হয়ত বলবে, আল্লাহ্র কিতাবে আমরা 'রজম'-এর আয়াত পাচ্ছি না। তাতে তারা আল্লাহ্র ধার্য করা ফরয পরিত্যাগ করার কারণে গুমরাহ্ হয়ে যাবে। মনে রেখো, 'রজম' আল্লাহ্র কিতাবভুক্ত বিধি। বিবাহিত পুরুষ নারী যিনা করলেই এবং তা অকাট্য- সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলেই, অথবা গর্ভ হয়ে গেলে কিংবা একজনের স্বীকারোক্তি হলেই তা কার্যকর হবে।[১] আল্লাহ্র নামে শপথ ! উমর আল্লাহ্র কিতাবে বৃদ্ধি করেছে লোকেরা এই কথা বলবে বলে ভয় না করলে আমি অবশ্যই কুরআনে আয়াতটি লিখে দিতাম।[২]

বিবাহিত নারী বা পুরুষ যিনা করলে তার শাস্তি 'রজম' কিন্তু তার পূর্বে তাকে দোর্‌রা মারা হবে কিনা, এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

ইমাম আবূ হাইয়ান লিখেছেন ঃ

وَ اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الاَمْصَارِ عَلَى اَنَّ الْمُحْصِنَ يَرْجَمُ وَ لاَ يُجْلَدُ

১. صحيح مسلم بشرح النووى ج ١١ ص ١٩١

২. سنن ابى داؤد ٣ ص ٤٥

www.pathagar.com

সকল স্থানের ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, বিবাহিত যিনাকারীকে 'রজম' করা হবে, দোর্‌রা মারা হবে না।[১]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাবী তাঁর তফসীরে কবীর-এ ইমাম শাফিয়ীর অভিমত উল্লেখ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

حَدُّ الزِّنَا اِنْ كَانَ مُحْصِنًا يُرْجَمُ وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصِنًا يُجْلَدُ (ج ٦ ص ١٣٢)

যিনার শাস্তি হচ্ছে যিনাকার বিবাহিত সুরক্ষিত হলে তাকে 'রজম' করা হবে এবং তা না হলে তাকে দোর্‌রা মারা হবে।

মুসলমানকে কেবল তিনটি কারণে হত্যা করা যেতে পারে। তার একটি হচ্ছে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যদি ব্যভিচার করে। এই কথার পর ইমাম ফখরুদ্দীন রাবী লিখেছেন ঃ

وَ اِذَا ثَبَتَ اِنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ اِحْصَانٍ وَجَبَ الرَّجْمُ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ

এই হাদীসের আলোকে বলা যায়, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করেছে প্রমাণিত হলে তাকে অবশ্যই 'রজম' করতে হবে। আরও লিখেছেন ঃ

حَدُّ الزِّنَا عَلَى الشَّيِّبِ الرَّجْمُ وَ حَدُّ الْبِكْرِ الْجِلْدُ وَ التَّغْرِيْبُ

বিবাহিতের যিনার শাস্তি 'রজম' এবং অবিবাহিতের যিনার শাস্তি দোর্‌রা ও নির্বাসন।

যদি কেউ মনে করেন যে, সূরা নূর-এর যিনা-সংক্রান্ত পূর্বোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর 'রজম' রহিত হয়ে গেছে, তা'হলে বলব, একথা ঐতিহাসিকভাবেই অসত্য। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী ও অন্যান্য হাদীসবিদ্ ঐতিহাসিকগণ 'রজম' সংক্রান্ত হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, সূরা নূর নাযিল হওয়ার এবং 'ইফ্‌ক' ঘটনার পরও খোদ রাসূলে করীম (সা) 'রজম' দণ্ড কার্যকর করেছেন। বস্তুত 'রজম' মুতাওয়াতির সুন্নাত থেকে প্রমাণিত। আর সুন্নাত যে ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস, সে বিষয়ে ইসলামে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিরই একবিন্দু সন্দেহ নেই।

'তাহাভী শরীফে হাদীসের একটি অধ্যায় হচ্ছে ঃ

باب حد الزنى المحصن

বিবাহিতের যিনার দণ্ড অধ্যায়। তাতে বিবাহিতের যিনার শাস্তি সর্বজনস্বীকৃত 'রজম' ছাড়া আরও কিছু আছে কিনা, এই পর্যায়ের আলোচনায় তিনি লিখেছেন ঃ

اَلزَّانِىْ الْمُحْصِنُ عَلَيْهِ شَئٌ وَاحِدٌ فَيَكُوْنُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ الَّذِىْ قَدِ اتَّفَقَ اَنَّهُ عَلَيْهِ وَ يَنْتَفِىْ عَنْهُ الْجِلْدُ الَّذِىْ لَمْ يَتَّفِقْ اَنَّهُ عَلَيْهِ وَ هٰذَا قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةَ اللهِ عَلَيْهِمْ

১. البحر المحيط ٦ ص ٤٢٨

www.pathagar.com

বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য একটি মাত্র দণ্ড, আর তা হচ্ছে 'রজম'। এ বিষয়ে সকলেই একমত। এ ছাড়া তাকে দোর্‌রার শাস্তি দেয়া হবে না। কেননা বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম ছাড়াও দোর্‌রা শাস্তি অতিরিক্ত দেয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য নেই। ইমাম আবূ হানীফা, কাযী আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এই মত।

'রজম' দণ্ড কার্যকর করার প্রক্রিয়া

'রজম' দণ্ডে যে দণ্ডিত হবে, তাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে। কেন কূপ খুড়ে তার মধ্যে দাঁড়া করতে হবে না, শক্ত করে বাঁধতেও হবে না তাকে। জমহুর আলিমগণ এই মতই দিয়েছেন। তার দলীল হচ্ছে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন ঃ

রাসূলে করীম (সা) যখন মায়েয ইবনে মালিককে 'রজম' করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিলেন, তখন আমরা তাকে নিয়ে বকীর দিকে বের হয়ে গেলাম। তার জন্য আমরা কূপ খুড়লাম না, তাকে বাঁধলামও না। সে দাঁড়িয়ে গেল, আমরা তার উপর পাথর, হাড় ও চাড়া ইত্যাদি নিক্ষেপ করতে লাগলাম। প্রস্তরের আঘাতে সে শক্ত হয়ে গেল। আমরাও শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম। পরে একটি কালো পাথর আকীর্ণ স্থান আমাদের মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়ালো। তখন আমরা সেই স্থানের প্রস্তর দ্বারা আঘাত করতে লাগলাম। ফলে শেষ পর্যন্ত সে স্তব্ধ হয়ে গেল।[১]

কারোর উপর অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে 'রজম' শাস্তি সাব্যস্ত হওয়ার পর যদি কেউ লোকদের থেকে পালিয়ে যেত, 'তা'হলে তারা তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করত। আর যদি শুধু স্বীকারোক্তির উপর অবিচল থাকত, তাহলে তার পশ্চাদ্ধাবন করতো না ; হুকুম কার্যকর করাকে মুলতবী করে দিত। মায়েয অসলামী প্রস্তরঘাতে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুভয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু লোকেরা তাকে ধরে ফেলে ও প্রস্তরাঘাতে শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করে। রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছালে তিনি তাদের বলেছিলেন ঃ

هَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ لَعَلَّهُ اَن يَّتُوْبَ فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ (ابو داؤد ج ٢)

তোমরা তাকে যেতে দিলে না কেন ? সম্ভবত সে তওবা করত এবং আল্লাহ্-ও তার তওবা কবুল করতেন।

মেয়ে অপরাধীকে 'রজম' করা কালে তার জন্য কূপ খনন করা হবে কিনা, তা নিয়ে শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, 'রজম' কালে তাকে কূপের মধ্যে দাঁড় করানো ভলো। ইমাম আবূ ইউসুফ ও আবূ সওর এই মতের সমর্থক।

---

১. صحح مسلم مع النووى ج ١١ ص ١٩٨ سن ابى داؤد ج ٢ ص ٤٢٠

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجَمَ اِلْمَرَاَةً فَجَفَرَ لَهَا ابى التَّنْدُوَةِ

নবী করীম (সা) একটি স্ত্রীলোককে 'রজম' করিয়েছেন এবং তার জন্য বুকের উপর পর্যন্তকার গভীর একটি কূপ খুড়েছিলেন।[১]

অবশ্য ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ কূপ না খোড়ার কথাই বলেছেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে, নবী করীম (সা) গামেদীয়াকে 'রজম' করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ; কিন্তু তার জন্য কূপ খনন করতে বলেন নি। তবে তার দেহ আবৃত রাখার জন্য শক্ত করে কাপড় বেঁধে দেয়া হয়েছিল। কূপ শুধু পালাতে বাধা দেয়ার কাজ করতে পারে। আর অভিযুক্ত ব্যক্তি পালালে তো মনে হবে, সে শরীয়তের শাস্তি গ্রহণের সংকল্প পরিত্যাগ করেছে।

'রজম' করার সময় জনতা যে চতুর্দিক থেকে তাকে পরিবেষ্টিত করে রাখে। কেউ কেউ এই মত দিয়েছেন যে, তাকে কেন্দ্র করে লোকেরা সালাতের কাতারের ন্যায় কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়, যেন পরস্পরের গায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।

'রজম' পাথর দ্বারাই সম্পন্ন করতে হবে। মধ্যম আকারের পাথর খণ্ড হতে হবে, পাথর খণ্ড আকারে খুব বড় হবে না এ জন্য যে, তাতে তো সে অবিলম্বেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। আর তাতে প্রস্তর নিক্ষেপণে মৃত্যুদণ্ড দানের উদ্দেশ্যই ক্ষুন্ন হবে। পাথর খণ্ড খুব ছোট হওয়াও উচিত নয়। কেননা ক্ষুদ্রাকার প্রস্তরের আঘাতে মৃত্যু খুবই বিলম্বিত হবে। পীড়ন দীর্ঘায়িত হবে। 'হদ্দ' বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। অথচ সে পাথরে খুব ক্ষতিও হবে না।[২] এই দণ্ডদান অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মু'মিনের উপস্থিত থাকা একান্ত জরুরী। সূরা আন্-নূর-এর দ্বিতীয় আয়াতে সে কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া আছে। ফাসিক ফাজের লোকগুলি যেন এই অনুষ্ঠান দর্শনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে।

রজম-এর পরবর্তী কার্যক্রম

'রজম' দণ্ড কার্যকর করায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত হলে তার সাথে একজন মৃত মুসলিমের ন্যায় আচরণ করতে হবে। তাকে গোসল করাতে হবে, কাফন পরাতে হবে ও যথারীতি মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে। তার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়াও করতে হবে। খারাপভাবে ও ঠাট্টা-বিদ্রুপছলে তার উল্লেখ করা যাবে না। অধিকাংশ শরীয়তাভিজ্ঞাদের মতে তার জানাযাও পড়তে হবে। মুসলিম শরীফে নবী করীম (সা)-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা সকলে মায়েযের জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর। লোকেরা বললো আল্লাহ্ মায়েযকে মাফ করুন।

---

১. الغنى و الشرح الكبير ج ١٠ ص ١٣

২. المغنى الشرح الكبير ج ١٠ ص ١٢٢

www.pathagar.com

পরে তিনি বললেন ঃ

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ

মায়ের এমন তওবা করেছে যে, তা যদি গোটা মুসলিম উম্মতের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া যায়, তাহলে তা তাদের সকলকে পরিব্যাপ্ত করবে।

হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ নবী করীম (সা) গামেদীয়াকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলে তারা তা সম্পন্ন করল। এই সময় হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা) একখণ্ড পাথর নিয়ে অগ্রসর হয়ে এসে তার প্রতি লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। ফলে পাথরটির আঘাতে রক্তের ছিটা এসে তাঁর মুখে লেগে গেল। তখন তিনি গামেদীয়াকে গাল দিলেন।

রাসূলে করীম (সা) তা শুনতে পেয়ে বললেন ঃ

مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا مَا حِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ اَمَرَبِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَ دُفِنَتْ (مسلم مع النووى ج ١١ ص – ٢٠١ – ٢٠٣)

থামো হে খালিদ ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর নামের শপথ। গামেদীয়া এমন তওবা করেছে যা জোরপূর্বক কর আদায়কারীরা করলে নিশ্চয়ই তাদের মাফ করা হতো। অতপর 'রজম' কাজ সম্পন্ন করতে বললেন এবং শেষে তার জানাযা নামায পড়লেন। আর পরিশেষে তাকে দাফন করা হয়।

অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) 'রজম'-এ মৃত জুহানীয়ার জানাযা পড়লেন, তখন হযরত উমর (রা) বললেন ঃ হে রাসূল (সা) ! আপনি একজন ব্যভিচারিণীর জানাযা পড়লেন ?

জওয়াবে তিনি বললেন ঃ

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَ هَلْ وُجِدَتْ تَوْبَةٌ اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلهِ

জুহানীয়া এমন তওবা করেছে যে, তা মদীনার সত্তর জনের মধ্যে ভাগ করে দিলেও তাদের পরিব্যাপ্ত করত। সে নিজেকে আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করে দিয়ে যে তওবা করেছে, তার চাইতে উত্তম তওবা কি কখনও পাওয়া যেতে পারে ?

হযরত জাবির ইবনে আদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ 'রজম' দণ্ডে মায়েযের মৃত্যু হলে নবী করীম (সা) তার ভাল দিকের উল্লেখ করলেন এবং তার জানাযা পড়লেন।[১]

১. بخارى مع لترح الفتح البارى ج ١٢ ص ١٢٩

www.pathagar.com

যিনার মিথ্যা দোষারোপের অপরাধ

কোন লোককে যিনা ও পূংমৈথুনের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করাকে আরবী পারিভাষিক নাম দেয়া হয়েছে 'আল্-কাযাফ' (القذف)। সাধারণভাবে ঠাট্টা বা বিদ্রুপছলে একজন অপরজনকে বলে ঃ 'হে যিনাকার'। অথবা বলে, 'আমি অমুককে যিনা করতে দেখেছি'। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এই কথাগুলি 'কাযাফ' পর্যায়ে গণ্য। বস্তুত ইসলামী সমাজে চরিত্রবান মু'মিন পুরুষ বা মহিলাদের নামে এইরূপ উক্তি খুব সাধারণ এবং নগণ্য ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তি সম্পর্কে এইরূপ কথা বলা হয় তার উপর এবং সাথে সাথে গোটা সমাজের উপর তার তীব্র খারাপ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এর ফলে জনগণের সম্মুখে সে অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রে চিত্রিত হয়। তার লজ্জা ও লাঞ্ছনার কোন সীমা থাকে না। হাসি-ঠাট্টাছলে বলা হলেও এ ধরনের কথায় জনসমাজে জঘন্য ও কুৎসিত চরিত্রের কালো ছায়াপাত ঘটে। সন্দেহ-সংশয়, অবিশ্বাস-অনাস্থা, অভক্তি এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বিষস্রোত গোটা সমাজ মানসকে পংকিল ও বিষ জর্জর করে তোলে। স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে, স্ত্রী তার স্বামীর চরিত্রের প্রতি একান্ত প্রয়োজনীয় ও বৈবাহিক জীবনের পরম ভিত্তি আস্থা ও ভক্তি অবিচল রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে পিতা তার পুত্র বা কন্যার প্রতি এবং পুত্র-কন্যা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকতে পারে না। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের জন্মের বৈধতা ও পবিত্রতা সম্পর্কেও সাংঘাতিকভাবে সন্দিহান হয়ে পড়ে। এই কারণে ইসলাম এই ধরনের দায়িত্বহীন কথা-বার্তা বলাকে চিরদিনের জন্য অকাট্য হারাম ঘোষণা করেছে। শুধু তা-ই নয়, যে তা করে, তার উপর অভিশাপও বর্ষণ করা হয়েছে। তাকে বিশ্বাস-অযোগ্য বলে চিহ্নিত করেছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার কঠিনতম আযাবে পরিবেষ্টিত হওয়ার ভয়-ও দেখানো হয়েছে। এই পর্যায়ে আল্লাহ্‌র ঘোষণা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَ الاٰخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (النور – ٢٣)

যেসব লোক সুরক্ষিত-সচ্চরিত্র, অসতর্ক-ঈমানদার মহিলাদের উপর যিনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে, তারা ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য অতিবড় আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ مَا هِىَ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَ اَكْلُ الرِّبَا وَ اَكْلُ مَالُ الْيَتِيْمِ وَ التَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذْفَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ الْغٰفِلٰتِ (بخارى)

www.pathagar.com

তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী কাজ থেকে দূরে সরে থাকবে। সাহাবীগণ বললেন ঃ হে রাসূল, সে সাতটি ধ্বংসকারী কাজ কি কি ? বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সহিত শির্‌ক করা, আইনের ভিত্তি ছাড়া নরহত্যা করা—যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল-সম্পদ হরণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং মু'মিন-অসতর্ক-চরিত্রবতী মেয়েলোকদের উপর যিনার মিথ্যা দোষারোপ করা।

যিনার মিথ্যা দোষারোপের শাস্তি

যে লোক কোন পুরুষ বা মেয়েলোককে যিনা বা পুংমৈথুনের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করবে, এই অভিযোগ রাষ্ট্র প্রধান—তথা প্রশাসন কতৃপক্ষের নিকট দায়ের হবে, তাকে আশি দোর্‌রার শাস্তি দেয়া হবে। এভাবেই জনগণের মান-মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলামে এ ব্যবস্থা না থাকলে সমাজে এই পাপের ব্যাপক প্রচলন হতো এবং তার ফলে বহু মানুষকেই নানাভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হতো।

তবে অভিযোগকারী যদি তার অভিযোগের সমর্থনে চারজন প্রত্যক্ষ দর্শীর সাক্ষ্য পেশ করতে পারে, তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

কুরআন মজীদে এই পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (النور – ٤ – ٥)

আর যেসব লোক সুরক্ষিত চরিত্রবান মেয়েলোকদের উপর যিনার অভিযোগ আনে, পরে সেজন্য চারজন সাক্ষী উপস্থাপিত করে না, তাদের আশিটি দোর্‌রা মার। তাদের সাক্ষ্য কখনই কবুল করবে না। ওরা ফাসিক। তবে যারা এই অপরাধ থেকে অতঃপর তওবা করবে ও নিজেদের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ্ (তাদের জন্য) নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

অভিযোগকারী যদি স্বাধীন ও শরীয়ত পালনে বাধ্য হওয়ার উপযোগী হয় এবং অভিযোগটা হয় যিনা করার—এবং তা মিথ্যা হয় বা প্রমাণিত না হয়, তাহলে উপরোক্ত শাস্তি তাদের উপর কার্যকর করা একান্তই কর্তব্য। আর অভিযোগ যদি যিনা বা পুংমৈথুন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে হয় (আর তা অপ্রমাণিত হয়) তাহলে তার উপর তা'যীর ধার্য হবে।

যিনার মিথ্যা অভিযোগে 'হদ্দ' ধার্য হচ্ছে, অথচ কাউকে কুফর বা মুনাফিকীর অভিযোগে মিথ্যা-মিথ্যিভাবে 'অভিযুক্ত করা হলে তাতে 'হদ্দ' ধার্য হয় না। এর মূলে কি তাৎপর্য নিহিত, এ নিয়ে লোকেরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকে।

www.pathagar.com

এ পর্যায়ে আমাদের জওয়াব স্পষ্ট। বস্তুত কারোর বিরুদ্ধে মিথ্যা-মিথ্যিভাবে যিনার অভিযোগ তোলা অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের অপরাধ, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এর পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া সমাজে খুব ভয়াবহ হয়ে দেখা দেয়। তাতে সমাজে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত ব্যক্তি জনগণের আস্থা থেকে চিরদিনের তরে বঞ্চিত হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে সমাজে যে ব্যাপক প্রচারণা চলতে থাকে তাকে মিথ্যা প্রমাণ করা ও তার খারাপ প্রতিক্রিয়া রোধ করা বা তার কু-প্রভাব মুছে ফেলা তার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না। তাকে সারাটা জীবন মিথ্যা কলংকের বোঝা বহন করে অতিবাহিত করতে হবে। এই অবস্থা আরও দুরপণেয় আরও মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মেয়েলোক হয়। এই কলংক শুধু তাকেই ক্ষত-বিক্ষত করে না, তার পিতৃ পুরুষ ও তার গর্ভজাতদেরও মুখকে কালিমা লিপ্ত করে। আর অবিবাহিতা হলে তো তার পক্ষে বিবাহিতা হওয়ার আশা চিরতরে খতম হয়ে যায়। কুফরীর মিথ্যা অভিযোগের তুলনায় যিনার মিথ্যা অভিযোগ অত্যন্ত ভয়াবহ, প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় অনেক হালকা হয়ে থাকে। কেননা কারোর বিরুদ্ধে সেরূপ অভিযোগ উঠলেও তার বাস্তবে ইসলাম অনুসরণ ও শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালন তাকে জনগণের সম্মুখে মিথ্যা অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে অনেক সাহায্য করে। তাতে লজ্জার খুব একটা কারণ ঘটে না। কিন্তু যিনার মিথ্যা অভিযোগ এক-একটি ব্যক্তির—সেই সাথে আরও বহু ব্যক্তির জীবনকে চিরতরে কলংকিত করে রাখে।

মদ্যপানের অপরাধ

ইসলামে সকল প্রকার মাদক দ্রব্য ও মদ্যপান সম্পূর্ণ স্থায়ীভাবে হারাম। কুরআন ও সুন্নাহ—ইসলামের এই দুইটি উৎসই এ বিষয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এই কথা ঘোষণা করেছে এবং রাসূলে করীম (সা)-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। এ বিষয়ে কোন ইসলাম বিশেষজ্ঞই একবিন্দু ভিন্নমত প্রকাশ করেন নি, দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে এ নিয়ে তখন পর্যন্ত কোন মতভেদেরও সৃষ্টি হয়নি।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌র ঘোষণা হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝ (المائده ٩٠ – ٩١)

www.pathagar.com

হে ঈমানদার লোকেরা ! এই মদ্য, জুয়া, বলিদান স্থান ও পাশা—এই সবই জঘন্য শয়তানি কাজ। এইগুলি পরিহার কর। আশা করা হচ্ছে যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। শয়তান তো এই মদ্য ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে সংকল্পবদ্ধ, তোমাদের আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সালাত (নামায) থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট। তা'হলে তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে ?

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (نسائى ج ٨ ص ٢٩٧)

সকল নেশার জিনিসই মাদক এবং সকল নেশার জিনিসই হারাম।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا اَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمَلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

(ابو داؤد ج ٣ ص ٢٩٥)

সব নেশার জিনিসই হারাম। আর যার সামান্য পরিমাণও মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে, তার পূর্ণ অঞ্জুলি পরিমাণও হারাম।

মোটকথা, মাদক দ্রব্য মাত্রই যে ইসলামে হারাম, তা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণা থেকেই প্রমাণিত। আর কারণও সাথে সাথেই বিবৃত হয়েছে। তা হচ্ছে, এই নেশাকারী জিনিস মানুষের পরস্পরে চরম শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করে, আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সালাত থেকেও মানুষকে বিরত রাখে। অন্য কথায়, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে যেমন সাধারণভাবে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা বা স্মরণে রাখা সম্ভব হয় না, তেমনি স্মরণের বিশেষ অনুষ্ঠান যে সালাত তা রীতিমত আদায় করাও তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব থেকে যায়। অথচ তা কোনক্রমেই কাম্য হতে পারে না। আল্লাহ্‌ই যখন সমগ্র বিশ্বলোক ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা, একমাত্র মা'বুদ তখন সাধারণভাবে সব সময়ই তাঁকে স্মরণ করতে হবে এবং তাঁকে স্মরণের জন্য যে সব অনুষ্ঠান তাঁরই কর্তৃক নির্ধারিত, তাও যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এই পথে কোন বাধা বাঞ্ছনীয় নয়, এই কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সব আড়াল উৎপাটিত করাই আল্লাহ্‌র বান্দাদের কর্তব্য। কিন্তু নেশা বা মাদক দ্রব্য এই কাজের প্রধান বাধাদানকারী। অতএব তার ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সংশয়ই থাকতে পারে না।

আরব কবি মাদক দ্রব্যের ক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন ঃ

شَرِبْتُ الْخَمْرَ حَتّٰى ضَلَّ عَقْلِىْ – كَذَاكَ الْخَمْرُ تَفْعَلُ بِالْعُقُوْلِ

www.pathagar.com

আমি মাদক দ্রব্য পান করেছি, ফলে আমার বিবেক-বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছে। আর মাদক দ্রব্য মাত্রই বিবেক-বুদ্ধির সহিত এইরূপ আচরণই করে থাকে।

মদ্যপান করলে ঈমান থাকে না, শুধু এতটুকুই নয়, মদ্যপানে মত্ত ব্যক্তি শত্রুর নিকট নিজেদের গোপন তত্ত্ব ও তথ্য অকপটে প্রকাশ করে দেয়। সে বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। মানুষ হারিয়ে ফেলে মনুষ্যত্ববোধ ও চেতনা।আর মানুষ যখন বিবেক-বুদ্ধিই হারিয়ে ফেলে, তখন তার ভাল-মন্দ জ্ঞানও সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। সে তখন বুঝতে পারে না কি তার জন্য কল্যাণকর, আর কি ক্ষতিকর। কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞানই হারিয়ে ফেলে। ন্যায়-অন্যায় বোধ পর্যন্ত কর্পূরের মত উড়ে যায়। তখন সে আকৃতিতে মানুষ, কিন্তু প্রকৃতি পশুতুল্য। তখন সে বড় বড় অপরাধ করে বসে। সাধারণত, ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও হত্যা করতে এবং যিনা-ব্যভিচার করতেও সে তখন দ্বিধা করে না। আপন পরের পার্থক্য বোধও থাকে না বলে সে নিকটাত্মীয়র উপরও আক্রমণ চালিয়ে বসতে পারে, তার আশংকা থাকে পূর্ণমাত্রায়। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই হযরত উসমান (রা) বলেছিলেন ঃ

اِجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَاِنَّهَا اُمُّ الْخَبَائِثِ

তোমরা সকলে সর্বপ্রকারের মাদক পরিহার কর। কেননা তা হচ্ছে সর্বপ্রকারের পাপ কাজের উৎস।

হযরত উসমান (রা) জনৈক মদ্যপায়ীর দুষ্কৃতির বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের পূর্বে এক ব্যক্তি ছিল। সে ইবাদত-বন্দেগী করত। একটি ভ্রষ্টা মেয়েলোক তার পিছনে লাগল এবং সে তার দাসী পাঠিয়ে লোকটিকে ডেকে নিল। লোকটি তার সাথে চলতে চলতে একটি ঘরে প্রবেশ করল। অমনি ঘরের কপাট বন্ধ করে দিয়ে সেই স্ত্রীলোকটি তাকে একটি শ্বেতশুভ্র মেয়েলোককে দেখালো। তার নিকট একটি বালক ও একটি মদের পাত্র রক্ষিত ছিল। স্ত্রীলোকটি বলল, আমি তোমাকে ডেকে এনেছি এজন্য যে, হয় তুমি এই মেয়েলোকটির সহিত সঙ্গম করবে, অথবা এই মদ্যপান করবে ; কিংবা এই বালকটিকে হত্যা করবে। এই তিনটি কাজের যে কোন একটি না করা পর্যন্ত তোমাকে যেতে দেয়া হবে না।

লোকটি নিরূপায় হয়ে ও কম মাত্রার পাপ, মনে করে বললো, আমাকে সুরা পান করতে দাও। তাকে সুরা পান করতে দেয়া হলো। সে বার বার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে মদপান করল। পরে সে মেয়েলোকটির সাথে সঙ্গম করল এবং বালকটিকে হত্যাও করল।

এই কাহিনী থেকে বোঝা গেল যে, মদ্য হচ্ছে সব দুষ্কৃতি ও যাবতীয় পাপ কাজের উৎস। অতএব তোমরা তা পরিহার কর। আল্লাহ্‌র কসম। ঈমান ও মদ্যপান এক হতে পারে না। হয় ঈমান থাকবে, না হয় চলে যাবে, থাকবে শুধু মদ্যপান।[১]

---

১. سنن انسائی ج ٨ ص ٣١٥

www.pathagar.com

মদ্যপান করলে ঈমান থাকে না, শুধু এতটুকুই নয়, মদ্যপানে মত্ত ব্যক্তি শত্রুর নিকট নিজেদের গোপন তত্ত্ব ও তথ্য অকপটে প্রকাশ করে দেয়। সে বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। মানুষ হারিয়ে ফেলে মনুষ্যত্ববোধ ও চেতনা।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন ঃ

মদ্যপায়ী বুদ্ধিমান লোকদের জন্য হাস্যরসের পাত্র হয়। সে মাতাল হয়ে স্বীয় মল-মূত্র নিয়ে খেলা করে। তা-ই চোখ-মুখে মাখে। অনেক সময় মূত্র মুখে মাখতে গিয়ে সে অযু করছে মনে করে অযুর দোয়া পড়তে শুরু করে। কুকুরও তার মুখ চাটে কখনও কখনও। আর সে কুকুরের জন্য দোয়া করে, আল্লাহ্ তোমাকে সম্মান দান করুন। মদ্যপানে যেমন বিবেক-বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়, তেমনি স্বাস্থ্যও নষ্ট হয়ে যায়।[১]

বস্তুত মানুষ মদের আঘাতের ন্যায় আর কখনই কোন আঘাত পায় না। পর্যবেক্ষণ চালালে দেখা যাবে, মদ্যপানের ফলে যত মানুষ পাগল হয় স্নায়ুবিক ও পেটের রোগে কঠিনভাবে আক্রান্ত হয়, ততটা আর কিছুতে হয় না। মদ্যপানে মত্ত হয়ে মানুষ অতি আপনজনকেও হত্যা করে বসে অনেক সময়। মদ্যপায়ী শেষ পর্যন্ত সর্বহারা হয়ে যায়। ঘরের জরুরী মূল্যবান জিনিস, স্ত্রীর মহামূল্য অলংকরাদি এবং মূল্যবান তৈজসপত্রও পানির দরে বিক্রি করে দিয়ে মদ্য ক্রয়ে বাধ্য হয়।[২] এ হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্ব। তাই ইসলামে বিশ্বাসী না হয়েও বহু রাষ্ট্র ও সরকার মদ্যপান নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী।

মদের ব্যবসায়

ইসলাম শুধু যে মদ্যপান হারাম করেছে তাই নয়, মদ্য উৎপাদন, মদের ব্যবসায়– তথা মদ্যকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হয় বা করার প্রয়োজন হয়, তার সবকিছুকেই সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে।

হযরত ইবনে উমর (রা) রাসূলে করীম (সা)-এর এই হাদীসটির বর্ণনা পেশ করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيْهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَ بَايِعَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهَا (سنن ابى داؤد ج ٢ ص ٣٩٢)

আল্লাহ্ তা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন মদের উপর, মদ্যপায়ীর উপর, মদ্য পরিবেশনকারীর উপর, তার ক্রয়কারীর উপর, তার বিক্রেতার উপর, তার উৎপাদনের কাজের উপর, তার উৎপাদন যে করায় তার উপর, তার বহনকারীর উপর এবং তা যার জন্য বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার উপর।

---

১. الجامع الاحكام القران ج ٣ ص ٥٢

২. الحلال و الحرام فى الاسلام ليوسف القرن ى ص ٦٢

www.pathagar.com

মদ্য নিষেধে ক্রমিক পদ্ধতি অবলম্বন

কোন কোন তাফসীর লেখক লিখেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম উম্মতের উপর সকল প্রকারের অনুগ্রহ দান করেছেন। এমন কোন মর্যাদা বা সম্মান ও কল্যাণ নেই যা থেকে তিনি এই উম্মতকে বঞ্চিত করেছেন। তাঁর বড় অনুগ্রহ ও কল্যাণ দানের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হচ্ছে, তিনি মুসলিম উম্মতের জন্য যে মহান শরীয়ত নাযিল করেছেন তার সমগ্র বিধানটি একযোগে নাযিল করেন নি। বরং ক্রমাগতভাবে শরীয়তের আইন জারী করেছেন। কোন বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ যেমন এক সঙ্গে জারী করেন নি, তেমনি কোন বিষয়ের চূড়ান্ত নিষেধের আইনও সম্যকভাবে একই দিন কার্যকর করেন নি। মদ্য সংক্রান্ত নিষেধবাণী বা তার হারামকরণও একই দিনে অবতীর্ণ হয়ে যায়নি।[১]

দীন ইসলাম যখন নাযিল হচ্ছিল, তখন সমস্ত মানুষ মদ্যপানের জন্য পাগল হয়েছিল। তা তখন তাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ ও তাদের বেঁচে থাকার জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে এই মারাত্মক জিনিসটিকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করতে বিজ্ঞানসম্মত ক্রমিক নিয়ম অবলম্বন করতে হয়েছে। কেননা এই জিনিসটিকে তখন যদি হঠাৎ করে হারাম ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতো, তা'হলে তা পালন করা তখনকার লোকদের পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে পড়ত। অনেকেই হয়ত তা গ্রাহ্যই করত না। হযরত আয়েশা (রা) এই পর্যায়ে বলেছেন ঃ

اَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيْهَا ذِكْرُا الْجَنَّةِ وَ النَّارَ حَتّٰى اِذَا ثَابَ النَّاسُ اِلَى الْاِسْلَامِ نَزَلَ الحَلَالُ وَ الْحَرَامُ وَ لَوْ نَزَلَ اَوَّلَ مَا نَزَلَ لاَ تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوْا لاَ نَدَعُ الْخَمْرَ اَبَدًا –

> কুরআন মজীদের প্রথম দিকে অবতীর্ণ আয়াত ও সূরাসমূহে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমানের উল্লেখ করা হয়েছে। তা গ্রহণ করে লোকেরা যখন ইসলামের দিকে ফিরে এল, তারপরে হালাল-হারামের বিধান অবতীর্ণ হলো। এ না হয়ে প্রথমে অবতীর্ণ আয়াতেই যদি বলা হতো, তোমরা মদ্যপান করো না তাহলে তারা অবশ্যই বলতো, আমরা কক্ষণই মদ্যপান ত্যাগ করবো না।[২]

বস্তুত জনগণের মধ্যে বিরাজমান নৈতিক রোগসমূহের বিরুদ্ধে ইসলাম এই পদ্ধতিতেই অভিযান চালিয়েছে এবং এভাবেই ক্রমিক ধারায় এক-একটি পাপ কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে করে যাবতীয় নৈতিক রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত সফলতা সহকারে

---

১. الجامع لاحكام القران القرطبى ج ٣ ص ٥٢

২. تفسر ال ت الاحكام للصابون ج ١ ص ٢٧٣

www.pathagar.com

সম্পন্ন করেছে। এই কারণেই দেখতে পাচ্ছি, শুধু মদ্যপানের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করার জন্য ইসলামকে চার পর্যায়ের চারটি আয়াত নাযিল করতে হয়েছে। মক্কা শরীফেই প্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয়, তা হচ্ছে ঃ

وَ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا (النحل – ٦٧)

এমনিভাবে খেজুরের গাছ ও আঙ্গুরের ছড়া থেকেও আমরা একটা জিনিস তোমাদের পান করাই, যাকে তোমরা মাদকেও পরিণত কর এবং উত্তম পবিত্র পানীয়ও তাতে রয়েছে।

এই আয়াতটিতে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, ফলের এই রসে মানুষের জন্য জীবনদায়ী খাদ্য হওয়ার যোগ্যতা যেমন রয়েছে, তেমনি তাতে পাবে আল্‌কোহলে পরিণত হয়ে মাদক হওয়ার যোগ্যতা। মূলত হালাল এই বস্তু থেকে মানুষ হারাম ও উত্তম কল্যাণকর 'রিযক্' গ্রহণ করবে, না বিবেক-বুদ্ধি স্বাস্থ্য বিনষ্টকারী মদ্যে পরিণত করবে, তা লোকদের রুচি ও সিদ্ধান্তের ব্যাপার। প্রসঙ্গত ইঙ্গিতে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, মদ্য পবিত্র রিযক্‌রূপে গণ্য হতে পারে না। তাই তা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

মদের প্রতি ঘৃণার বীজ লোকদের মনে বপন করাই ছিল এই প্রথমবারে অবতীর্ণ আয়াতটির মূল উদ্দেশ্য। অতঃপর মদীনীয় জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে ঃ

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا (البقره – ٢١٩)

লোকেরা তোমার নিকট মদ্য ও জুয়া সম্পর্কে জানতে চায়। তুমি বল এই দুইটি কাজে খুব বড় গুনাহ্ রয়েছে, লোকেদের উপকারও আছে বটে। তবে উপকারের তুলনায় গুনাহ্ অনেক বড়।

অন্য কথায় মদ্যপান ও জুয়া খেলায় কিছুটা ফায়দা ও উপকার যে আছে তা অস্বীকার করা হচ্ছে না। কেননা মদ্য ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ, জুয়া খেলায় জয়ী হলে বিপুল নগদ অর্থ হঠাৎ হাতে আসে। কিন্তু তাতে ক্ষতিকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দিক রয়েছে, তা উপকারের তুলনায় অনেক বেশি মারাত্মক ও পরিহারযোগ্য। এই কারণে তাতে নিহিত গুনাহ্ অনেক বড় ও বেশি।

এই কথাটুকু বলে মূলত তা যে হারাম ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা যে জিনিস অত্যন্ত ক্ষতিকর, তা অবশ্যই পরিহার যোগ্য, যদিও এই মুহূর্তে তা সম্পূর্ণ হারাম করা হচ্ছে না।

অতঃপর এই পর্যায়ে যে আয়াত নাযিল হয়, তাতে সালাত আদায়ের সময়কালে মদ্য পান করাকে স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পূর্বোদ্ধৃত ঘোষণাদ্বয়ের বাস্তব ও শুভ প্রতিক্রিয়া ঈমানদার লোকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বহু মদ্যপাগল লোকই

www.pathagar.com

তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপেই পরিহার করেছিল। কিন্তু তখনও তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষিত হয়নি। এই কারণে কেউ কেউ তা পানও করত এবং তা পানে মাতাল হওয়া অবস্থায় সালাতেও দাঁড়িয়ে যেত। ফলে তারা ঠিকভাবে সালাত আদায় করতে পারতো না। হয় ঢলে পড়ে যেত, না হয় কুরআনের আয়াত ভুল পড়ত। এইসব কারণে তৃতীয় পর্যায়ে একটি আয়াত নাযিল হয়।

আয়াতটি এই ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكَارٰى (النساء – ٤٣)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা মদ্য পানে মাতাল অবস্থায় সালাতের নিকটেও যাবে না।

এই আয়াতে সালাতকালীন সময়ে মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। কিন্তু সালাতকালীন সময়ের বাইরে অন্যান্য সময়ে—যখন ঠিক কাছাকাছি সময়ে সালাতে দাঁড়াতে হবে না—লোকেরা মদ্যপানে রত হলো। কেননা এই সময়ে মদ্যপান করা নিষিদ্ধ হয়নি। বলা যেতে পারে, এশা থেকে ফজর পর্যন্ত এবং ফজরের পর থেকে যুহর-এর পূর্ব পর্যন্তই হচ্ছে এই সময়। এভাবেই চলতে লাগল।

এই সময়ই হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) নিজের ঘরে একটি যিয়াফতের আয়োজন করেন। তাতে কয়েকজন আনসারী সাহাবা যোগদান করেন। তাঁদের সম্মুখে উটের মস্তক ভূনা করে পেশ করা হয়। তাঁরা খাওয়া শেষ করে মদ্যপান রত হলেন। মদের মাদকতায় মত্ত হয়ে কেউ কেউ হযরত সা'দকেই আঘাত করে। ফলে তাঁর নাকটি চূর্ণ হয়ে যায়। আর এই সময়ই অবতীর্ণ হয় মদ্যপান চিরতরে হারাম করার কুরআনী আয়াত ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الاَنْصَابُ وَ الاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

(المائده – ٩٠ – ٩١)

হে ঈমানদার লোকগণ ! মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান ও ভাগ্য পরীক্ষার কাজ নিঃসন্দেহে শয়তানী কাজের অপবিত্রতা। অতএব তোমরা সকলে তা সম্পূর্ণ পরিহার কর। তা'হলে সম্ভবত তোমরা কল্যাণ পাবে। মনে রেখ, শয়তান এই মদ্যপান ও জুয়া খেলার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরে চরম শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে সদা সচেষ্ট। সে তোমাদের বিরত রাখতে ইচ্ছুক সালাত ও আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, তোমরা কি এ কাজ থেকে বিরত থাকবে ?

www.pathagar.com

মদ্যপায়ীর শাস্তি

মদ্যপান ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি কঠিন গুনাহ্ এবং ফৌজদারী অপরাধরূপে গণ্য। এ জন্য শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তি দান একান্তই কর্তব্য। কিন্তু কুরআন মজীদে এর কোন শাস্তির উল্লেখ নেই। তবে ফিকাহ্বিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, মদ্যপায়ীর শাস্তি হচ্ছে দোর্‌রা। এই দোর্‌রা কতটি মারতে হবে, তার সংখ্যা ও পরিমাণ নিয়ে কিছুটা মত-পার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও তাঁদের সঙ্গীগণের মতে মদ্যপায়ীর শাস্তি হচ্ছে আশি দোর্‌রা। তাঁদের দলীল হচ্ছে হযরত উমর ফারুক (রা) সম্পর্কে বর্ণিত একটি বিবরণ। তিনি মদ্যপানের শাস্তি পর্যায়ে লোকদের নিকট পরামর্শ চেয়েছিলেন। তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বললেন ঃ

اَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ (احمد مسلم)

হালকাতম শাস্তি হচ্ছে আশি দোর্‌রা।

পরে হযরত উমর (রা) এই দণ্ডই কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন।[১] ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ ফিকাহ্বিদগণের মতে মদ্যপানের শাস্তি চল্লিশটি দোর্‌রা। দলীল হিসাবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) চল্লিশ দোর্‌রার শাস্তিই দিয়েছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও তা-ই কার্যকর করেছেন। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِى الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَ الْجَرِيْدِ اَرْبَعِيْنَ

(مسلم بشرح الندى ج)

নবী করীম (সা) মদ্যপানের শাস্তি হিসাবে জুতা ও খেজুরের ডালি দিয়ে চল্লিশটি আঘাত দিতেন।

হযরত সায়েব ইবনে যায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

كُنَّا نُؤْتَى بِا لشَّارِبِ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ و اِمْرَةِ اَبِىْ بَكْرٍ فَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ فَنَقُوْمُ اِلَيْهِ بِاَيْدِيْنَا وَ نِعَالِنَا وَ اَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ اٰخِرَ اِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَّدَ اَرْبَعِيْنَ حَتَّى اِذَا عَتَوْا وَ فَسَقُوْا جُلِدَ ثَمَانِيْنَ

(بخارى مع فتح البارى ج ١٢ ص ٦٦)

রাসূলে করীম (সা) হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতের শুরুতে মদ্যপায়ীকে আমরা ধরে আনতাম। অতঃপর তাকে আমাদের

১. نووى على سلم ج ١١ ص ٢١٥ نيل الارطار ج ٧ ص ١٤٦

www.pathagar.com

হাত দিয়ে, আমাদের জুতা দিয়ে ও আমাদের চাদর দিয়ে মারতাম। হযরত উমরের খিলাফতের শেষ দিকে চল্লিশটি দোর্‌রা মারা হইত। এমনকি যদি অবাধ্যতা দেখাতো ও সীমালংঘন করে যেত, তা হলে আশিটি দোর্‌রা মারা হতো।

হযরত মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

إِذَا شَرِبُوْا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوْا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُمْ

মদ্যপানকারীদের প্রথমে তৃতীয়বার পর্যন্ত শুধু দোর্‌রা মার। চতুর্থবারও পান করলে তাদের হত্যা কর।

এই হাদীসটি নাসায়ী ছাড়া অন্য পাঁচখানি গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এই বর্ণনাটি পর্যায়ে বলেছেন, এই আইনটা প্রথম দিক দিয়ে কার্যকর ছিল। পরে তা বাতিল হয়ে যায়।[১]

চুরির অপরাধ

ধন-মাল মানবজীবনের চালক, মেরুদণ্ড বিশেষ। বৈষয়িক জীবনের চাঞ্চল্য, চাক্‌চিক্য ও তৎপরতা ধন-মালের কারণে। মানব দেহে সঞ্জীবিত থাকার জন্য রক্ত যেমন অপরিহার্য, প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গে রক্তের প্রবাহ যেমন অনিবার্য, মানবজীবনে অর্থ ও সম্পদ ঠিক ততখানিই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম এই ধন-সম্পদ অর্জন ও ব্যয় ভোগের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করেছে। হালাল পথে উপার্জিত ধন-সম্পদকে হালাল ঘোষণা করেছে। আর হারাম পথে—অন্যায় ও যুলুমের মাধ্যমে আহরিত ধন-সম্পদকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে এবং পরকালে কঠিন ও অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয় দেখিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা তোমাদের ধন-মাল পরস্পরে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে তোমাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টি সম্মতিক্রমে ব্যবসায় হলে তা নিষিদ্ধ নয়। —সূরা নিসা ঃ ২৯

এই ধন-মাল চুরি করে করায়ত্ত করলে তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তা' হচ্ছে চুরি অপরাধের 'হদ্দ'। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

১. نيل الارطار ج ٧ ص ١٥٥

www.pathagar.com

পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। তারা যা উপার্জন করেছে, এটা তারই শাস্তি ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত। আর আল্লাহ্ দুর্জয়, সুবিজ্ঞানী।

—সূরা মায়িদা ঃ ৩৮

সাধারণত ধারণা করা হয় যে, মানুষ চুরি করে দারিদ্র্যের কারণে, ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা নেই বলে। কিন্তু ইসলাম তো এই ব্যাপারে পূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকই তার জীবিকা পাবে, তার মৌলিক প্রয়োজন পরিপূরিত হবে। কোন লোকই না খেয়ে থাকতে বা অভাব-অনটনে ছটফট করতে থাকতে বাধ্য হবে না। এই কারণে ইসলামী রাষ্ট্রে কারুরই চুর করার কোন আবশ্যকতা থাকতে পারে না। এইরূপ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও চুরি কাজে অগ্রসর হতে পারে কেবলমাত্র সেসব লোক যারা ধন-সম্পদের লোভী, যারা অধিক সম্পদ করায়ত্ত করার অভিলাষী, কিংবা যারা অন্যায় অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা অথবা পাপ পথে বেহিসাব অর্থ ব্যয় করার সুযোগের লালায়িত। অতএব তা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। এই কারণে ইসলামে চুরি সমর্থনীয় নয়, ইসলামী সমাজে চুরির কোন সুযোগ থাকতে পারে না। চুরির পথ ও কারণ সর্বাত্মকভাবে বন্ধ করা একান্তই আবশ্যক।

'চুরি'র সংজ্ঞা

'চুরি' কাকে বলে ? গোপনভাবে, অন্যকে না দেখিয়ে পরের ধন-সম্পদ করায়ত্ত করাই হচ্ছে চুরি। অন্যদের কথা-বার্তা তাদের অজ্ঞাতসারে শ্রবণ করাকে বলা হয় 'চুরি করে শোনা।' অন্যকে না জানিয়ে তাকে দেখা হচ্ছে চুরি করে দেখা। তবে কেড়ে নেওয়া ; ছিনিয়ে নেওয়া (Snatching) এবং আত্মসাতকরণ ও গচ্ছিত ধন অপহরণ (Embezzelment) 'চুরি' নয়, হাত কাটা তার শাস্তি নয়।

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ وَ لاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قِطْعٌ

খিয়ানতকারী ও অপহরণকারীর শাস্তি হাত কাটা নয়।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَصِبِ قِطْعٌ

জোরপূর্বক অপহরণকারীর শাস্তি হাত কাটা নয়।[১]

১. المغنى الشرح الكبير ج ١٠ ص ٢٣٩

www.pathagar.com

চুরির শাস্তি

চুরির শাস্তি হচ্ছে ডান হাত কাটা—যেমন পূর্বোদ্ধৃত আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় ও অকাট্যভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলের সুন্নাত এবং সকল ফিকাহবিদ ইমামের ঐকমত্য (اجماع) থেকেও তা-ই প্রমাণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

تُقْطَعُ الْيَدُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَار فَصَاعِدًا

'এক দীনার'-এর এক-চতুর্থাংশ বা তার উর্ধ পরিমাণ মূল্যের সম্পদ চুরি করলে তার শাস্তি স্বরূপ হাত কাটা যাবে।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ

اِنَّمَا اُهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَنَّـهُمْ اِذَا سَـرِقَ فِيْـهِمْ الشَّـرِيْفُ تَرَكُـوْهُ وَ اِذَا سَـرَقَ فِيْـهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ (بخارى - مسلم)

তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে এ জন্য যে, তাদের সমাজের ভদ্রব্যক্তি চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত, আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তারা তার হাত কেটে দিত।

মোটকথা চোরের হাত কাটা দণ্ড সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম উম্মতই সম্পূর্ণ একমত। এ হচ্ছে প্রথম বারে চুরি করার অপরাধের শাস্তি। দ্বিতীয় বারও চুরি করলে তার বাম পা কেটে ফেলতে হবে। আর তৃতীয় বারে চুরি করলে কি শাস্তি দেয়া হবে, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীন থেকে সে বিষয়ে দুইটি মত পাওয়া গেছে।

একটি মত হচ্ছে, তৃতীয় বারের চুরির শাস্তি স্বরূপ তার বাম হাত কাটার পরে কাটা হবে ডান পা।

আর দ্বিতীয় মত হচ্ছে, দ্বিতীয়বারের পরবর্তী চুরিতে তাকে আটক করে রাখতে হবে। তবে সেজন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে, যেগুলির অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরই সে দণ্ড কার্যকর করা যেতে পারে।

তবে সেই শর্তগুলির মধ্যে কয়েকটির ব্যাপারে পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে এবং কয়েকটির ব্যাপারে রয়েছে মতপার্থক্য।

এই শর্তগুলির একটি হচ্ছে, চোরকে 'পূর্ণ বয়স্ক, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ও শরীয়ত পালনে বাধ্য হওয়ার যোগ্য হতে হবে। চুরিকৃত মাল-সম্পদের কারুর মালিকানাধীন সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় চুরি হতে হবে। আর চুরিকৃত ধন-মালের মূল্য পরিমাণ হতে হবে তিন দিরহাম কিংবা এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদূর্দ্ধ। এইসব কয়টি শর্ত এক সাথে পূর্ণ না হলে 'হদ্দ' দণ্ড জারী হতে পারবে না। তখন 'তা'যীর' হিসাবে শাস্তি নির্ধারণের প্রয়োজন হবে।

www.pathagar.com

সমস্যার সমাধান

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, চুরির শাস্তি হাত কাটা ; কিন্তু অপহরণ-কারী বা আত্মসাৎকারীর জন্য কোন শাস্তি নেই। এটা একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার। এর জওয়াবে বলা যায়, চুরি ও অপহরণ বা বল প্রয়োগে আয়ত্তকরণের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অপহরণ ও আত্মসাৎকরণের ব্যাপারটি প্রায়ই প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়। তা থেকে বিরত রাখা অনেকটা সহজ হয় এবং তার প্রমাণ উপস্থিত করাও তেমন কঠিন ব্যাপার হয় না। কিন্তু চুরি হয় গোপনে, লোক চক্ষুর আড়ালে। ফলে তা প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই গোপনে সংঘটিত অপরাধটি যদি অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায়, তাহলে তার শাস্তি কঠিনতর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেন তা দেখে অন্যরা শিক্ষা পায়, সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করে। সাধারণত অপহরণের ব্যাপারটি ঘটে মালিকের অসতর্কতা বা জনসাবধানতার কারণে ও সুযোগে। ফলে তা আমানত আত্মসাৎকারীর সদৃশ হয়।

ইবনুল কায়্যেম লিখেছেন ঃ তিন দিরহাম মূল্যের সম্পদ চুরি করলে তার জন্য হাত কাটার শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে ; কিন্তু অপহরণ, আত্মসাৎকরণ ও বল প্রয়োগে করায়ত্তকরণ অপরাধে হাত কাটার শাস্তির ব্যবস্থা না করায় ইসলামী শরীয়তে নিহিত পরম যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। কেননা চোর থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। সে ঘরে সিঁদ কাটে, সর্বপ্রকার রক্ষামূলক ব্যবস্থাকে বানচাল করে, তালা ভাঙ্গে। ধন-সম্পদের মালিকরা তা থেকে প্রায়ই বাঁচতে পারে না। এরূপ অবস্থায় চুরির অপরাধে হাত কাটার দণ্ড না দিলে লোকেরা পরস্পরের ধন-মাল চুরি করে বিরাট ক্ষতি সাধান করতে পারে। চুরির দরুন লোকেরা কঠিন বিপদে পড়ে যেতে পারে। অপহরণকারী ও আত্মসাৎকারী এরূপ হয় না। কেননা লুটকারী জনগণের চোখের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে কার্য সম্পন্ন করে। ফলে তাকে হাতে-নাতে ধরা সম্ভব এবং যার সম্পদ লুণ্ঠিত হয়, তার হক্ আদায় করে দেয়া যায়। অথবা লুটকারীর বিরুদ্ধে সরকারের নিকট মামলাও দায়ের করা যায়। কিন্তু ছিনতাইকারী সম্পদের মালিকের নিকট থেকে তার অসতর্কতার মুহূর্তে হঠাৎ করে সম্পদ নিয়ে নেয়, তাতে মালিকের অসতর্কতাও অনেকটা দায়ী বলে ধরে নিতে হয়। অন্যথায় পূর্ণ সতর্কতা ও সংরক্ষণের নীতি অবলম্বন করা হলে ছিনতাই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু চোরের বাপারটি সে রকমের নয়। সে তো আত্মসাৎকারীর সদৃশ। আত্মসাৎকারী ধন-মাল আয়ত্তাধীন করে অরক্ষিত অবস্থায় থাকে বলে। কেউ যদি তোমাকে অসতর্ক করে ও আত্মসাৎ করে, তাহলে সে ব্যাপারটিতে কোন কিছুই অস্পষ্টতা থাকে না। লুটকারী অপেক্ষা তার হাত কাটাই যুক্তিযুক্ত। তাকে মারধর করা, দৈহিক শাস্তি দান, দীর্ঘকালীন কারারুদ্ধকরণ ও জরিমানার শাস্তি দানে সমাজের এসব শত্রুদের হাতকে আরও শক্তিশালী করা হয়।[১]

১. اعلام (لموقعين ج ٢ ص ٦٢

www.pathagar.com

ইসলাম-পূর্ব সমাজে হাত কাটার দণ্ড

জাহিলিয়তের যুগেও চোরের হাত কেটে দেওয়ার দণ্ড ব্যাপকভাবে পরিচিত ও সর্বজনজ্ঞাতভাবে কার্যকর ছিল। অলীদ ইবনে মুগীরাই সর্ব প্রথম হাত কাটার দণ্ড চালু করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামেও এই দণ্ড কার্যকর রাখেন।[১]

এই বর্ণনাও রয়েছে যে, জাহিলিয়তের যুগে কুরায়শরাই সর্বপ্রথম হাত কাটার দণ্ড কার্যকর করে। তারা বনু মলীহ ইবনে আরবী ইবনে খুযায়ার মুক্ত দাস দুবক নামক ব্যক্তির হাত কেটে দিয়েছিল। সে কা'বার সঞ্চিত সম্পদ চুরি করেছির।[২]

হাত কাটার নিয়ম

কোন চোরের অপরাধ প্রমাণিত হলে এবং তার হাত কাটার দণ্ডের ফয়সালা হয়ে গেলে তার হাত মনিবন্ধ বা কব্জা থেকে (carpat) কেটে ফেলতে হবে। কেননা কুরআন মজীদের আয়াত ঃ

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ (المائده – ٦)

'অতএব তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মসেহ কর'

—এর ব্যাখ্যায় নবী করীম (সা) হাতের উক্ত স্থানটিকেই চিহ্নিত করেছেন। আম্মার হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আপনি কি স্মরণ করতে পারেন, আমি ও আপনি একটা সফরে ছিলাম। (পানি ছিল না বলে ওযু করতে না পারার কারণে) আপনি নামায পড়লেন না। কিন্তু আমি বালুকা মর্দন করে পাক হয়ে নামায পড়লাম। পরে ব্যাপারটি নবী করীম (সা)-এর গোচরীভূত হলে তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তোমাদের এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এই বলে তিনি তাঁর দুইখানি কব্জা মাটিতে মিলিয়ে নিয়ে তাতে ফু-দিয়ে বালু কণা ঝেড়ে ফেলে দুই হাত তাঁর মুখমণ্ডল ও কব্জা দুইখানা মসেহ করলেন।[৩] এই বিবরণেও 'হাত' বলতে হাতের 'কব্জি'ই বুঝিয়েছেন।

হাতমুখ সহজ ও সম্ভবমত হালকাভাবে কাটতে হবে। তাকে বসাতে হবে, চেপে ধরতে হবে—যেন নড়া-চড়া না করে। হাত কাটার পর রক্ত বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় লোকটির জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট একজন চোরকে উপস্থিত করা হলো, সে একটি চোগা চুরি করেছিল। সে চুরির অপরাধ স্বীকার করলো।

---

১. الجامع الأحكام القران للقرطبى ج ٦ ص ١٦

২. تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٥

৩. بخارى ج ١ ٦٣

www.pathagar.com

তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ

اِذْهَبُوْا بِهِ فَاقْطَعُوْهُ ثُمَّ احْسِمُوْهُ ثُمَّ ائْتُوْنِىْ بِهِ

এই লোকটিকে লয়ে যাও, তার হাত কেটে ফেল। পরে তা ব্যাণ্ডেজ করে রক্তপাত বন্ধ কর এবং অতঃপর আমার নিকট উপস্থিত কর।

আদেশ পালনের পর তাকে রাসূলের সমীপে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন ঃ 'তুমি আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর'। সে তওবা করল। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ আল্লাহ্‌ও লোকটির তওবা কবুল করেছেন।[১]

মোটকথা, ইসলামে চোরের শাস্তি হাত কাটা। আধুনিককালের পাশ্চাত্য ধর্ম নিরপেক্ষবাদী ও সমাজতন্ত্রী অন্ধরা অবশ্য এই হাত কাটা আইনকে 'বর্বরতা' বলে বিদ্রুপ করতে কুণ্ঠিত হয় না। সুসভ্য ও সংস্কৃতি সম্পন্ন কোন সমাজের জন্য এই আইনকে তারা উপযুক্ত মনে করে না। তাদের ধারনা, এর ফলে সমাজে ব্যাপক পঙ্গুত্ব, বিকলাঙ্গতা ও কর্মে অক্ষমতা দেখা দিবে।

আসলে মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান ও সর্বোন্নত বিধানদাতা আল্লাহ্‌র আইনকে যারা-ই বর্বরতা বলে অভিহিত করে, তারাই বর্বর। যেসব অপরাধী সমাজের সাধারণ মানুষের ধন-মাল চুরি করে নিয়ে যায়, সে অপরাধীর প্রতি তাদের দয়া-সহানুভূতির বন্যা বয়ে যায়, আর নিরীহ শান্তি প্রিয় জনগণের জীবনে কঠিন ভীতি, সর্বস্বহীনতা ও শিশুদের কাতর চিৎকারের প্রতি তাদের মনে একবিন্দু দয়ার উদ্রেক হয় না। প্রকৃত বর্বর যে কে বা কারা, তা এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাদের এই মনোভাবের ফলে বরং দুর্বৃত্তরাই আসকারা পেয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ ও অসম্ভব করে তোলবার অবাধ সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু একজন চোরের হাত কাটা হলে গোটা সমাজই সম্পূর্ণরূপে বিপদমুক্ত হতে ও জনগণের ধন-মাল পূর্ণ নিরাপত্তা পেতে পারে। মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে। সমাজের উপর সঠিকভাবে সুবিচার ও ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। আসলে মানবতার প্রতি দয়া-অনুগ্রহ-সহানুভূতি থাকলে এই পন্থা ও ব্যবস্থাকে 'বর্বরতা' বলে উড়িয়ে না দিয়ে তা যথাযথরূপে কার্যকর করার জন্য উদ্যোগী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আসলে যে হাতটি পরের ধন-সম্পদ চুরির জন্য প্রসারিত হয়, সে হাতটিই রোগ জর্জর। তা পচে গেছে এবং অনতিবিলম্বে তা মূল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা না হলে গোটা দেহ সংস্থাকেই রোগ জর্জরিত করে ছাড়বে, পচিয়ে দেবে। চোরের চুরি করতে গিয়ে অনেক সময় ধরা পড়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটাতেও কসুর করে না। তাও যে একটা কঠিন বিপদের ব্যাপার, সে কথা কোনক্রমেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

---

১. بخارى ج ١ ص ٦٣

www.pathagar.com

আরও একটি কথা বিবেচ্য। যেসব দেশে শরীয়তের আইন কার্যকর এবং যে কারণে চোরের যে হাত কাটা হয়, তা সর্বতোভাবে নগণ্য। আর তার বিপরীতে যেসব দেশে শরীয়তের আইন জারী নেই বলে চোরের হাত কাটা হয় না, সেসব চৌর্যবৃত্তির কত যে উৎকর্ষ হয়েছে এবং চুরি শিল্পের কত যে নতুন নতুন ফন্দি ও উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। এসব দেশে চোরদের একদিকে গ্রেফতার করা হয়, অপরদিকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। অথবা কিছুদিনের জন্য কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। হয়ত জেল চোরদের দ্বারা ভর্তিই হয়ে যায় কোথাও কোথাও। আর অপরদিকে মানুষের জীবনে নিরাপত্তা বলতে কিছুই থাকে না। এই পর্যায়ে মিসরীয় উচ্চ আদালতের এককালের বিচারপতি শহীদ আব্দুল কাদের আওদাহ লিখেছেন ঃ

ইসলামী শরীয়তে চুরির যে শাস্তি বিধান করা হয়েছে, উপরোক্ত তত্ত্বই হচ্ছে তার ভিত্তি। আমার জীবনের দোহাই দিয়ে বলছি, এই সর্বোত্তম ভিত্তির উপরই পৃথিবীর প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত চুরির শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। ইসলামী শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তির চিরকালীন সাফল্যের মূলে নিহিত কারণও তাই। আর একালের হিজাযে (সৌদী আরবে) এই শাস্তির অপূর্ব ও স্পষ্ট সাফল্যও এর বিশেষত্বের একটি অকাট্য প্রমাণ। তারই ফলে সমগ্র দেশ থেকে বিপর্যয়, অস্থিরতা, অ-নিরাপত্তা এবং লুণ্ঠন ও চুরি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে গেছে। তদস্থলে একটা পূর্ণ শৃঙ্খলা, শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে সর্বত্র।[১]

সশস্ত্র ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীর শাস্তি

যেসব লোক সশস্ত্র হয়ে পথে-ঘাটে, ঘরে-বাড়িতে, নদীতে-মরুভূমিতে নিরস্ত্র মানুষের উপর হামলা চালায় এবং প্রকাশ্যভাবে জনগণের সম্মুখে জনগণের ধন-মাল হরণ করে লয়ে যায়, কুরআন মজীদের আয়াতে তাদেরই বলা হয়েছে 'মুহারিবুন' (محاربون)।[২]

যেসব লোক শহর-নগর-গ্রাম-জনপদের মধ্যে সশস্ত্র লুণ্ঠন করে, তাদের 'মুহারিব' বলা যায়, কি যায় না, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ পেয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এরা 'মুহারিব' নয়। তারা 'গচ্ছিত ধন অপরহরণকারী বা আত্মসাৎকারীর মত। কেননা যারা জনপদের অধিবাসী, তারা আক্রমণকালে প্রায়শই চিৎকার করতে পারে। চিৎকার শুনে খুব কাছাকাছি থেকে জনগণ এসে জড় হতে পারে। তখন স্বাভাবিকভাবে হামলাকারীদের দাপট খতম হয়ে যায়।

---

১. التشريع الجنائى ج ١ ص ٦٥٣ – ٦٥٤

২. المغنى الشرح لكبير ج ١٠ ص ٣٠٣

www.pathagar.com

কিন্তু জমহুর আলেমগণ মনে করেন, জনপদ ও নদী-ভূমির নির্জন স্থানের মধ্যে মূলত পার্থক্য কিছুই নেই। কেননা কুরআনের আয়াত সকল প্রকারের 'মুহারিব'—সশস্ত্র আক্রমণকারীকেই শামিল করেছে। দ্বিতীয়ত জনপদের মধ্যে এ ধরনের আক্রমণ অধিক ভয়ের কারণ ও বেশি ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে। কেননা জনপদ হচ্ছে শান্তি-নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার ক্ষেত্র। লোকদের সাহায্য সহযোগিতা চাওয়ার ও পাওয়ার পরিবেশ বিরাজমান। এরূপ স্থলে সশস্ত্র আক্রমণ ব্যাপক প্রস্তুতিসহ এবং তীব্র ও প্রচণ্ড হওয়াই স্বাভাবিক। উপরন্তু তারা লোকদের ঘরে বা দোকানে আক্রমণ চালিয়ে যথাসর্বস্ব অপহরণ করে নিয়ে যায়। কিন্তু নদীতে মরুভূমির নির্জন পরিবেশে আক্রমণ খুব প্রচণ্ড হয় না, আর সর্বস্ব হারাবারও ভয় থাকে না। কেননা তথায় লোকেরা পথযাত্রী। আর পথযাত্রী অবস্থায় তার সাথে খুব সামান্য সম্পদ থাকাই কল্পনীয়।

'মুহারিবের শাস্তি

ইসলামী শরীয়তে 'মুহারিব' বা 'সশস্ত্র' আক্রমণকারীর জন্য চার পর্যায়ের শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তা হচ্ছে, হত্যা বা শূলবিদ্ধকরণ অথবা হাত ও পা বিপরীত পরস্পরায় কেটে ফেলা, কিংবা দেশ থেকে চির নির্বাসন।

এই পর্যায়ের মূল দলীল হচ্ছে এই আয়াত ঃ

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعُ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِى الاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

যেসব লোক আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং পৃথিবী—জনসমাজে বিপর্যয় সৃষ্টির লক্ষ্যে চেষ্টা ও তৎপরতা চালায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে—তাদের হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত পরস্পরায় কেটে ফেলা হবে কিংবা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এই লাঞ্ছনা ও অপমান তো তাদের জন্য এই দুনিয়ায়। আর পরকারে তাদের জন্য তা থেকেও অনেক বড় শাস্তি রয়েছে। —সূরা মায়িদা ঃ ৩৩

আয়াতে চার প্রকারের শাস্তির ব্যবস্থা ঘোষিত হয়েছে সেসব লোকের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে মুহারিবা করে। আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে 'মুহারিবা' অর্থ আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও রাসূলের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুহারিবা।

www.pathagar.com

আয়াতে যে চারটি শাস্তির উল্লেখ হয়েছে, তা অপরাধ অনুপাতে প্রয়োগ করা হবে, তা এর যেকোন একটা প্রয়োগ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, এই বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। জমহুর আলিমগণ মনে করেন, অপরাধ অনুপাতে এই শাস্তিসমূহের কোন একটি প্রয়োগ করতে হবে। যে হত্যা করল, ধন-মাল অপহরণ করলো না, তাকে হত্যা করা হবে। আর যে ধন-মাল অপহরণ করল, কিন্তু হত্যাকাণ্ড ঘটালো না, তার ডান হাত ও বাম পা কেটে ফেলা হবে। যে লোক হত্যাকাণ্ড ঘটালো ও ধন-মালও অপহরণ করলো, তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে, যেন সব লোক ভালোভাবে জানতে পারে। আর যে লোক শুধু ভয় প্রদর্শন করলো, কিন্তু হত্যা বা ধন-মাল অপহরণের কিছুই করলো না, তাকে নির্বাসিত করা হবে।

কিছুসংখ্যক ফিকাহবিদের মত হচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধান এ চারটি শাস্তির যে কোন একটি এই পর্যায়ের যে কোন অপরাধে প্রয়োগ করতে পারেন। তা নির্নীত হবে কৃত অপরাধের দৃষ্টিতে। ইমাম মালেক (র) রায় দিয়েছেন, যে হত্যা করেছে, শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যাই করতে হবে। তার হাত-পা কাটা চলবে না, নির্বাসিতও করা যাবে না। তবে তাকে হত্যা করা ও শূলে চড়ানোর মধ্যে কোন একটি করার ইখতিয়ার রাষ্ট্র প্রধানের রয়েছে। আর যদি শুধু ধন-মাল অপহরণ করে, হত্যা না করে, তাহলে তাকে নির্বাসিত করার ইখতিয়ার নেই। তখন উক্ত চারটি দণ্ডের মধ্যে যেকোন একটি প্রয়োগ করার ইখতিয়ার থাকবে। তবে যদি শুধু ভয় প্রদর্শনের কাজ করে তাহলে তাকে হত্যা করা বা শূলবিদ্ধ করা ; কিংবা হাত-পা কাটা বা নির্বাসিত করা–এর যেকোন একটি করার ইখতিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের থাকবে। এই ইখতিয়ার থাকার তাৎপর্য হচ্ছে, এই পর্যায়ে রাষ্ট্র প্রধান (আইন পরিষদ)-কে ইজতিহাদ করতে হবে। 'মুহারিব' ব্যক্তি যদি বিবেক-বুদ্ধি ও ব্যবস্থাপনাযোগ্যতা সম্পন্ন হয়, তাহলে ইজতিহাদের লক্ষ্য বা কেন্দ্রবিন্দু হবে তাকে হত্যা করা কিংবা শূলবিদ্ধ করা। কেননা তার হাত ও পা কাটা হলে তার ক্ষতি নিঃশেষ হয়ে যাবে না। আর লোকটি যদি বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন না হয়, হয় দৈহিক সুস্বাস্থ্য ও শক্তি সম্পন্ন, তাহলে বিপরীত পরম্পরায় তার হাত ও পা কাটা হবে। আর এই দুইটি বিশেষত্বের কোন একটিও তার না থাকলে তার জন্য হালকা শাস্তি নির্ধারণ করা চলবে।—যেমন মারধর ও নির্বাসন।[২] আসলে আয়াতটি বর্ণনা পদ্ধতির কারণেই এই মত পার্থক্য। কাজেই এ পর্যায়ে ইজতিহাদ করার অবকাশ চিরন্তন।

---

১. المغنى ج ١٠ ص ٣٠٤

২. بداية المجتهد ج ٢ ص٤٥٥

www.pathagar.com

তওবা করলে কি শাস্তি রহিত হবে

সাধারণভাবে ফিকাহবিদগণ মত পোষণ করেন যে, সশস্ত্র আক্রমণকারী বিপর্যয়কারী লোকেরা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ার পূর্বেই যদি এই পাপ কাজ থেকে তওবা করে, তাহলে তাদের এই তওবা তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি থেকে তাদের নিষ্কৃতি দিবে। হত্যা, শূলবিদ্ধকরণ, হাত-পা কর্তন বা নির্বাসন—এর যে কোন দণ্ডই কারোর জন্য সাব্যস্ত হলে এই তওবার দরুন তা রহিত হয়ে যাবে। কেননা উপরে যে আয়াতটি উদ্ধৃত হয়েছে, তার পরবর্তী আয়াতে তা-ই বলা হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

কিন্তু তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বেই যারা তওবা করলো, (তাদের জন্য এই শাস্তি নয়) তোমরা অবশ্যই জানবে যে, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, সবিশেষ দয়াবান। —সূরা মায়িদা ঃ ৩৪

এ আয়াতে যে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, ঐ অপরাধের দরুন আল্লাহ্র নাফরমানী যতটা করেছে, তার জন্য। কিন্তু তার সহিত জনগণের অধিকার পর্যায়ের যা কিছু সংশ্লিষ্ট—প্রাণ নাশ, যখম ও ধন-মাল লুট ইত্যাদি—তা কখনই ক্ষমা পাবে না। আল্লাহ্ মাফ করবেন না। সে ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট লোকদের সহিত জড়িত। তারা ইচ্ছে করলে দাবি পেশ করবে, অন্যথায় প্রত্যাহার করবে। ওরা কাউকে হত্যা করে থাকলে তাকে হত্যা করার দণ্ড রহিত হবে বটে ; কিন্তু রক্তমূল্য—দিয়েত বা কিসাস—ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবে, নতুবা তার দাবি পেশ করবে।[১]

সশস্ত্র হামলার অপরাধ ছাড়া অন্যান্য কোন অপরাধে কারোর উপর 'হদ্দ' হওয়া সাব্যস্ত হলে তওবা তা রহিত করে কিনা, সে বিষয়ে ফিকাহ্বিদদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। জমহুর ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন, এই পর্যায়ের 'হদ্দ' রহিতকরণে তওবার কোন ক্রিয়া বা প্রভাব নেই। কেননা 'হদ্দ' ওয়াজিব হয় যেসব কাজে, সেই কাজ করলে 'হদ্দ' কায়েম করা সম্পর্কে যে কুরআন ও হাদীসের ঘোষণা এসেছে, তা সবই সাধারণভাবে প্রযোজ্য। তওবার দরুন 'হদ্দ' রহিত যদি হ'তই তাহলে তা নিশ্চয়ই শরীয়তদাতা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতেন—যেমন 'মুহারিব'—সশস্ত্র হামলা সম্পর্কিত উপরোদ্ধৃত আয়াতের পরে পরেই বলে দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সা) মায়েয ও গামেদীয়ার উপর 'রজম' হদ্দ কার্যকর করিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ীর প্রখ্যাত মত এবং ইমাম আহমদের বর্ণিত মতে আল্লাহ্র হক্ হিসাবে ওয়াজিব 'হদ্দ' তওবার কারণে রহিত হতে পারে। এ পর্যায়ে তাঁরা কয়েকটি দলীল পেশ করেছেন ঃ এখানে তার উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

---

১. المغنى الشرح الكبير ج ١٠ ص ٣١٤

www.pathagar.com

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَ الَّذَانِ يَاتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ج فَاِنْ تَابَا وَ اَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْـهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَـانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

আর তোমাদের মধ্য থেকে যে দুইজন এই পাপ কাজটি করবে, সেই দুইজনকে কষ্ট দাও। তারা দুইজন তওবা ও সংশোধন করে নিলে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। —সূরা নিসা ঃ ৬

২. চোরের 'হদ্দ' বলার পরই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِه وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

কোন লোক যুলুম করার পর যদি তওবা করে ও সংশোধন করে নেয়, তা হলে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বিশেষ দয়াবান। (আয়াতে যুলুম বলতে নিশ্চয়ই চুরি করাকে বোঝানো হয়েছে।)

—সূরা মায়িদা ঃ ৩৯

৩. মায়েয দণ্ড দেয়ার সময় পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। এই সংবাদ পাওয়ার পর নবী করীম (সা) বলেছিলেন ঃ

هَلْ تَرَكْتُمُوْهُ لَعَلَّهُ يَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ

তোমরা তো তাকে ছেড়ে দিতে পারতে ? সম্ভবত সে তওবা করতো এবং আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করতেন ?

উপরোদ্ধৃত দু'টি আয়াত ও একটি হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, 'হদ্দ' যোগ্য অপরাধ করার পরও তওবা করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা সে তওবা কবুল করবেন এবং অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া এই মতই গ্রহণ ও প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

وَ مَنْ تَابَ مِنَ الزِّنَا وَ السَّرْقَةِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ قَبْلَ اَنْ تَرْفَعَ اِلَى الاِمَامِ فَالصَّحِيْحُ اَنَّ الْحَدَّ يَسْقِطُ عَنْهُ كَمَا يُسْقِطُ عَنِ الْمُحَارِبِيْنَ اِجْمَاعًا اِذَا تَابُوْا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ ه

প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট মামলা দায়ের হওয়ার পূর্বেই যদি কেউ যেনা, চুরি ও মদ্য পান থেকে তওবা করে ও বিরত হয়, তাহলে সহীহ্ কথা হচ্ছে, তার উপর ধার্য 'হদ্দ' রহিত হয়ে যাবে, যেমন সর্বসম্মতভাবে 'মুহারিবের' 'হদ্দ' রহিত হয়ে যায় গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তওবা করলে।[১]

১. مجموع الفتاوى لابن تيميه ج ٤

www.pathagar.com

ইমাম কুরতুবী লিখেছেন ঃ

فَاَمَّا الشُّرَّابُ وَ الزَّنَاةُ وَ السُّرَّاقُ اِذَا تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ عُوِفَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ ثُمَّ رُفِعُوْا اِلَى الاِمَامِ فَلاَ يَنْبَغِىْ لَهُ اَن يُّحَدَّهُمْ وَ اِنْ رُفِعُوْا اِلَيْهِ فَقَالُوْا تُبْنَا لَمْ يَتْرُكُوْا وَ هُمْ فِىْ هٰذَا الْحَالِ كَالْمُحَارِبِيْنَ اِذَا غُلِّبُوْا

মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী ও চোর লোকেরা যদি তওবা করে ও সংশোধিত হয়ে যায়, আর তা সকলে জানতে পারে, তারপর যদি তার মামলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ের হয়, তাহলে তখন তাদের উপর 'হদ্দ' জারী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আর যদি মামলা দায়ের হওয়ার পর এই লোকেরা অনুরূপ কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় বলে যে, আমরা এখন তওবা করছি, তা'হলে তাদের ছেড়ে দেয়া হবে না—যেমন 'মুহারিব' লোকেরা ধৃত হওয়ার পর এইরূপ বললে (ছেড়ে দেয়া হবে না) তখন তার তওবাকে কৃত্রিম গণ্য করা হবে।[১]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম লিখেছেন ঃ

মুহারিব গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তওবা করলে তা গণ্য হবে তাদের অপরাধ সাংঘাতিক হওয়া সত্ত্বেও। আর তাই জানিয়ে দেয় যে, মুহারিবা—সশস্ত্র আক্রমণের তুলনায় ছোট অপরাধে তওবা দ্বারা 'হদ্দ' অবশ্যই এবং অতি উত্তমভাবে রহিত হবে।[২]

সশস্ত্র আক্রমণের 'হদ্দ' জারী হবে। কেননা তার ক্ষতি তীব্র ও সংক্রামক। অতএব সশস্ত্র আক্রমণ অপেক্ষা নিম্নতম অপরাধ তওবা গৃহীত হওয়া অধিক উত্তম ভাবে সম্ভব।

শেষ পর্যন্ত লিখেছেন ঃ মায়েয তওবাকারী হয়ে এবং গামেদীয়াও তওবাকারী হিসাবেই এসেছিল। তা সত্ত্বেও দু'জনের উপরই 'হদ্দ' কার্যকর করা হয়েছিল। জওয়াবে বলা হয়েছে, হ্যা, সন্দেহ নেই, তারা দু'জনই তওবাকারী অবস্থায় এসেছিল এবং এতেও সন্দেহ নেই যে, তা সত্ত্বেও তাদের দু'জনার উপরই 'হদ্দ' কার্যকর করা হয়েছিল।

উপরোদ্ধৃত দ্বিতীয় মতের পক্ষের লোকেরা এটাকেই দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। এই বিষয়ে ইবনে তাইমিয়ার নিকট প্রশ্ন করায় তিনি যে জওয়াব দিয়েছিলেন, তার সারকথা এই যে, 'হদ্দ' হচ্ছে পবিত্রকারী, তওবাও পবিত্রকারী। আর দু'জনই শুধু তওবার পবিত্রতার পরও 'হদ্দ'-এর পবিত্রতা অর্জন করতে প্রস্তুত হয়েছিল। 'হদ্দ'-এর পবিত্রতা গ্রহণ না করে থাকতে তারা অস্বীকার করেছিল। নবী করীম (সা) তাদের দাবি কবুল করেছিলেন।

---

১. الجامع لاحكام القران ج ٦ ص ١٥٨

২. الام الموتعين ج ٣ ص ١٩

www.pathagar.com

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ফতোয়ার গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'হদ্দ' বা তা'যীর-এর শাস্তিসমূহ যখন অকাট্য দলীল প্রমাণে সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর কার্যকর করা হয়....যার উপর তা সাব্যস্ত হয় সে যদি তওবা করে, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না, 'হদ্দ' কার্যকর হবে। আর সে স্বতঃই তওবাকারী হয়ে আসলে ও স্বীকারোক্তি করলে ইমাম আহমাদের বাহ্যিক মতে তা কার্যকর করা হবে না।[১]

তা'যীর পর্যায়ের অপরাধ

'তা'যীর' হওয়ার অপরাধ সেগুলি, যেসব অপরাধে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তির বা কোন কাফ্ফারার ব্যবস্থা শরীয়তে করে দেয়া হয়নি। মিথ্যা সাক্ষ্য দান, ঘুষ গ্রহণ, সুদী কারবার বা লেনদেন করা, আমানতে খিয়ানত করা, পণ্যদ্রব্যে বা ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা প্রতারণা করা, অপরাধীদের আত্মগোপনে সাহায্য করা, যিনা ছাড়া অন্য কোন অপরাধ মিথ্যামিথ্যিভাবে কারো উপর আরোপ করা এবং নামায, রোযা, যাকাত প্রভৃতি ফরয কাজ ত্যাগ করা প্রভৃতি অপরাধ এই পর্যায়ে গণ্য। যেসব অপরাধে 'হদ্দ' সুনির্দিষ্ট, কিন্তু তার প্রমাণের জন্য জরুরী শর্তসমূহ পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়নি, তাও এই পর্যায়েই গণ্য। যেমন নিসাব পরিমাণের কম মূল্যের দ্রব্য চুরি এবং অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা দ্রব্য চুরি করা প্রভৃতি।

তা'যীর কয়েক প্রকারের

তা'যীর কয়েক প্রকারের। প্রথম দিকে রয়েছে কঠোর সরকারী ভর্ৎসনা (Reprimand) ভীত-সন্ত্রস্তকরণ (Threatening) আধুনিক ভাষায় মুচলেকা আর শেষের দিকে রয়েছে বড় বড় অপরাধে হত্যা। দোর্‌রা আটক, আর্থিক জরিমানা, চাকুরী বিচ্যুতি, দেশ থেকে বিতাড়ন এবং অপরাধী সম্পর্কে ঢোল-শহরত করে লোকদের জানিয়ে দেয়া প্রভৃতি তা'যীরেরই বিভিন্ন শাস্তি। এগুলো অনির্দিষ্ট শাস্তি। অপরাধের বড়ত্ব ক্ষুদ্রত্বের বিচারে অপরাধের বিভিন্ন মাত্রা এবং অপরাধীর অবস্থা ও পূর্বাপর পরিস্থিতি এবং অপরাধের বৈচিত্র্য বিপুলতা প্রভৃতি দৃষ্টিতে উপরেদ্ধৃত শাস্তিসমূহের মাত্রা ও রকম বিভিন্ন হতে বাধ্য। আর তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। অন্য কথায় ইসলামী আইন পরিষদ অপরাধীর অবস্থা, তার মনস্তত্ত্ব ও অপরাধের পরিমাণ বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে শাস্তি নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করবে এবং বিচার বিভাগ বিভিন্ন অবস্থায় উপযোগী শাস্তি প্রয়োগ করবে। তাতে পরিমাণ ও প্রকারের দিক দিয়ে অপরাধীর অবস্থার সহিত মাধুর্যপূর্ণ শাস্তি নির্ধারিত করতে হবে।

---

[১] الجامع لاحكام القران للقرعبى ج ٦ ص ١٥٨

www.pathagar.com

তা'যীরের মৃত্যুদণ্ড

কতিপয় বড় বড় ও ভয়াবহ অপরাধে তা'যীর স্বরূপ অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দান করা বৈধ হবে বলে বিপুল সংখ্যক শরীয়ত বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন। যেসব ব্যক্তি উক্ত পর্যায়ের অপরাধ বারবার করেছে, তাদের জন্যও এই শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে বলে তাঁরা মত দিয়েছেন। যেমন কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের জন্য গোয়েন্দাগিরি করে কিংবা কেউ যদি কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী বিদ্‌আতের আহ্বান জানায় বা তার প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাহলে তাকে অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে।[১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন ঃ হানাফী মযহাবের একটি মৌলনীতি হলো, যেসব অপরাধে তাঁদের মতে হত্যা শাস্তি হয় না—যেমন ভারী জিনিস দ্বারা হত্যা বা কোন মেয়েলোকের সহিত স্ত্রী অঙ্গের পরিবর্তে অন্যত্র যৌন সঙ্গম করলে কিন্তু তা যখন বারবার করা হয়, তখন সে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দান করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কোন নির্দিষ্ট শাস্তি বা 'হদ্দ'-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দিলে বা তাতে কল্যাণ নিহিত মনে করা হলে তাও করা সঙ্গত। নবী করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) কর্তৃক এই ধরনের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার যে বর্ণনা পাওয়া গেছে, তাকে তাঁদের উক্ত মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। এরূপ হত্যার নাম দিয়েছেন রাজনৈতিক হত্যা বা রাজনৈতিক কারণে মৃত্যুদণ্ড দান।[২]

উক্ত পর্যায়ের কতিপয় বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

১. আরফাজাতা আল্-আশ্‌জাঈ বলেছেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ اَتَاكُمْ وَ اَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَّاحِدٍ يُرِيْدُ اَن يَّشُقَّ عَصَاكُمْ اَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ (مسلم)

তোমরা যখন এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন ঐক্যবদ্ধ, তখন কেউ যদি তোমাদের ঐক্য ভঙ্গ করতে ও তোমাদের ঐক্যবদ্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করতে সচেষ্ট হয়, তা'হলে তাকে হত্যা কর।

অপর একটি বর্ণনার ভাষা এইরূপ ঃ

سَتَكُوْنُ هُنَات وَ هُنَات فَمَنْ اَرَادَ اَن يُّفَرِّقَ اَمْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ (مسلم)

---

১. السياسة الشرعيه ص ١١٤

২. ঐ ৬২-৬৪

www.pathagar.com

খুব শীঘ্রই খুব খারাপ অবস্থা দেখা দিবে। অতএব কেউ যদি এই উম্মতের ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় তা ছিন্নভিন্ন করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে তার উপর তরবারির আঘাত কর—সে যে-ই হোক-না কোন।

২. দায়লাম আল-হিম্ইয়ারী (রা) বলেছেন ঃ

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا بِاَرْضٍ نُمَالِجُ بِهَا عَمَلاً شَدِيْدًا وَ اِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنَ الْقَمْحِ نَتَقَوَّىْ بِهِ عَلَى اَعْمَالِنَا وَ عَلَى بَرْدِ بِلاَدِنَا فَقَالَ هَلْ يَبْكُرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوْهُ قُلْتُ اِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِهِ قَالَ فَاِنْ لَمْ يَتْرُكُوْهُ فَاقْتُلُوْهُمْ (اسياسة الشرعيه ص ١١٦)

আমি রাসূলে করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, বললাম, হে রাসূল ! আমরা এমন একটি দেশের অধিবাসী, যেখানে আমরা কঠোর কষ্টদায়ক কাজের সম্মুখীন হই এবং শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে আমরা গম থেকে এক প্রকারের পানীয় তৈরি করে থাকি। তার ফলে আমাদের দেশের শৈত্য ও শীতলতা থেকে রক্ষা পাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে কি নেশা হয় ? বললাম হ্যা। বললেন, তাহলে তোমরা তা পরিহার কর। বললাম, লোকেরা তো তা পরিহার করবে না। তখন বললেন ঃ তারা তা ত্যাগ না করলে তোমরা তাদের হত্যা কর।

৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন ঃ

اَلْمُفْسِدُ كَالصَّائِلِ اِذَا كَمْ يَنْدَفِعْ الصَّائِلُ اِلاَّ بِالقَتْلِ قُتِلَ

বিপর্যয় বিশৃঙ্খলাকারী আক্রমণকারীর মতই। আর আক্রমণকারীকে হত্যা না করা হলে সে যদি বিরত বা দমন না-ই হয়, তা'হলে তাকে হত্যা করা হবে।[১]

তা'যীর হিসাবে মারধর করার ব্যাপারে ইসলামী আইন পারদর্শীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে তার মাত্রা বা পরিমাণ সম্পর্কে তিনটি কথা বলা হয়েছে।

প্রথম কথা, মারধর দশ দোর্রার বেশি হতে পারবে না। কেননা নবী (সা) বলেছেন ঃ

لاَ تَجْلِدُوْا فَوْقَ عَشَرَةَ اَسْوَاطٍ اِلاَّ فِى حُدُوْدِ اللهِ (بخارى مسلم)

তোমরা দশটির অধিক চাবুক মারবে না। তবে আল্লাহ্র 'হদ্দ' হলে অন্য কথা।

দ্বিতীয় কথা, শরীয়ত সম্মত কম-সে-কম পরিমাণের 'হদ্দ' পর্যন্ত তা পৌঁছবে না।

১. السياسة الشرعية ص ١١٦

www.pathagar.com

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম আহমাদের সঙ্গীদের অধিকাংশেরই এই মত। এই পর্যায়ের হাদীস হচ্ছে ঃ

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِىْ غَيْرِ حَدٍ فَهُوَمِنَ الْمُعْتَدِيْنَ

যে অপরাধে 'হদ্দ' নেই, তাতে সেই 'হদ্দ' পরিমাণ শাস্তি দিলে সে সীমালংঘনকারী হবে।

তৃতীয় কথা, তা'যীর হিসাবে মারধরের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। প্রয়োজন হলে 'হদ্দ'-শাস্তিরও অধিক শাস্তি দেয়া যাবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা এই মতের সমর্থক। কিন্তু যে অপরাধে শাস্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট, তা'যীরের শাস্তি সেই পরিমাণের হতে পারবে না। যেমন, নিসাব পরিমাণের কম মূল্যের সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা তার তা'যীরী শাস্তি হবে না। যিনা ছাড়া অন্য অপরাধের মিথ্যা দোষারোপে (القذف) যিনার মিথ্যা দোষারোপের শাস্তি দেয়া যাবে না।

এই মতের দলীল হচ্ছে ঃ

১. যে ব্যক্তির স্ত্রী তার নিজের ক্রীতদাসীকে তার স্বামীর জন্য 'হালাল' করে দিয়েছে, সেই স্বামীকে একশটি দোর্‌রা মারার জন্য নবী করীম (সা) আদেশ করেছেন। আবার সন্দেহের কারণে সেই 'হদ্দ' থেকে তাকে নিষ্কৃতিও দিয়েছেন।

২. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর ফারুক (রা) দু'জন-ই এমন অবিবাহিত দুই পুরুষ-নারীকে একশ'টি করে দোর্‌রা মারার আদেশ দিয়েছিলেন, যাদের একই চাদরের তলায় নিদ্রিত পাওয়া গিয়েছিল।

৩. এক ব্যক্তি তার অঙ্গুরীয়ের উপর নক্সা অঙ্কন করেছিল এবং বায়তুল মাল থেকে অর্থ চুরি করেছিল। হযরত উমর (রা) তাকে প্রথম দিন একশ'টি, দ্বিতীয় দিনও একশ'টি এবং তৃতীয় দিনও একশ'টি দোর্‌রা মারার আদেশ করেছিলেন।[১]

এখানে যে কয়টি দলীলের উল্লেখ হয়েছে, তন্মধ্যে শেষেরটি অপর দুইটি অপেক্ষা অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

এখানে অবশ্য একটি প্রশ্ন উঠে। তা হচ্ছে, এই শেষোক্ত কথাটিই যদি অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে রাসূলে করীম (সা) থেকে পাওয়া সহীহ হাদীস ঃ আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট 'হদ্দ' ছাড়া অন্য কোন অপরাধের শাস্তিতে দশটির অধিক চাবুক মারবে না।—এর কি জওয়াব হতে পারে ?

---

১. الحسنة و السياسة الشرعية ص ١١١٤

www.pathagar.com

জওয়াবে বলা যেতে পারে, হাদীসটিতে উদ্ধৃত 'হদ্দ' অর্থ গুনাহ্, অপরাধ, কেননা সব গুনাহ্ই আল্লাহ্র 'হদ্দ'। আর কুরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃত 'হদ্দ' অর্থ কখনও হয় গুনাহ্।—যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا

এইগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত 'হদ্দ'—সীমা বা গুনাহ্, অতএব তোমরা এর নিকটেও যাবে না।

আর কখনও তার অর্থ হয় 'নির্দিষ্ট শাস্তি'। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا

এগুলো আল্লাহ্র 'হদ্দ', অতএব তোমরা তা লংঘন করো না।

বোঝা গেল, শরীয়তদাতার ব্যবহৃত 'হদ্দ' শব্দটি ফিকাহ্বিদদের পরিভাষা রূপে ব্যবহৃত 'হদ্দ'-এর তুলনায় অধিক ব্যাপক অর্থবোধক। তা ছোট বা বড় যে কোন গুনাহ বা অপরাধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে আবার প্রশ্ন উঠে, 'হদ্দ' অর্থ যদি গুনাহ্ বা অপরাধ হবে, তা'হলে সেক্ষেত্রে 'দশ বা তার চাইতে কম' এই কথার মিল কোথায় ?

এর জওয়াব হচ্ছে, তা শিক্ষামূলক শাস্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, যা ঠিক কোন গুনাহ্র সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বা তার সন্তানকে মারে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে। এগুলি নিশ্চয়ই দশটি চাবুকের বেশি হওয়া জায়েয নয়।[১]

তা'যীর হিসাবে আর্থিক দণ্ড

ইসলামী শরীয়ত-বিশেষজ্ঞগণ তা'যীরী শাস্তি হিসাবে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করাকে সঙ্গত বলে ঘোষণা করেছেন।

তার কয়েকটি দলীল এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

১. বহজ ইবনে হুকায়ম বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

فِىْ كُلِّ اِبِلٍ سَائِمَةٌ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ لاَ تُفَرَّقُ اِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ اَجْرُهَا وَ مَنْ مَنَعَهَا فَاَنَا اٰخِذُهَا وَ شَطْرُ اِبِهِ عِزْمَةٌ مِن عِزْمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى (احمد – نسائ – ابو داؤد)

---

১. اعلام الموقعين لابن القيم ج ٢ ص ٣٠

فتح البارى ج ١٢ ص ١٧٨

www.pathagar.com

প্রত্যেক মুক্ত ভাবে মাঠে গিয়ে আহার গ্রহণকারী উটেরই যাকাত দিতে হবে। তার প্রতি চল্লিশটি থেকে যাকাত বাবদ তৃতীয় বর্ষে উপনীতা একটি উষ্ট্র ছানা দিতে হবে। কোন উটই তার হিসাব থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না। যে তা সওয়াবের আশায় দিবে, সে তার সওয়াব পাবে। আর যে তা দিতে অস্বীকার করবে, আমি তা অবশ্যই আদায় করব। তার উটের অংশ আমাদের মহান আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট অংশসমূহের মধ্যে গণ্য।

২. হযরত আবূ তাল্‌হা (রা) বলেন ঃ

يَا نَبِىَ اللهِ اِضْرَابَتْ خُمُرُ الاَبْتَامِ فِىْ حُجْرِىْ قَالَ اَهْرِقْ وَ اكْسِرِ الدَّنَانِ

(ترمذى – احمد – ابو داؤد – مسلم)

হে আল্লাহ্‌র নবী ! মদ্য আমার বিবেক-বুদ্ধিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন ঃ তুমি তা প্রবাহিত করে দাও ও জেগে উঠা ফেনাসমূহ চূর্ণ কর।

৩. গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ

مَنْ اَصَابَ فِيْهِ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ غَيْرُ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ خَرَّجَ بَشَىْءٍ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَ الْعُقُوْبَةُ (نسائ – ابو داؤد)

যে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তা মুখের কাছে পেয়ে যায়, কোন উপায়ে তা পাড়ে না, তা খেলে তাতে কোন অপরাধ হবে না। আর যে তা কোন জিনিসের সাহায্যে পাড়বে, তাকে তার দ্বিগুণ জরিমানা স্বরূপ দিতে হবে এবং সেই তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম লিখেছেন ঃ

যারা বলেন, অর্থ জরিমানার শাস্তি নাকচ হয়ে গেছে এবং তা শুধু ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদের শিষ্য-শাগরিদদের মত বলে প্রচার করেন, তাঁরা এই দুইজনেরই মায্‌হাব সম্পর্কে অসত্য কথা প্রচার করেন। আর যাঁরা তা যে কোন একটি মায্‌হাবের মত বলে চালিয়ে দেন, তাঁরা দলীলবিহীন কথা বলেন। এই পর্যায়ে নবী করীম (সা) থেকে কোন কথাই পাওয়া যায়নি। তাঁরা মনে করেন নবী করীম (সা) সমস্ত অর্থনৈতিক শাস্ত নিষিদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু তা আদৌ সত্য নয়, বরং সত্য কথা এই যে, তাঁর ইন্তেকালের পরও খুলাফায়ে রাশেদিন

www.pathagar.com

এবং বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম আর্থিক দণ্ডের শাস্তি প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের এই কাজ এই ব্যবস্থার পক্ষে অকাট্য দলীল, তা বাতিল হয়ে যায়নি।[১]

পূর্বোদ্ধৃত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তা'যীর পর্যায়ের শাস্তি সমূহের বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে। প্রশাসক এই পন্থায় অপরাধীদের যেকোন শাস্তি দিবার অধিকারী। অবশ্য তা অপরাধের স্বরূপের সহিত সামঞ্জস্য সম্পন্ন হতে হবে এবং স্বয়ং অপরাধীর অবস্থার সহিতও তা হতে হবে সঙ্গতি সম্পন্ন। কোন বিশেষ ধরনের শাস্তি দানের জন্য তাকে বেধে দেয়া হয়নি, তার মাত্রা ও স্বরূপও নির্দিষ্ট নয়। তবে তার লক্ষ্য হতে হবে সামষ্টিক কল্যাণ, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, সুবিচার ও ন্যয়পরতা কায়েম করা এবং সর্বপ্রকারের যুলুম প্রতিহত করা।

অপরাধ দমনে শরীয়তসম্মত শাস্তি প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া

প্রত্যেকটি জিনিসেরই সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হতে পারে তার ফলাফলের দৃষ্টিতে। এ এক স্থায়ী ও শাশ্বত মৌলনীতি। সর্বকালে ও সর্বক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস অপরাধ প্রতিরোধে শরীয়ত উপস্থাপিত শাস্তিসমূহ বাস্তবায়নের সাফল্যের নির্ভুল সাক্ষী। ইসলাম-পূর্বকালে মানুষ উদ্দেশ্যহীন ও আদর্শহীনভাবে জীবন যাপন করত। জনজীবনে তখন ছিল চরম অশান্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা, অরাজকতা। লুটতরাজ, হত্যা ও ছিনতাই ছিল তখন নিত্য নৈমিত্তিক এবং অতি সাধারণ ব্যাপার। একটি গোত্র অপর গোত্রের উপর প্রায় অকারণে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাদের লোকজনকে মারধর করতো, হত্যা করতো, তাদের জান-প্রাণ ও মান-সম্মান হরণ করতো। পরে আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সর্বশেষ জীবন বিধান উপস্থাপকরূপে প্রেরণ করলেন। তাঁর মাধ্যমে জনমনে এক অপূর্ব ঐক্য ও একাত্মতার সঞ্চার করলেন। তাদের বানিয়ে দিলেন এক ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত জাতি-জনসমষ্টি বা উম্মত। লোকেরা পরস্পরের প্রতি পরম ভালোবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলো। এই সমাজে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও বিস্তার এবং উচ্চমানের শরীয়তের আইনসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁরা বিশ্বমানবের অগ্রনেতা ও আস্থাভাজন হয়ে উঠলেন। তারা হয়েছিলেন নৈতিকতা ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে আর্দশ মানুষ। তাদের এই মর্যাদা দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী থাকলো। দুনিয়ার কোথাও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাদের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যেত না কুত্রাপি। তারা সমগ্র সভ্যজগতে তওহীদী আদর্শ ও সুবিচার-ন্যায়পরতার ঝাণ্ডা উন্নত করে ধরেছিলেন। শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল তখনকার জন-জীবনের পরম সত্য। তাঁরা ছিলেন বিপন্ন নিপীড়িত মানবতার আশ্রয়।

---

১. الحسبه ص ٥٠

www.pathagar.com

সমাজে ও সাধারণভাবে সমগ্র জনমনে তার শুভ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। লোকেরা দলে দলে দীন ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তাতে ইসলামী শরীয়তেই শ্রেষ্ঠত্ব, বৈশিষ্ট্য ও শুভ কল্যাণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সত্য কথা, মুসলমানদের বিশ্ব বিজয়ের মূলে ইসলামী শরীয়তের পূর্ণ বাস্তবায়নই অনস্বীকার্য সত্য এবং একমাত্র তত্ত্বরূপে নিহিত। আজও যেখানে-সেখানে শরীয়তের শাসন কার্যকর, সাধারণ শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার দিক দিয়ে তা বিকল্পহীন।

ইফাবা–২০০৪-২০০৫-প্র/৫৪৪৫(উ)–৫২৫০

www.pathagar.com

অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ